৩৩ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা ॥ মাঘ ১৩৮৬

উজ্জ্বল ভারত

বিপ্লবী দার্শনিক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

মূল্য—এক টাকা

যুগ্ম-সম্পাদক—গৌরচন্দ্র সাহা

With best compliments of

Hindusthan Industries Corporation

10, JACKSON LANE
CALCUTTA-1

GRAM SISIGLAS

26-1296, 27-9387

আসন্ন পঞ্চায়েত উপ-নির্ব্বাচন সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতি ২৪-পরগণা জিলা শাসকের আবেদন—

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আগামী ২০শে জুলাই, ১৯৮০ তারিখে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে একই দিনে পঞ্চায়েত উপ-নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই উপ-নির্ব্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জিলায় ৪৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৩টি আসন, ৯টি পঞ্চায়েত সমিতিতে ৯টি আসন ও জেলা পরিষদে ২টি আসনের শূন্যপদ পূরণের জন্য এই উপ-নির্ব্বাচন হইতেছে। ভোট গ্রহণের পর ভোট গ্রহণ কেন্দ্রেই ভোট গণনা করা হইবে এবং তিন স্তরেই কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল জানাইয়া দেওয়া হইবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে নির্ব্বাচিত প্রার্থী বা প্রার্থীগণের নাম ওখানেই ঘোষণা করা হইবে এবং প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে। পঞ্চায়েত সমিতির জন্য নির্ব্বাচিত প্রার্থীর নাম পরে ব্লক অফিস হইতে বি, ডি, ও এবং রিটার্ণিং অফিসার এবং জিলা পরিষদের নির্ব্বাচিত প্রার্থীর নাম মহকুমা শাসক এবং রিটার্ণিং অফিসার মহকুমা অফিস হইতে ঘোষণা করিবেন।

এই নির্ব্বাচনের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আপনাদের সক্রিয় সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর। অতএব আজ আমি এই আবেদনের মাধ্যমে আপনাদের সকলের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ, করিতেছি এবং সহযোগিতা চাহিতেছি।

১। কোনও দল বা প্রার্থী এমন কোনও কাজে লিপ্ত হইবেন না যাহাতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম এবং ভাষাভাষির মধ্যে কোনও ঘৃণা বা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

কোনও পুলিশ বা সরকারী কর্ম্মচারী বা কোন ভোট প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উর্দ্ধতন কোনও অফিসারের নজরে যেন তাহা আনা হয়।

প্রত্যেক দল এবং প্রার্থী নির্ব্বাচন কাজে নিযুক্ত সমস্ত কর্ম্মচারীর সাথে যেন পূর্ণ সহযোগিতা করেন এবং নির্বাচনবিধি যেন মানিয়া চলেন।

২। কোনও অবস্থাতেই যেন কেহ আইন শৃঙ্খলা নিজের হাতে তুলিয়া না নেন।

৩। কোনও মিছিল করিতে হইলে স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে আগেই জানাইতে হইবে। মিছিল পরিচালনায় যানবাহন চলাচলের যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে।

৬। একই সময় এবং একই রাস্তায় পরস্পর বিরোধী দুই বা ততোধিক মিছিলের সমাবেশ যেন না করা হয়।

৭। মিছিল বা কোন সমাবেশে কেহ যেন লাঠি বা কোন অস্ত্রশস্ত্র বহন না করেন।

৮। কোনও দল বা প্রার্থী যেন কোন ব্যক্তি বিশেষের জমি, বাড়ী অথবা দেওয়াল বিনা অনুমতিতে ব্যবহার না করেন।

৯। একে অন্যের মতবাদকে যেন শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির চক্ষে দেখেন।

১০। গণতন্ত্রে বিভিন্ন দল এবং মত থাকাই স্বাভাবিক এটা যেন সকলেই স্মরণে রাখেন।

সর্বোপরি মনে রাখিবেন যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্য এবং সহযোগিতা ব্যতীত এই বিরাট কর্ম্মযজ্ঞে সাফল্য আনয়ন করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আপনাদের সকলের পরিপূর্ণ সহযোগিতা কাম্য।

মনীশ গুপ্ত
জেলা শাসক ও জেলা পঞ্চায়েত
নির্বাচন আধিকারিক।
২৪-পরগণা, আলিপুর

তারিখ—৩০শে জুন, ১৯৮০

প্রকৃত ভূমিসংস্কারই সমস্যার সমাধান

বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর রূপায়ণে জোতদার ও সুদখোর মহাজন-এক কথায় গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থ আজ বিপর্যস্ত।

৮ লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গাদার আজ উচ্ছেদের আশংকাহীন। 'অপারেশন বর্গায়' নথীভুক্ত করে তাঁদের সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে ৮ টাকা দৈনিক মজুরীর দাবী অর্জিত হয়েছে। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্প গ্রামীণ শ্রমশক্তির রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার গণভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো পশ্চিমবঙ্গে আজ নতুন আশার সঞ্চার করেছে, উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছেন গ্রাম-বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ।

উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি খুঁজে বার করা, জনসাধারণের দরিদ্রতর অংশের মধ্যে সরকারেরর ন্যস্ত জমি বিতরণ করা, উপযুক্তক্ষেত্রে বাস্তুজমির দখলকারীদের নাম রেকর্ড করা, অভাবের তাড়নায় হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া, বর্গাদার ও ন্যস্ত জমি বন্দোবস্ত গ্রহণকারী ৬০ হাজার ব্যক্তিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি মারফত ঋণের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণ মকুব করা, রুগ্ন চাষীদের জন্য বার্ধক্যভাতা চালু করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জোতদার ও সুদখোর মহাজন চক্রের কুক্ষিগত অর্থ নৈতিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে গ্রামীণ শ্রমজীবি মানুষের জয়যাত্রায় আমরাও সঙ্গী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সং ১৩৯৩ (৪০) ডি আই ও ২৭. ৬. ৮০

মেহনতী মানুষের কল্যাণের পথে

২১শে জুন বামফ্রন্ট সরকারের তিন বছর পূর্ণ হ'ল। এই সরকারের বিচক্ষণ নেতৃত্বের ফলে পশ্চিমবঙ্গ আজ সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার কলুষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং দায়িত্ব সচেতন পঞ্চায়েতগুলি গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচীতে এ পর্যন্ত ৮, ৫০, ০০০ ভাগচাষী জমিচাষের আইনসঙ্গত অধিকার পেয়েছেন। ৪ একর পর্যন্ত সেচ-প্রাপ্ত ও ৬ একর পর্যন্ত অসেচপ্রাপ্ত কৃষিজমির খাজনা মুকুব করা হয়েছে।

কোন রকম শিল্প অশান্তি ছাড়াই রাজ্যের চা, পাট, বস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কর্মরত প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিকের মজুরী অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুদ্রণ ও হোসিয়ারী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদেরও রোজগার বেড়েছে।

শিল্প সম্পর্ক উন্নততর হওয়ার ফলে রাজ্যের অতুন নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এবং উৎপাদনও বেড়েছে।

শিক্ষায় নৈরাজ্যের অবসান ঘটেছে। গণ টোকাটুকি এবং বিশৃংখলা দূর হয়েছে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে এবং এ বছর থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হবে।

সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে ২৭,০০০ দরিদ্র কৃষকও পেনশনের আওতায় আসবেন। এছাড়া বিধবা, অক্ষম, পঙ্গু এবং বৃদ্ধ কারিগররাও পেনশন পাচ্ছেন।

বামফ্রন্ট সরকারই পশ্চিমবঙ্গে দেশের প্রথম বেকার-ভাতা চালু করেছেন।

দশটি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বেঁধে দেওয়া এবং সারা দেশে একই রাখার জন্যে বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

বিগত তিন বছরে কাজ কর্মের খতিয়ান যথেষ্ট সন্তোষজনক। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের মেহনতী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে ও তাঁদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে সনিষ্ঠ প্রয়াস চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

1483(35) 30. 6. 80

GRAM : NAMOSIDHA

66-3949
66-6181

With Best Compliments Of

RATNA ENTERPRISES

MAKERS OF
QUALITY STEEL FURNITURE FOR HOME, OEFICE, LIBRARY,
HOSPITAIL AND CANTEEN

40, Bijoy Kumar Mukherjee Road
Salkia, Howrah.

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০

ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১৪·০০	সহজ পাঠ্য গীতা	
বৃহৎ পকেট গীতা	৯·০০	শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	২২·০০
সুলভ পকেট গীতা		কর্মবাণী	৩·০০
পদ্যগীতা		ভারত আত্মার বাণী	৭·৪০
নিত্য পাঠ্য গীতা	২·০০	Soul of India Speaks	7·00

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৫·০০	রাষ্ট্রর্ষি রামমোহন	
বীরত্বে বাঙালী	৪·০০	আচার্য্য জগদীশচন্দ্র	
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	
বাংলার ঋষি	৬·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	৪·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০

শ্রীলীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৪·০০
মানুষের মত মানুষ	১·০০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৪·০০
নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৪·০০
সরল যোগ ব্যায়াম	৪·০০
যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৪·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৪·০০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী , ● ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

উজ্জল ভারত ৩৩ বর্ষ
১ম সংখ্যা
মাঘ '৮৬

সূচীপত্র

লাঙ্গল লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা |
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৫
নূতন বৎসর | সম্পাদকীয় | ৬
আমার শিক্ষাগুরু যোগী বরদাচরণ |
হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ | ৭
তোমার কথা ভাবতে গেলেই |
নচিকেতা ভরদ্বাজ | ৯
চেতনায় | মুকুলদেব ঠাকুর | ৯
সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি | স্বপন বুড়ো | ১০
বৈষ্ণব সাহিত্যে গোস্বামী প্রভু শ্রীজীবের অবদান | পুষ্প ঘোষ | ১৪
নিমাই তার নাম | পরেশ সাহা ২০
পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী | ২৬
না। হিমাংশু কুমার সেন | ২৮
দূরের আকাশ | অখিল রঞ্জন রায় | ৩০
প্রেমের শপথ নাও | অসীমা গাঙ্গুলী | ৩৩
মেনে রাখা ভাল | অংশুমান মিত্র /৩৩
শ্রীশ্রী নিত্যগোপালের বাল্য লীলা
দীপেন রায় | ৩৩
সার্থক টয়াগোয়ক মহেশ ওস্তাদ |
আর্য কুমার মুখোপাধ্যায় | ৩৯
পুস্তক সমালোচনা | গণেশ চক্রবর্তী | ৩৯

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র
যুগ্ম-সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা
মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক ১২ টাকা (সডাক)

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

বিশ্বসঙ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল' চক্র ও চক্রী 'পুরুষের' সমন্বয় করিয়া একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষ-প্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে, পাশ্চাত্ত্যের কাল-প্রধান সভ্যতা চঞ্চল বাহিরে যন্ত্রতুর-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি একান্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথা স্থানে ও যথা মানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বসঙ্ঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তিপত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে ঘাটে যমুনা-পুলিন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজমূর্ত্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাঁহার কার্য্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি-ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম রূপ লইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপসংঘাবৃত। কৃষি-ক্ষেত্র বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'। উজ্জলভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা অবনত মস্তকে তাহাকে অভিবাদন জানাইতেছি।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নরনারায়ণ আশ্রম' তথা 'উজ্জলভারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারম্ভ ক্ষণে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন সংক্ষেপে ইহার যে-অর্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অভ্যুদয়—লাঙ্গল যাহার দ্যোতক—সমন্বয়-ঘন তত্ত্ব-প্রকাশক এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। ভবিষ্যৎ ভারত তথা ভবিষ্যৎ বিশ্ব একই সঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'আমি বিশ্বনাগরিক' এই দুই-ই আস্বাদন করিবে।—সঃ—উঃ ভাঃ।

সম্পাদকীয়

নূতন বৎসর

১৩৮৬ বঙ্গাব্দের পৌষে উজ্জলভারত তাহার ৩২ তম বর্ষ শেষ করিল, শেষ করিল অনেক বাধা বিপত্তি ডিঙাইয়া তাহার নব কলেবরের একটী বর্ষ। মাঘ ১৩৮৭-তে নূতন ৩৩ তম বর্ষ আরম্ভ হইল। বৎসরের প্রথম অধ্যায়েই সেই দীর্ঘ মেয়াদী প্রেস দুর্ঘটনের শিকার হইয়া মুখ্যতঃ লোডশেডিং এর অত্যাচারে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ধনবল ও লোকবলের অভাবে আমরা 'যথা সময়'টিতে এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারি নাই। তবু আশা ছাড়িব না। সময়ের ফিকের এই বিপদ কাটাইয়া আমরা নিশ্চয়ই 'যথা সময়ের' অভীষ্ট লাভ করিব—এই আশায় গতি বন্ধ করি নাই। লেখক গ্রাহক পাঠক বিজ্ঞাপনদাতা বন্ধুজন সকলের নিকট পিছাইয়া থাকার ত্রুটিটুকুর জন্য মার্জনা চাহিয়া আমরা মাঘ ১৩৮৬ হইতে ৩৩ তম বর্ষে রওয়ানা হইলাম।

যে সম্মিলিত জীবন-দর্শনকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে উজ্জলভারত ৩২ বৎসর অগে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা শুধু তত্ত্বের ভাসমান না বলিয়া সাধিতের স্বভাব হইয়া ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত করিবার বাসনাই এই নব কলেবরের উদ্দেশ্য। যাহারা আজ নানা ভাবে এ কাজে সহযোগিতা করিতেছেন তাহাদের আমরা প্রাণের আনন্দ জ্ঞাপন করি।

পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা আর ভারতবর্ষের অন্তরীয় সভ্যতার সংঘাতের মধ্য দিয়া উদ্ভূত তৃতীয় সুস্থ অবস্থাটী আজও মানুষের চেতনা বা ব্যবহারে রূপ পায় নাই। তাই চারিদিকে আজ প্রচণ্ড অসৌন্দর্য। সভ্য বলিয়া আজ কিছু নাই, আছে কেবল সুবিধাবাদ। সভ্য আজ প্রত্যেকের সুবিধামত—ব্যক্তি বা দলের সুবিধামত—যাহার হাতে শক্তি ক্ষমতা সভ্য আজ তাহার পছন্দমত রূপ নেয়। ইহা অন্তর্মুখী সভ্যতার এক বিশেষ লক্ষণ। ইহা একান্ত জড়ীয় সভ্যতার ফল। অপর দিকে ভারতবর্ষে চিরন্তন সত্য বলিয়া যাহা ধরিয়া রাখা হইয়াছিল তাহার কোন নড়চড় হইত না, যুগোপযোগী প্রয়োজনকে সে স্বীকার করিতে পারিত না—তাহারই প্রতিক্রিয়ায় সভ্য আজ প্রত্যেকের চাহিদামত হইতে পারিয়াছে, চিরন্তন সত্য বলিয়া আজ তাই কিছু নাই।

কিন্তু 'এ দুয়ের মাঝে তবু কোথাও আছে কোনো মিল'—ঘটনাটা ইহাই। কিন্তু সে মিলটি আমরা বাহির করিতে যত্নবান হই নাই: এতদিন পর্যন্ত যে কোন একটা চূড়ান্তকে সত্য বলিয়া ধরিয়াই মানুষ পথ চলার সমাধান পাওয়া যায় নাই। সেই মিলটা বাহির করিয়া বাকি পরিবর্তনশীল সমাজে রাষ্ট্রকে নূতন করিয়া গড়িবার শাস্ত্র দিতেই উজ্জলভারতের প্রয়াস।

আজ সভ্যতা রূপ পাইবে শুধু ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ঔৎকর্ষ বিধানযন্ত্র নয়, যে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ঔৎকর্ষ ছিল ভারতীয় সভ্যতার বহিঃ প্রকাশ আর যাহারই ফল স্বরূপ আজও ভারতবর্ষের বুদ্ধিমান লোক অপরের সঙ্গে মিলিত হইয়া সঙ্ঘগঠন করিতে পারে না—সঙ্ঘগঠনে সে চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ। তাই পুরাণের ইতিহাসে দেখি দেবতারা সঙ্ঘগঠনে দুর্বল, অসুরেরা সম্মিলিত হইতে পারে সহজে। ব্যক্তি ও সমষ্টি মিলাইয়া যে সমগ্র সেই সমগ্রের সামগ্রিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আজ চলার পথ স্থির করিতে হইবে—কাহাকেও বাদ দিয়া আদর্শ স্থিরীকৃত হইবে না। আজ সকলকে লইয়া একসঙ্গে আগাইতে হইবে ইহাও যেমন একটি প্রধান কাজ, আবার সেই সঙ্গে প্রতি ব্যক্তির সুখদুঃখের নিরসন বা প্রতি ব্যক্তির যোগ্যতার পরিপূরণের ব্যবস্থাও আজ একটি প্রধান কাজ। উভয়সার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাসের মত দুইকেই প্রধান রাখিয়া আজ আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে—কোনটাকে বড় ছোট করা চলিবে না। ব্যক্তি তাহার পূর্ণ বিকাশকে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া প্রস্ফুটিত করিবে— দ্বন্দ্বমূলক পথে ইহা সম্ভব নয়। প্রত্যেককে পরিপূর্ণ স্বীকৃতির মধ্য দিয়া, সকলের হাত ধরাধরির মধ্য দিয়া ইহার চলার পথ। উজ্জলভারত সেই পথের পথিক হইয়া সেই পথের কথা মানুষকে শুনাইতে চায়।

ত্রয়ত্রিংশতম বর্ষ আরম্ভ-কালে আমরা উজ্জলভারত প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার জীবন-দেবতা শ্রীশ্রী নিতাগোপালের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি সর্ব দেশের সর্ব কালের সকল মানুষের যাহাদের জীবন চেতনা লইয়াই উজ্জলভারতের কারবার।

আমার শিক্ষাগুরু যোগী বরদাচরণ

হৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ

তখন আমি ১২। ১৩ বৎসরের বালক। মাইনর পাশ করেছি। দরিদ্র স্বর্ণশিল্পীর সন্তান তাই বোর্ডিং চার্জ দিয়ে হাইস্কুলে পড়া দুঃসাধ্য। লালগোলা হাইস্কুলে বিনাবায়ে পড়ার সুযোগ আছে। তাই পিতৃদেব আশায় বুক বেঁধে আমাকে সঙ্গে করে একদিন লালগোলায় হাজির হলেন। গৌর কান্তি সৌম্য মূর্তি বরদাচরণকে এই প্রথম দেখলাম। কিন্তু বিধি হল বাম। তিনি পিতৃদেবকে জানালেন "আমি আর এখানকার প্রধান শিক্ষক নাই স্টীমি বাড়ালা গ্রাম দাস সেন বিদ্যালয়ের রেকটর হয়ে যাচ্ছি।" পিতা পুত্রে নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম আপন আবাসে। হঠাৎ জ্যেষ্ঠ তাত তনু ত্যাগ করলেন। এক বৎসর বাণী অর্চ্চনা বন্ধ রইলো। পর বৎসর বাড়ালা হাইস্কুলে ভর্ত্তি হলাম। দেব কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—

সসম্ভ্রমে ছুঁয়ে
ও চারু চরণ-পদ্ম ছুঁয়ে
শান্ত হয় অশান্ত অন্তর
হে চির সুন্দর!

শিক্ষাগুরুর জীবনালেখ্য তুলে ধরছি—১২৯০ সালের ১৬ই শ্রাবণ সন্ধ্যায় মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। যাতঙ্গিনী দেবীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হলেন দেব শিশু। আঁতুরঘর অলৌকিক আলোতে ভরে গেল। কনকবরণে মণ্ডিত হল দক্ষিণাচরণের ভবনখানি। ধীরে ধীরে শশীকলার ন্যায় বেড়ে উঠল শিশু। আটবছরে হ'ল শুভ উপনয়ন। উপনয়নের রাত্রে কিশোর ঘুমঘোরে শয্যায় শায়িত। স্বপ্নের মাঝে হঠাৎ দেখতে পান পর্ব্বত তুল্য রজত জ্যোতি সদৃশ এক শিব লিঙ্গ। আলোকস্তম্ভ ধীরে ধীরে আশুতোষ মূর্ত্তিতে শয্যা প্রান্তে দেখা দিলেন। নিদ্রিত বালকের কর্ণে কি যেন কথা বললেন ভোলানাথ। সেই পুণ্য বিভাবরীতেই দীক্ষা হয়ে গেল বালক বরদাচরণের। কেনোপনিষদের ভাষায়—"ইহ চেদবেদীদথ সত্য মস্তি" বিভুর মিলনে জীব হয় ধন্য ইহলোকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার কাঞ্চনময় পল্লী কাঞ্চনতলা। গ্রামের শ্যামাঙ্গনে বট-বেল-বিটপীর ছায়ায় কাটে কৈশোর কাল। একদিন সঙ্গীদের সঙ্গে বরদাচরণ বিকেল বেলায় খেলায় মত্ত। হঠাৎ সেখানে আসেন এক সৌম্য দর্শন সন্ন্যাসী। সাধুজী বালকের অঙ্গের বিশেষ স্থানে অঙ্গুলি দান করেন। কিশোরের শরীরে ছুটে উঠে বেদদ্যুতি। কাঞ্চনতলা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুরে আসেন বরদাচরণ। জ্ঞান আহরণে রত হন কৃষ্ণনাথ কলেজে। গভীর রাত্রিতে চলে ছাত্রাবাসে শিব আরাধনা—আত্ম সাধনা। কিশোর কুমার পান সুধার আস্বাদন।

১৯১৪ সালে লালগোলার মহারাজা রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় আমন্ত্রণ করেন বরদাবাবুকে। পৌত্র ধীরেন্দ্র নারায়ণের শিক্ষার ভার অর্পিত হয় এই তরুণের উপর। ১৯১৪ সালের ৬ই জুলাই হঠাৎ আহ্বান আসে নিমন্ত্রিতা হতে। গৌরসুন্দর বারিকানাথ বিদ্যাপীঠের সহকারী প্রধান শিক্ষকের ভার প্রাপ্ত হন বরদাচরণ। বাঙময়ী জননী তরুণ আচার্য্যের ললাটে এঁকে দেন চন্দন টীকা। তাইতে পর বৎসর উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পুণ্যাসনে হন সমাসীন। পাঁচ বৎসর পর আহ্বান আসে লালগোলার মহারাজার কাছ থেকে। ১৯২১ সালে মহেশ নারায়ণ একাডেমীতে অলঙ্কৃত করেন প্রধান শিক্ষকের পদ। দিনে দিনে বিদ্যাপীঠটিকে বাণীর অধিষ্ঠান এক কমল কুঞ্জে রূপান্তরিত করেন। পুঞ্জে পুঞ্জে তাই আসে জ্ঞান-পিয়াসী মধুপের দল। মাঝে মাঝে আসে তাপিত মানুষ। লাল গোলার এই আশুতোষ যোগীর যোগবিভূতির সৌরভ তখন দশদিকে বিকীর্ণ। গার্ণাড শ এর ভাষায় বলা যায়—They are great men who are great among great men and that is the sort of man we are honouring to night.

একদিন পূর্ববাংলার এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হঠাৎ উপস্থিত হন লালগোলায়। তাঁর রুগ্ন শিশুকে অর্পণ করেন বরদাবাবুর পদ প্রান্তে। যোগীবর হন ধ্যানস্থ।

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে বলেন—"আপনাদের শয়নঘরে এক পা আলমারি আছে না? তার নীচের কয়েক খানি ইঁট খুলে ফেলবেন। দেখতে পাবেন একটি গোপন গর্ত। সেখানে শায়িত আছে এক বছদিনের মৃত শিশুর কঙ্কাল। সেটিকে তুলে কোন নদীতে ভাসিয়ে দেবেন আর শব্দ কক্ষে শিবপূজো করে নিত্যান্ন রলে শিশুকে স্নান করাবেন। শিশু নিশ্চয়ই আরোগ্য হবে।" ভদ্রলোক দেশে গিয়ে দেখেন সবই সত্য। যোগীবরের নির্দেশিত পথে শিশু মাসখানেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠে।

শিব বর দেবা গেল শৈশবে, কোন্ কাজ অসাধ্য?
দৃষ্টিতে তার অমৃত বৃষ্টি—ব্যাধি চলে যেতে বাধ্য।

মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরের মদন ঘোষ এম.এল সি পাস করলেন। বরদাবাবু তাঁকে লালগোলা হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু ভদ্রলোক তিন শতাধিক বেতনে গোরখপুর সুগার মিলে যেতে চাইলেন। বরদা বাবু বললেন, "আজকে যেচে বরাম নিলে না—পরে এই ব্রতই তোমাকে নিতে হবে।" যোগসিদ্ধ সাধকের বাণী ব্যর্থ হ'ল না। কয়েক বছরের মধ্যেই ঘোষ মশায়ের মিল মালিকের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটল। তাই কাজে ইস্তফা দিয়ে নিজ গ্রামের পাশের স্কুলে শিক্ষকের পদ নিতে বাধ্য হলেন।

দিব্য চক্ষে যেথে সব কিছু আলোকের ধারা পাথ
তাদের বাক্য মিথ্যা কি হয় সে যে ধ্রুব অভ্রান্ত।

সাগর পারে প্রচারিত হল শিক্ষাগুরুর যোগৈশ্বর্যের কথা। একদিন ধবদ্বীপ থেকে এলেন ডাঃ সোয়েটেমা। দুজনের অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিয়ে হল গভীর আলোচনা। অধ্যাত্ম তত্ত্বে অসীম জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হলেন সোয়েটেমা। ধবদ্বীপের Spiritual teacher হওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। প্রচুর অর্থাগমের আশা থাকলেও নির্লোভ পুরুষটি তা প্রত্যাখান করলেন। কয়েক মাস পরে এলেন মার্কিন থেকে ডাঃ আরা। লালগোলার পাশের গ্রামে বসেছে এক মহতী সভা। ডাঃ আরা বরদাবাবুর ভাষণে জীবনভাবে মুগ্ধ হলেন—যোগীবরকে আরা অধ্যাত্ম তত্ত্বের প্রচারক করে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাইলেন। মার্কিনের স্বর্ণমুদ্রাও সিদ্ধ সাধকের মনকে টলাতে পারল না।

অরূপ রূপ লভেছে যাহারা—পরম তৃপ্তি বক্ষে;
কাকন সে তো কাচের চুলা ক্ষুদ্র দুইটি চক্ষে।

ঋষি অরবিন্দও বরদাবাবুর যোগ সাধনার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুস্থ শরীরে উভয় উভয়ের কাছে যাতায়াত করতেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তকে শ্রীঅরবিন্দ লালগোলার আশুতোষ সাধকের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। বরদাবাবু সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—"Greatest yogi of modern Bengal"। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুও এই যোগীবরের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। ভবানীপুরে ডাঃ অমিয় মাধব মল্লিকের বাসভবনে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। কমিটোরে আসা মাত্র বরদাবাবু সুভাষ চন্দ্রকে বুকে বরণ করেন। বন্ধ ঘরে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়। নেতাজী ভবন থেকে নেমে সেলে বরদাবাবু আপনমনে উচ্চারণ করেন "মহাক্ষত্রিয়, যদি ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি খোলে অঘটন ঘটাবে।"

কবি কাজী নজরুল ইসলামের ইষ্ট দেবতা ছিলেন বরদাবাবু। নিমন্ত্রিতার এক বিবাহ বাসরে গিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি। সে প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি—"অন্তঃপুরে বার বার শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি হইতেছে—নহবতে সানাই বাজিতেছে, এমন শুভক্ষণে আনন্দ বাসরে আমার সেই ধ্যানের দেবতাকে পাইলাম - তিনি শ্রীশ্রী বরদাচরণ।"

তাই আজ ভাবি—ভাগ্যবান আমি। এই জ্যোতির্ময় পুরুষের শীতল স্নেহের ছায়ায় প্রায় তিন বৎসর কত জ্ঞান লাভ করেছিলাম। তাঁর বলন ভঙ্গী অনুসরণ করে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'ছাতুখোর' কবিতায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। বাল্যের চাপল্যে-সেদিন চিনেও চিনতে পারি নি এই চিন্ময় পুরুষকে। আমার হৃদয়-বীণা অধুনা বেদাগ রাগিনী ভুলে তাই বার বার বেজে উঠে—

স্পর্শমণি কাছে পেয়েও হারিয়েছি হায় কপাল দোষে;
অনুতাপ অনলে এখন দগ্ধ হই রোজ বসে বসে।

———

কবিতা

তোমার কথা ভাবতে গেলেই

নচিকেতা ভরদ্বাজ

তোমার কথা ভাবতে গেলেই বুকের মধ্যে উজানে ও
সরোবরে ফুল ফুটে যায়।
তোমার ছবি মনে এলেই উলসে ওঠে হাওয়ার দোলায়,
বুকের মধ্যে কেমন করে। স্বপ্ন-ছায়ায় তোমার রূপের
শুধু মায়ায়
তোমার ছবির স্মৃতির কাছে আমার বাথার
পদাবলী। প্রদীপ ভাসাই নদীর জলে—দীপাবলী।
তোমাকে যে আমার কীবল দেখতে ইচ্ছে করে,
কথা বলতে, অনেক কথা—লক্ষ কথার সোনার অক্ষরে
কথার নটের গাছে গাছে হীরে চুনির পান্না মতির
ফুল ফোটানো—ফল ধরানো—··· ···
অথচ এই পথে পথে এত যে ভিড়,
ক্লেদ্র খরশান ও এত আবর্জনা—সব হারানো
পথের ধুলোয়! প্রত্যহের এই পথে চলার অবাধ্যতা
কিছুই হতে দেয় না সে সব! কথারা তাই
মর মধুর নীরবতা
হয়েই রইল বুকের মধ্যে। তবুও তাথো মধ্যে মধ্যে
স্বপ্ন-আসব পান ক'রে যে কী উছল, জলাংছল
ইচ্ছে করে তোমার কীবল চোখের দিকে চেয়েই থাকি।
বুকের পাখী ছটফটিয়ে মরছে ডানা
হারিয়ে যেতে চায় সে তোমার অরণ্যের অন্তরালে···
আর কিছু যে বলতে মানা।
কারণ এখন বন্দী আমি বিপন্ন এই স্থানে কালে।

তবু কী যে ইচ্ছে করে—কেবল দেখি তোমার মধুর
প্রতিমা-মুখ! মুক্ত-পেখম মনের মধুর
দেখতে দেখতে,দু'চোখে জল গড়িয়ে পড়ে
ভাসে এ মুখ—ভাসে এ বুক।
ইচ্ছে করে তোমার দু'টি শুভ্র ফুলের মঞ্জরীর মতন পায়ে
মাথা রেখে প্রণাম করি, আমার বুকের সকল দিয়ে—
যা কিছু সব উজার ক'রে তোমার পায়ে!
তোমার শাড়ীর পাড়ের ছবি আমায় মৃদু স্পর্শ করে
আমার বুকের মধ্যে তখন কেমন করে!
এবং তুমি—তোমার দু'টি কাঁচা সোনার
হাতটি রেখে মাথায় আমার
আশীর্বাদ করছ—ঈষৎ একটু সুরে:
দুঁই-চাপা ফুল ফুটল দুঁইয়ে! তোমার মধুর
মোহন দু'টি চরণ ছুঁয়ে
ইচ্ছে করে চোখের জলে ভিজিয়ে নেই তোমার দু'টি
পায়ের পাতা—কচি কিশলয়ের মত স্বর্ণবর্ণ—
একটি দু'টি মেলছে পাতা।
বুকের মধ্যে তোমার কমল আসন পাতা।
তোমায় শুধু পূজা করব চোখের জলে—আর কিছু নয়।
তোমার কথা ভাবতে গেলেই বুকের নীরব সিংহাসনে
তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত—এবং তাহার শুভ্র হাতে
কী বরাভয়!
এসব কথা থাকল শুধু—আমার মনের সঙ্গোপনে।
নিজের কাছেও বলতে যে ভয়—
মনে মনে।

চেতনায়

মুকুলদেব ঠাকুর

চিত্তশুদ্ধি, বিনোদন: প্রগল্‌ভতা আগামী দিনের:
ভুলে গিয়ে সব তিথি, নক্ষত্রের সীমা-পরিসীমা—
তুমি কি যথার্থভাবে মুক্তির বিগ্রহ হোতে পারো?
অথবা, বিগ্রহ হোয়ে আজীবন পারো কোন
মানুষের মুক্তি এনে দিতে?

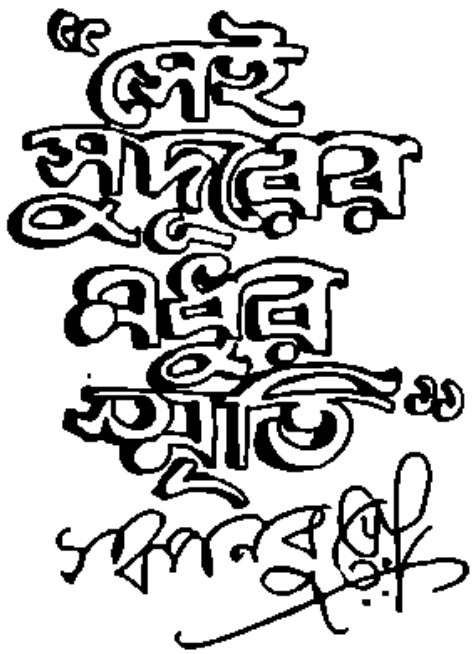

দশ

সেকালের কলকাতায় মাঝে মাঝে যাত্রা শোনবার সুযোগ হয়েছে।

আমরা যখন ছাতুবাবুর বাজারের কাছে ছিলাম, সেই সময় একবার "উড়ে যাত্রা" দেখে ছিলাম। তার ভাবা আর অভিনয় সেই ছেলে বয়েসেই বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল।

"কৃষ্ণ যাত্রা" ও দেখে ছিলাম একবার। ছেলেরাই গোপিনী সেজে নেচে গেয়ে আসর মাৎ করে দিয়েছিল।

আবার এমনি ঘটার কথা, বড় হয়ে আমাকেই এক সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য "কৃষ্ণ যাত্রা" লিখতে হয়েছিল। তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি (Representative) ছিলেন হেম গুহ। তিনি আমাকে একবার বললেন, পল্লী অঞ্চলের রেকর্ড পালার জন্য "কৃষ্ণ যাত্রা" লিখে দিতে।

প্রথমে আমি ভাবলাম, কৃষ্ণ যাত্রার আমি কি জানি? পরে বটতলা থেকে পুরোণো পুঁথি-পত্র কিনে অনেক পড়াশোনা করে "নৌকো বিলাস" লিখে ছিলাম। সেই সেই পালা গুহ মশায়ের খুব পছন্দ হয়েছিল। তখনকার দিনের নামকরা কণ্ঠ শিল্পী ছিলেন ধীরেন দাস। তিনিই আগ্রহ করে এই "নৌকো বিলাস" পরিচালনা করেছিলেন। গানগুলির সুরও তিনি দিয়েছিলেন আর নিজে শিখিয়েছিলেন। গ্রাম দেশ থেকে কৃষ্ণ যাত্রার দলকে কলকাতায় গ্রামোফোন রিহার্সেল রুমে নিয়ে আসা হয়েছিল। তখন চাঁৎপুরের 'বিশ্বভবন' নামক বাড়ীতে গ্রামোফোনের রিহার্সেল হত। কবি নজরুল ইসলামও (আমাদের কাজীদা) সেই খানে বসে গান লিখতেন আর শিল্পীদের শিখিয়ে দিতেন।

"নৌকো বিলাস" যখন পালা হয়ে রেকর্ড হয়ে প্রকাশিত হল, কাজিদা আমাকে ডেকে বললেন, অখিল, তুমি একবার পালাটা আমায় শেখিয়ে নিলে না কেন? আমি দু একটা গান বদলে দিতাম।

আমি উত্তরে জানালাম, আপনি ত চক্রনাথে সব সময় বেরাও হয়ে থাকেন। আপনার নাগাল পাচ্ছি কোথায়? তবে ধীরেন দাস এখানে রোজ রিহার্সেল দিতেন। আপনি শুনে ব্যবস্থা করতে পারতেন।

তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, নতুন রেকর্ড বেরুলে সবাই মিলে রিহার্সেল রুমে বসে সেটা শুনতেন, আর সমালোচনা করতেন।

সেই সময়ে কাজীদার সঙ্গে এই সব কথা হয়েছিল। যাইহোক—শেষ পর্যন্ত 'নৌকা বিলাস' পালাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। পল্লী অঞ্চলে নাকি বহু সেট্ বিক্রি হয়েছিল।

"নৌকা বিলাসের" সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কর্তৃপক্ষ আরো কয়েকটি পালা রেকর্ড করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠে নি।

যাত্রার কথা বলতে গিয়ে অনেক দূর চলে এসেছি। আবার পুরোনো দিনে ফিরে যাই।

এক সময়ে কর্ণওয়ালিশস্ট্রীটে বিখ্যাত ডাক্তার চন্দ্র শেখর কালীর বাড়ীর কাছাকাছি আমরা থাকতাম। সেই সময় দুই পরিবারে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

এই চন্দ্র শেখর কালীর বাড়ী প্রতি বছর বেশ ধুম করে জগদ্ধাত্রী পুজো হত। আর সেই উপলক্ষে যাত্রাও হত।

বাড়ীর ভেতর একটি যাবারি ধরণের উঠোন ছিল।

সেই খানেই যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যাত্রার কি পালা ছিল সে কথা আজ অবশ্য মনে নেই। তবে ডাঃ কালীর বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে বসে যে যাত্রা উপভোগ করেছিলাম সে কথা বেশ মনে আছে।

যখন আরো ছোট ছিলাম, গ্রাম দেশে ছেলেবেলাটা কেটেছে—, সেই সময় পল্লী অঞ্চলের যাত্রা দেখেছি। তখনকার দিনে সারা রাত ধরে যাত্রা হত।

যাত্রা শুনতে শুনতে শতরঞ্চীর ওপরই ঘুমিয়ে পড়তাম। তারপর সেই যুদ্ধ হত সুরু—টিনের তলোয়ারের ঠোকাঠুকি আরম্ভ হয়ে যেত—আর সেই সঙ্গে বাজনাও উচ্চ গ্রামে চড়ে উঠত আর দ্রুত তালে এগিয়ে যেত—তখন হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যেত। আমরা চোখ কচ্‌লে শতরঞ্চীর ওপর উঠে বসতাম। আর অবাক হয়ে যাত্রা দেখতাম। যাত্রার যুদ্ধই ছিল সত্যিকারের উপভোগ্য ব্যাপার। এখনও সেই ছেলেবেলাকার যাত্রার স্বপ্ন দেখি। অবশ্য পরে কলকাতায় অনেক যাত্রা দেখেছি। যাত্রা দেখে পুরস্কার আর বক্তৃতাও দিয়েছি—সে অনেক পরের কথা।

সেকালের কলকাতায় সারারাত ব্যাপী গানের আসর বড় একটা বসত না।

তবে একটি উল্লেখযোগ্য গানের আসরের কথা মনে আছে।

প্রতি বছর লাল চাঁদ বড়ালের স্মৃতি রক্ষার জন্য কয়েক দিন ধরে সারা রাত্র ব্যাপী গানের জলসা হত। সারা ভারতবর্ষের গুণী শিল্পীরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন।

আমাদের ছেলেবেলাকার বহু পরে নামকরা চিত্র পরিচালক হীরেন বসু খুব অল্প বয়েস থেকেই গান বাজনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁর দৌলতেই একবার এই লাল চাঁদ বড়ালের গৃহে সারা রাত্র ব্যাপী গানের জলসায় উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে আমাদের দলে শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তী, শিল্পী প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় আর হীরেন বসু ত ছিলেনই। সেই আসরে "ছায়ান্ ছোড়ি" জানকী বাই আর হীরাবাঈ বরোদেকরের কণ্ঠ সঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। জানকীবাঈকে নাকি কে ছায়ায় বার ছুরি মেরেছিল। তবু তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়েছিল "ছায়ান্ ছোড়ি" জানকী বাই।

তখনকার দিনে আর একটা গানের আসর বসত—হ্যারিসন রোডে শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ীতে।

বহু নামকরা ওস্তাদ ও গুণী এখানে এসে মজলিশ জমাতেন।

আমার এক কাকা বীরেন্দ্র সিংহ নিয়োগী সেকালে ৪৯ নং বেঙ্গলী রেজিমেন্টে ছিলেন। কাজি নজরুল ইসলামও এই দলে ছিলেন।

আমার কাকা কাশীতে বহু কসরৎ করে ওস্তাদী গান শিখেছিলেন। সেই সূত্রে রেজিমেন্টে গায়ক হিসেবে তাঁর খুব নাম হয়েছিল। একথা কাশীদার মুখে বহুবার শুনেছি।

এই শ্যামলাল ক্ষেত্রীর গানের আসরে আমি একবার বীরেন কাকার সঙ্গে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়েস খুব অল্প। গান বাজনার কি বা বুঝতাম! তবে বহু গুণী জনের সমাবেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সেই সমাবেশটার কথাই মনে আছে।

এই ঘটনার বহু পরে কাশীদা যখন গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের ব্যাপারে প্রায় সর্বময় কর্তা—তখন একবার বীরেনকাকা দেশ থেকে এলেন গান রেকর্ড করবার জন্যে। আমি তাঁকে কাশীদার কাছে নিয়ে গেলাম। তখন বীরেন কাকার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গেছে। দারুণ কাসিতে ভুগছেন। কাশিদা তাঁর গলার গান শুনে খুব মর্মাহত হলেন। বল্‌লেন, তোর একি গলা হয়ে গেছে? রেজিমেন্টে হাজার হাজার লোক তোর গান শুনে তারিফ করত, আর আর সেই গলা দিয়ে সুরই বেরুচ্ছে না।

কাশিদা খুব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই বীরেন কাকার রেকর্ড করানো গেল না।

আমি সারা জীবন গান শুনতে ভালো বেসেছি। যদিও সঙ্গীতের ব্যাকরণ কিছুই জানি না।

এই কলকাতার শহরে বহু গানের জলসায় গান শোনবার সৌভাগ্য আমার পরবর্তী কালে হয়েছে। পাথুরে ঘাটায় শ্রী মন্মথ ঘোষের বাড়ীতে বড়ে গোলম আলির গান পাশে বসে শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে।

এ ছাড়া রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার ব্যক্তিগত স্নেহ ভাজন বন্ধু।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো গুণী ব্যক্তি আমার গান মেগাফোনে রেকর্ড করেছেন। সে আমার পরবর্তী জীবনের গর্বের কথা। পঙ্কজ মল্লিকও ভালোবেসে আমার গানে সুর দিয়ে গেয়েছেন।

সারা জীবন ছোটদের উৎসবের জন্যে, নৃত্য নাট্যের জন্য আমি বহু গান রচনা করে দিয়েছি। অপরে সুর দিয়ে সেই গান গেয়েছেন।

অথচ সঙ্গীত শিল্পের কিছুই জানি না।

সে যুগে বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক অমিয় সান্যালের বাড়ী একটি গুণী জন সমাবেশ হত। সঙ্গীতাচার্য সুরেশ চক্রবর্তী এখানে খুব যেতেন। আমি আমার কাকার সঙ্গে একবার সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়েছিলাম ওই পর্যন্ত। ওখানে যে কত গুণী ও ওস্তাদ আসতেন সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

পরবর্তীকালে আমি যখন সেনোলা রেকর্ড কোম্পানীতে "স্বপনবুড়ো" রেকর্ড করি সেই সময় সুরেশ চক্রবর্তী মশাই নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। সমস্ত ব্যাক্ গ্রাউণ্ড মিউজিক তিনিই রচনা করেছিলেন।

রেকর্ডে যে সব ছড়া ছিল—তিনি তাতে সুর সন্নিবেশ করেছিলেন। আর দারুণ পরিশ্রম করে সঙ্গীত পরিচালনার কাজ সমাধা করেছিলেন। স্বপনবুড়োর ভূমিকাটিকে আমি নিজে রূপ দিয়েছিলাম। সে সময়ে আমি মোটেই বুড়ো ছিলাম না। একটি ছোট মেয়ে খোকার পার্ট করেছিল।

এ সমস্ত কথা বলছি এই জন্যে যে, সেদিনের কথা যারা জানতেন তাঁরা অনেকেই হারিয়ে গেছেন।

সেই সময় সেনোলা কোম্পানীতে একটি দারুণ আড্ডা বসত। বহু সাহিত্যিক ও শিল্পী এখানে আসতেন। আসরের মধ্যমণি ছিলেন সেনোলার বিভূতি সেন।

পরবর্তীকালে আমি আর একটি আসরের প্রবর্তন করেছিলাম।

"সব পেয়েছির আসর" গড়ে প্রতি বছর যেমন ছোটদের মধ্যে গান ছবি আঁকা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতাম, তেমনি বছরে একটি সঙ্গীত আসরের আয়োজন করতাম—যার নাম ছিল "বড়দের মুখে ছোটদের গান।"

বছরে একটা দিন আমাদের মেসের নামকরা শিল্পীরা ছোটদের উপযুক্ত গান গেয়ে শিশু-কিশোর কিশোরীদলকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করতেন।

আমাদের সাদর আহ্বানে সকলেই এসে সমবেত হতেন।

যাঁদের নাম মনে পড়ছে—তাঁদের মধ্যে ছিলেন—পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য আরো বহু গুণী শিল্পী।

যাঁদের আমরা আহ্বান জানাতাম—তাঁদের মধ্যে কেউ আমাদের বিমুখ করতেন না।

আরো আনন্দের কথা এই ছিল যে, ছোটদের গান শোনাতে এসে কেউ আমাদের কাছ থেকে কোনো রকম পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না।

তাঁদের ভালো বাসায় আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গীতের আর একটা আসর বসত হ্যারিসন রোডে যেখা ফোন রেকর্ড কোম্পানীতে।

এই প্রতিষ্ঠানের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর নাম ছিল যেখা ঘোষ। সেই থেকে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছিল মেগাফোন কোম্পানী।

এই যেখা ঘোষ খুব রসিক আর আমুদে লোক ছিলেন। কালো-কোলো ছোট খাটো মানুষটি, সব

সময় মুখে হাসি লেগে থাকতো। আর পান খেয়ে ঠোঁটটি লাল করে রাখতেন।

খুব ধীরে ধীরে কৌতুক করে কথা বলতে ভালো বাসতেন। আর কথার সঙ্গে হাসির ছিটে লাগা থাকতো। সবাইকে আপনার করে নিতে পারতেন।

এই ছোট খাটো মানুষটিকে ঘিরে অনেক গুণীজন এসে মেগাফোনে সমবেত হতেন।

এই মেঘা ঘোষ পালা রেকর্ডের জন্যে একটি দল গড়ে ছিলেন। পালা রেকর্ডের নাটুকে দল।

নাটা রচয়িতা ছিলেন—নাটাকার মন্মথ রায়। পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা ছিলেন—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতে পরিচালক ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত রচনার ভার ছিল—আমার ওপর। প্রধান অভিনেত্রী ছিলেন নীহার বালা। খনার গান রচনার জন্য আমি একটি পোর্টেবল গ্রামোফোন মেশিন উপহার পেয়েছিলাম।

এই নাটুকে গোষ্ঠিকে নিয়ে অনেক গুলি পালা রেকর্ড তৈরী করা হয়েছিল। যথা—খনা, শকুন্তলা, রাম প্রসাদ প্রভৃতি।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় খুব যত্ন করে গানের সুর দিতেন, আর শিল্পীদের ট্রেনিং দিতেন। অভিনয়ের অংশের সমস্ত দায়িত্ব ছিল দুর্গাদাসের ওপর। খনার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—নীহার বালা। মিহিরের ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং দুর্গাদাস।

এই "খনা" পালা রেকর্ড এত বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল যে, সে যুগে একলক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল—একথা প্রতিষ্ঠানের মালিক আমাদের নিজে গর্ব করে বলেছিলেন।

এছাড়া এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহু গানের রেকর্ড প্রকাশিত হত। এই বিভাগে ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম, কানন বালা প্রভৃতি। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ও অনেক রেকর্ড করতেন।

মেগাফোনেও মাঝে মাঝে গানের জলসা বসত। ভীষ্মদেবের গান, নজরুলের গান ও কানন বালার গান খুব জমে উঠত।

স্বয়ং মেঘা ঘোষ খাওয়াতে খুব ভালোবাসতেন। প্রচুর জলযোগের আয়োজন করা হত।

কাজিদার জন্যে ব্যবস্থা থাকত—প্রচুর পান, জর্দা আর একটি ডাবর।

তাঁর প্রাণ খোলা হাসিতে উৎসব আসর ক্ষণে ক্ষণে মুখরিত হয়ে উঠত।

[চলবে]

নরনারায়ণ আশ্রম রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

১।	ব্রহ্মসূত্র তিনখণ্ডে	২৬·০০
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০
৩।	শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৫·০০
৪।	ঈশোপনিষদ্	৩·০০
৫।	কেনোপনিষদ্	২·০০
৬।	কঠোপনিষদ্	৫·০০
৭।	প্রশ্নোপনিষদ্	২·০০
৮।	ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	২·০০
৯।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	৪·০০
১০।	তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৪·০০

প্রতিভা রায় রচিত

১।	নারীপ্রগতির জন্মকথা	
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	

রেণু মিত্র রচিত

	সমন্বয় মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	২·০০
	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৫·০০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

	রবীন্দ্র হৃদয়	৫·০০
	প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি / পো: অশ্বিনীনগর

কলিকাতা-৫৯ / ২৪ পরগণা, ফোন : ৫৭-২৪৪০

প্রাপ্তিস্থান

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স

২৪/২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

বৈষ্ণব সাহিত্যে গোস্বামী প্রভু শ্রীজীবের অবদান

পুষ্প ঘোষ

"শ্রীজীব গোস্বামী হন অতুল্য মহান্ত।
প্রেমে পরাকাষ্ঠা যাঁর গুণের নাহি অন্ত॥
সর্ব্ব গুণাকর নাম সার্থক তাঁহার।
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত অপার॥"

প্রায় চারশত বৎসর পূর্ব্বে, বৃন্দাবনধামে ভক্তি-আন্দোলনের মূল কেন্দ্রে যিনি অধিষ্ঠিত হন, তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবনেতা শ্রীজীব গোস্বামীরূপে পরিচিত হন। সমসাময়িককালে বৈষ্ণব সাধকগণের পুরোধারূপে তিনি অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মনীষার দীপ্তিতে, ত্যাগ বৈরাগ্য ও সাধনার আলোক-সম্পাতে শত শত সাধক বৈষ্ণবের জীবনে নবতর প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়ে তোলেন। অনুমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জীবনেই নয়, সারা বাংলাদেশের ধর্ম্ম সমাজ সংস্কৃতিময় জীবনে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায় তিনি রচনা করেন। ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও সাধনার ক্ষেত্রে এই মহাসাধক তাঁর নিজস্ব প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে যান।

শ্রীজীব ছিলেন দেবাধিকল্প রূপ সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাপুভব বল্লভদেব বা অনুপমের পুত্র। শ্রীরঘুনাথের অনুপম-ভক্ত অনুপম অহর্নিশি রামনাম কীর্ত্তন, ভজন সেবা পূজায় অতিবাহিত করতেন। তিনিও গৌড় রাজ-সরকারের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। রূপ সনাতন গৌর-প্রেম-রসার্ণবে নিমজ্জিত হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভক্তবীর হনুমানের ন্যায় একনিষ্ঠ-ভক্তি অস্ত্রের ঘায়ে হতে রাজী হলেন না। অগ্রজদের কাছে নিবেদন করলেন—

"কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবো রঘুনাথের চরণ॥"

বল্লভদেবের এইরূপ ইষ্টভক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই ভক্তবীরের নাম দিলেন "অনুপম"। এই শক্তিমান একনিষ্ঠ সাধক পুরুষই জীবের পিতা।

রূপ যখন জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে সংসার ত্যাগ করে মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় নিতে যান, সেই সময় অনুপম তাঁর সঙ্গী হন। দুই ভাই নানা তীর্থে ভ্রমণ করে গৌড়ে ফেরার পথে পথিমধ্যেই অনুপমের প্রাণ বিয়োগ হয়।

শ্রীজীবের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। মায়ের কাছে পিতা ও পিতৃব্যদের ভক্তি-সাধনার কথা শুনে শুনে মনের অজ্ঞাতে বৈরাগ্যের বীজটি ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে থাকে। বিধবা মায়ের নয়নমণি শিশুপুত্র শ্রীজীবকে নিয়ে তিনি জ্যেঠাদের সঙ্গে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের প্রাসাদে বাস করতেন। আপন পরিবারের রাজবৈভব না পেলেও উত্তর জীবনে এই বালক এক বিরাট ভক্তি-সাম্রাজ্যের বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে পরিচিতি লাভ করেন।

বাল্যকাল হতেই জীব বড় উদাসীন, ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির ও সংসার-বিরাগী। সুযোগ পেলেই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের বেশে সাজতে তার খুব উৎসাহ। জ্যেষ্ঠ মাতৃদ্বয় ও স্বীয় মাতার মনে সদাই আতঙ্ক—এই বৈরাগী মন নিয়ে শেষে না সেও বংশের ধারা অনুসরণ করে।

তার স্বভাবে একদিকে যেমন বৈরাগ্য ভাবধারা অন্যদিকে তেমনই প্রখর মেধাশক্তি ও অনন্যসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি। অতি অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য ও স্মৃতি তিনি আয়ত্ত করে ফেলেন। অতি অল্প বয়সেই স্থানীয় চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপ্ত করেন। তাঁর অসামান্য মেধা ও শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধানে সকলে বিস্মিত হয়। দিব্যকান্তি বালকের তীক্ষ্ণ নাসিকা, প্রশস্ত ললাট তেজস্বিতা ও অসামান্য প্রতিভার ছাপ।

এবার উচ্চতর শিক্ষা—বেদান্তদর্শন অধ্যয়নের জন্য মাত্র

বিশ বৎসর বয়সে ত্যাগব্রতের ভিক্ষাঝুলি ও বৈষ্ণবীয় চিহ্ন ডোর কৌপীন ধারণ করে নবদ্বীপে গেলেন। গৃহত্যাগ করে ও মায়েদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে এই যে শ্রীজীব সেদিন পথে বার হলেন, উত্তর জীবনে আর কোনদিনও তিনি গৃহে ফেরেন নি।

নবদ্বীপে পৌঁছে তাঁর আনন্দের অবধি নাই। নিত্যানন্দ প্রভু কিছুদিন পূর্বে খড়দহ থেকে এখানে এসে শ্রীবাস পণ্ডিতের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন। শ্রীজীব সেখানে গিয়ে তাঁর পদবন্দনা করলেন। দয়ালাবতার প্রভু নিত্যানন্দ নবাগত ব্রহ্মচারীর পরিচয় পেয়ে তাঁকে প্রেমালিঙ্গন ও স্নেহাশিষ দিলেন। ক্রমে তাঁকে মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত লীলাস্থলসকল দেখালেন। প্রেম-পিপাসু তরুণ তাপস এরপর নীলাচলে গিয়ে গৌরাঙ্গ-পদসঙ্গ করবার অভিলাষ প্রকাশ করেন।

সে প্রস্তাবে প্রভুপাদ সম্মত না হয়ে বললেন—"জীব, তুমি যে শাস্ত্র-শিক্ষা সঙ্গে করে এনেছ তার আবশ্যক অত্যন্ত অধিক। নীলাচলে গিয়ে ভাবোন্মত্ত হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তুমি যাও বৃন্দাবনে। মহাপ্রভু তোমার বংশকেই বৃন্দাবন ধামের পুনঃ জাগরণের ভার দিয়েছেন। সেখানে গিয়ে ভক্তিধর্ম প্রচারে ব্রতী হও। তার পূর্বে কাশীতে গিয়ে মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের কাছ থেকে বেদান্ত পাঠ শিক্ষা নাও। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের শাস্ত্রভিত্তি তার দার্শনিক তত্ত্ববিচার তোমার মনীষার সাহায্যে গড়ে উঠুক। রূপ সনাতনের পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকার নিয়েই তুমি শুধু আস নি, তোমার অলৌকিক সামাজ্ঞ প্রতিভা নিয়ে তুমি বৈষ্ণব সমাজকে সুসংঘটিত করে তোলো।"

শ্রীজীব প্রভুপাদের উপদেশে কাশীতে এসে বাচস্পতি মহাশয়ের সমীপে উপনীত হলেন। এই তরুণ বিদ্যার্থীর অদ্ভুত মনীষা দেখে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যান। মাত্র চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ন্যায় ও বেদান্ত দর্শন শাস্ত্রে অগাধ পারদর্শী হয়ে উঠেন। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সেই তাঁর শাস্ত্র জ্ঞানের খ্যাতির সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাই—

"কাশীতে শ্রীজীবে প্রশংসে সর্ব্ব ঠাঁই।
ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই॥" (চৈ-চ)

শ্রীজীবের কাশীতে আগমনের দুই বৎসরের পরেই শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলাসংবরণ করেন। তাই তাঁর অদৃষ্টে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন ঘটেনি। শাস্ত্রাধ্যয়নের পর্ব শেষ করে, বেদ বেদান্ত কৃতী হয়ে এই তরুণ তাপস কাঙালের বেশে বৃন্দাবনে উপনীত হন।

সেখানে তৎকালীন তাঁর পিতৃব্যদ্বয়ের একচ্ছত্র প্রভুত্ব। পিতৃব্যদ্বয়ের হাব-ভাব অবয়ব ইত্যাদির বিবরণ মাতৃগণের নিকট যা শুনেছিলেন, তৎসমুদয়ই শ্রীজীবের প্রাণ-প্রস্তরে গভীর ভাবে খোদিত, কাজেই তাঁদের চিনে নিতে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হল না। তিনি একে একে উভয়ের পদবন্দনা করলেন।

শ্রীরূপ সনাতনের প্রাণে অনির্বচনীয় আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। তপ্ত কাঞ্চনাভ নখর কান্তি, সুদীর্ঘ আঁখি, সুকুমার বদনমণ্ডল কন্দর্প কান্তি—কিন্তু তাঁর এ কি ত্যাগ তিতিক্ষা—কৃষ্ণ-সেবার একি অদ্ভুৎ আর্ত্তি। বাৎসল্য বিহ্বলিত প্রাণে প্রাণপ্রতিম সহোদরের কৃতিশ্রুতি সন্তানকে বক্ষে ধারণ করে, প্রাণভরে আশীষ দান করলেন ও অন্যান্য আচার্য্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীজীবের নয়নাভিরাম মূর্তি, অতুলনীয় প্রতিভা, গুরুভক্তি সকলেরই প্রশংসা ও স্নেহ আকর্ষণ করল।

শ্রীবৃন্দাবনে তৎকালীন সুবর্ণ যুগ চলছে। লোকনাথ, ভূগর্ভ গোস্বামী, প্রাণবল্লভ, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি এই পবিত্র ধামে বাস করছেন। সকলেরই চিন্তা কি করে মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম ও আন্দোলনের বিস্তার সাধন ও ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করা যায়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ক্রমে ক্রমে এখানে অনেকেই সমবেত হতে লাগলেন। এদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীজীব।

সেদিনের বৈষ্ণবদের মধ্যে এই নবাগত তরুণ সাধক এক আলোড়নের সৃষ্টি করলেন,—তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ, প্রগাঢ় ভক্তি, অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, ধারণাতীত তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, কল্পনাতীত সেবাপরায়ণতা, বুদ্ধির প্রখরতা, ও

আশাতীত কার্যদক্ষতায়। স্বাভাবিক ভাবেই ব্রজমণ্ডলের ভক্তি-সাম্রাজ্যের ভাবী নায়করূপে তাঁর ভূমিকাটি চিহ্নিত হয়ে যায়।

স্বীয় সহমর্মিতায় শ্রীজীবের প্রতি প্রত্যেকের যেমন সমান অধিকার, সকলের নিকট শ্রীজীবেরও তদনুরূপ দাবী ও অবারিত গতি। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শ্রীজীব দীক্ষিত হন নাই, তাই শ্রী সনাতনের আজ্ঞায় সিদ্ধসাধক শ্রীরূপ গোস্বামীর মন্ত্রদীক্ষায় শ্রীজীব নবজীবন লাভ করলেন। শ্রীগুরু উপদিষ্ট সাধন পথে শ্রীজীব নিষ্ঠাভরে অগ্রসর হলেন। ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অচিরে তাঁর অধিগত হয়।

শিষ্যসেবাতুষ্ট শ্রীরূপকে এখন দেবসেবা সম্পর্কে কোন চিন্তা করতে হয় না। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্রচর্চা করেন। আর শ্রীজীব গুরুদেবের পুস্তক সংকলনকালে প্রয়োজনমত সর্ব প্রকারে সাহায্য করেন।

সে সময়ে ভারতের নানা অঞ্চল থেকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হচ্ছেন শাস্ত্রীয় বিতর্কের জন্যে। শ্রীরূপ ছিলেন তখন বৈষ্ণব আচার্যের নেতা, কাজেই পণ্ডিতেরা তাঁর কাছেই দাঁড়াতেন। কিন্তু শ্রীরূপের এই বিতর্কে কোনও উৎসাহ ছিল না। তাই তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে আনন্দের সঙ্গে জয়পত্র লিখে দিয়ে বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতদের তুষ্ট করতেন।

গুরুগতপ্রাণ তরুণ শ্রীজীবের মনে হত, ফাঁকি দিয়ে জয়-পত্র নিয়ে নিচ্ছে। তাই সুযোগ পেলেই গুরুর অসাক্ষাতে এই পণ্ডিতদের তিনি পর্যুদস্ত করে ছাড়তেন স্বীয় প্রতিভার দ্বারা। কিন্তু এরূপ করতে গিয়ে একবার তিনি বিপদে পড়েন। দাক্ষিণাত্যের শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য বল্লভভট্ট শ্রীরূপের কাছে এলে তাঁকে জয়পত্র তো লিখে দিলেন, উপরন্তু তাঁর লিখিত "ভক্তি রসামৃতে"র কয়েকটি শ্লোক শোনালেন। মঙ্গলাচরণের একটা শ্লোকে তাঁর মত বৈষম্য ঘটল। শ্রীরূপ সবিনয়ে ভট্টজীর সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। শ্রীজীব গুরু সমুখে চুপ করে থাকলেন। গুরু স্থানে গেলে ভট্টজীকে বিতর্কে আহ্বান করলেন ও অজস্র প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখালেন তাঁর গুরুর লেখায় কোন ভুল নেই। শ্রীজীবের অকাট্য যুক্তি জালে ও শাণিত মন্তব্যের আঘাতে ভট্টজী পরাভূত হলেন।

শ্রীরূপ স্নান সেরে ফিরে এলে ভট্টজী এই নবীন যুবকের অপ্রতিরোধ্য ও অকাট্য যুক্তি সিদ্ধান্তের কথা বলাতে শ্রীরূপ তৎক্ষণাৎ সব বুঝতে পারলেন। অসন্তুষ্ট হয়ে শিষ্যকে বললেন—"অর্বাচীন, শুধু শুধু প্রধান আচার্যকে কেন আক্রমণ করেছ? এতটুকু সংযম যদি না থাকে, তবে কেন এই ত্যাগ বৈরাগ্যময় দৈন্যময় বৈষ্ণব জীবন? কি লাভ এই তিলক-মালা কণ্ঠি ধারণের অভিনয়ে? তোমার মত মূঢ়ের মুখ-দর্শন আদি করতে চাই না। দূর হও আমার সম্মুখ থেকে।"

রোরুদ্যমান শ্রীজীব গুরুর অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞা শিরোধার্য করে দৈন্যভরে এক অরণ্য মধ্যে আশ্রয় নিলেন। শুরু করলেন কৃচ্ছ্রব্রত ও কঠোর ভজন সাধন। আত্মগ্লানির হুতাশনে অন্তর ক্ষতবিক্ষত।

"অন্নজল তেয়াগিয়া যমুনার তীরে।
গোসাইয়ের পদমাত্র ধেয়ান অন্তরে॥
পড়িয়া রহিলা দুনয়নে ধারা বহে।
শীর্ণ হইল দেহ প্রাণ মাত্র রহে॥"

কয়েক মাস পরে শ্রী সনাতন এই শিষ্য ত্যাগ সংবাদ শুনে নির্বাসন স্থানে গমন করেন। অস্থিচর্মসার শীর্ণকায় শ্রীজীবকে দেখে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। অতঃপর শ্রীরূপের কাছ গিয়ে জীবের অবস্থা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেন। আরও বলেন যে, অনন্ত অগ্নিসন্তাপে স্বর্ণ যেমন বৈবর্ণযুক্ত হয়, সেরূপ দারুণ নিরশনাদি ও মৌনব্রতাদি পালনে দুষ্ট ইন্দ্রিয় বৃত্তি যখন ও বয়সোচিত চপলতা দূরীভূত হয়ে থাকে। অগ্রজের এরূপ ইঙ্গিতে বা কথায় ইঙ্গিতে শ্রীরূপ জীবকে ক্ষমা করলেন। ছয় মাস যাবৎ কঠোর সংযমে মৃতপ্রায় জীবকে আশ্রমে এনে তাকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুললেন। তিনি যেন পুনর্জন্ম পেয়ে পূর্ববৎ সেবাকার্যে ব্রতী হলেন।

আত্মগ্লানির আগুনে পুড়ে শ্রীজীবের সাধন জীবনের

স্বর্ণসম্পদ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গুরুর দেওয়া আঘাতে শ্রীজীবের অন্তরে এবার জেগে উঠেছে মানব প্রেম ও মানব কল্যাণের পরমবোধ।

শিষ্যের এই রূপান্তর দর্শনে রূপ অতিশয় আনন্দিত। এবার তাঁর জন্য স্বতন্ত্র দেব-সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি দৈবাদিষ্টমত স্বারাধ্য দেবতা শ্রীরাধা দামোদর নামক শ্রীকৃষ্ণলীলা বিগ্রহটীর সেবা অর্চ্চণার ভার দিলেন শ্রীজীবের উপর।

বৃন্দাবনের শৃঙ্গার বটের এক কোণে রাধাদামোদরের একটী সুরম্য মন্দির স্থাপন করা হল। সেই মন্দিরেরই প্রকোষ্ঠে শ্রীজীব গড়ে তুললেন তাঁর বিরাট গ্রন্থশালা। বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থরাজি তিনি সংগ্রহ করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে সকলকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে সনাতন গোস্বামী অনন্তলোকে যাত্রা করলেন। তাঁর এক বৎসর পরেই রূপগোস্বামীও তাঁর অগ্রজের অনুসরণ করলেন। অন্যান্য গোস্বামীগণও বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে পড়েছেন। তৎকালীন গোস্বামীগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীজীবই পূর্ণ বয়স্ক ও কার্য্যক্ষম, ও শাস্ত্রজ্ঞানেও ছিলেন অদ্বিতীয়। তাই সকলেই একবাক্যে শ্রীজীবকে ব্রজমণ্ডলের কর্তৃত্বপদে আচার্য্যরূপে অভিষিক্ত করলেন।

সনাতন ও রূপ গোস্বামীর সময়ে তাঁদের শাস্ত্রচর্চ্চা ভক্তি রচনা ও সাধনার ফলে বৃন্দাবন ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করে। আর জীব গোস্বামীর সময়ে এর খ্যাতি চরম পর্য্যায়ে পৌছায়। ভারতের দিকে দিকে এই শক্তিধর আচার্য্যের সাধনা ও লোকোত্তর প্রতিভার কাছে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ মস্তক অবনত করে।

বহু ভক্ত বৈষ্ণব তখন এই বৃন্দাবন মহাতীর্থে আসতে লাগলেন—কেহ ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষা নিতে, কেহ বা ভক্তিধর্ম্মের শাস্ত্র পঠন পাঠনের জন্য। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গণ আসেন—চলে বিচার বিতর্ক। কিন্তু শ্রীজীবের অসাধারণ সাধনবল ও প্রতিভার কাছে অনেক মহা মহা পণ্ডিত তার্কিক পরাজয় স্বীকার করেন। নানা অঞ্চল থেকে সাধনতত্ত্ব ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা চেয়ে পত্রাদি আসে তাঁর কাছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে পারঙ্গম হতে দলে দলে তরুণ তাপসগণ আসে এই মনীষীর পরমাশ্রয়ে।

বৃন্দাবনের পুনঃ জাগরণের অর্থাৎ গোস্বামীগণের দিগন্তবিস্তৃত সাধন নিষ্ঠা ও খ্যাতির কথা শুনে সম্রাট আকবর পর্যন্ত অন্তরঙ্গিংদা বশতঃ আগ্রা থেকে ১৫৭৩ খ্রীঃ সদলবলে শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হলেন। আচার্য্যদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীজীব সাক্ষাৎ করেন তাঁর সঙ্গে। এই মহাবৈষ্ণবের দিব্যশ্রীমণ্ডিত মূর্ত্তি, দৈন্যময় বেশ, ও লোকোত্তর প্রতিভা ও তেজস্বিতা দেখে বাদশাহ মুগ্ধ হন।

ঐতিহাসিক গ্রাউস সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় যে আকবর যখন শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাভূমি নিধুবন দর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন গোস্বামীগণের সর্ব্ব-সম্মতিতে বাদশাহকে চোখে কাপড় বেঁধে লীলাস্থলের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দেন। এই ভূমিতে দাঁড়াইবা মাত্র ভিন্নধর্মী সম্রাট অনুভব করেন, "সত্যই সেদিন তিনি এক অতি পবিত্র এবং বিস্ময়কর অলৌকিক লীলাভূমি স্পর্শ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।"

সম্রাট এতই প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁর আগমনকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য তিনি কিছু দান করার আগ্রহ প্রকাশ করেন বা অন্য কিছু প্রয়োজন হলেও জানাতে বলেন। সর্ব্বস্ব ত্যাগী কাঙাল বৈষ্ণবগণের কোন প্রয়োজনই নাই জানাতে সম্রাট পুনরায় জানান—"যদি তাঁরা কিছু গ্রহণ করেন তাহলে তিনি খুব খুশী হবেন।"

বাদশাহের পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়িতে শ্রীজীব জানালেন "বৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণ যাতে নিরুপদ্রবে ধর্ম্মাচরণ ও শাস্ত্র-চর্চ্চা করতে পারেন—অর্থাৎ বৃন্দাবনের অরণ্যে অনেকে মৃগয়া করতে এসে প্রাণিহত্যা করেন সেটা যদি প্রাচীন হিন্দু রাজগণের ন্যায় বন্ধ করতে পারেন তাহলে ভাল হয়"।

মহারাজাধিরাজ তৎক্ষণাৎ 'ফর্মান' জারি করে দিলেন "ব্রজমণ্ডলে প্রাণী হত্যা ও গাছকাটা নিষিদ্ধ। আর

বৃন্দাবনের ভক্তেরা যেচ্ছামত দেবদেউল নির্মাণ করতে পারবেন।"

শ্রীজীবের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর সাংগঠনিক কুশলতা ও ব্যবহারিক জ্ঞান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ও শাস্ত্রগ্রন্থ রচনায় তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। তখনকার দিনে গ্রন্থরাজি বেশীর ভাগ লিখিত হত তালপত্রে বা ভূর্জপত্রে। শ্রীজীবের চেষ্টায় মুঘল রাজধানী থেকে কাগজ আনীত হয় ও ফলে কেন্দ্রীভূত বৃন্দাবনের শাস্ত্রগ্রন্থ সমগ্র গৌড়দেশে প্রচারের কাজ ত্বরান্বিত হয়।

সনাতন ও রূপ গোস্বামীর গ্রন্থরচনার সময়ে শ্রীজীব ছিলেন এক অপরিহার্য সহকারী। সনাতনের পাণ্ডিত্য আর রূপের কবিত্ব শক্তির বিস্ময়কর সমাহার দেখা গিয়েছিল শ্রীজীবের জীবনে। আর এই অনন্য সাধারণ উত্তরাধিকারের সঙ্গে মিলন ঘটেছিল তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠার ও মনীষার। তাই তো তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে এমন অসামান্য সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এইভাবে শ্রীজীব শাস্ত্রচর্চায় জীবনের প্রায় ষাট বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। পঁচিশটিরও বেশী মূল্যবান শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে তাঁর সন্দর্ভ বিচারগ্রন্থ, টীকা, ব্যাকরণ ভাষ্য, সংগ্রহ ও স্তব এবং গোপাল চম্পু ইত্যাদি লীলাগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বহু প্রশংসিত।

"ভাগবত সন্দর্ভ" হচ্ছে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি পূর্বসূরীগণ বৈষ্ণব মতবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে যে অসাধ্যসাধন করে গেছেন, তা সমাপ্ত হয় শ্রীজীবের দ্বারা। তাঁর "ষট্ সন্দর্ভ" গ্রন্থই বহু প্রশংসিত বৈষ্ণব দর্শনগ্রন্থ। তত্ত্ব, ভাগবত, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি এই ছয় সন্দর্ভে বিভক্ত। ষট্-সন্দর্ভের সিদ্ধান্তানুসারে 'ক্রমসন্দর্ভ' নামেও ভাগবতের এক টীকা রচনা করেন। নিখিল অখিলবিদিত এই টীকাগ্রন্থে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক, ভগবানের স্বরূপ আবির্ভাব, বৈকুণ্ঠ মাহাত্ম্য, শ্রীমূর্তির নিত্যত্ব ও পূর্ণত্ব, লীলার প্রয়োজন, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, রাধিকার সর্বোৎকর্ষ, গোলোকলীলা, শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উপায়, প্রেমাভক্তিভাব, প্রীতিমুক্তির তারতম্য; সখ্যাদিগের ভেদ প্রভৃতি জটিল ও কঠিন ও অজ্ঞাত অন্যান্য তত্ত্বসকল প্রাঞ্জল ভাবে অভিব্যক্ত করা হয়েছে। ভারতের অমর কবি শ্রীজীবের পাণ্ডিত্য ও ভক্তিধর্মনের সারভাগ এই বিশ্ববিখ্যাত 'ভাগবত সন্দর্ভে' নিহিত আছে। নানা বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সাধনতত্ত্বের নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই বলা হয়—

"ক্রমসন্দর্ভ আর ষট্সন্দর্ভ আদি।
নানা গ্রন্থে ভক্তি স্থাপি নিরসিলা বাদী'।

বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীজীবের অবদান হিসাবে যে সকল গ্রন্থরাজি সুপ্রসিদ্ধ যেমন 'শ্রীহরি নামামৃত ব্যাকরণ', 'শ্রীগোপাল বিরুদাবলী', 'শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ', 'শ্রীমাধব মহোৎসব', 'শ্রীসঙ্কল্প কল্পদ্রুম', 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা পঞ্চাধ্যায় টীকা', 'শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী', 'শ্রীলোচন-রোচনী', 'শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নামান্তর ষট্ সন্দর্ভ' (সমগ্র ভাগবতের টীকা) 'শ্রীসর্বসম্বাদিনী', 'শ্রীসুখবোধিনী', 'পদ্ম পুরাণ গ্রন্থ' (যোগসার স্তোত্র টীকা), 'অগ্নিপুরাণস্থ' (গায়ত্রী ব্যাখ্যা বিবৃতি), 'শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা' 'ধাতু সংগ্রহ' 'সূত্র মালিকা' 'ভাবার্থ সূচক চম্পু', 'শ্রীগোপাল-চম্পু' ইত্যাদি নানা গ্রন্থ।

শ্রীজীবের সাধনার শেষ দান 'শ্রী গোপাল-চম্পু'। ইহা এক লোমহর্ষ গদ্য পদ্যময় সুবৃহৎ কাব্যলিপি। ইহার পূর্বার্দ্ধে বাল্যলীলা ও অপরার্দ্ধে ব্রজলীলার রচনা সমাপ্ত হয়। এই মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী উন্মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন—"গোপাল চম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন আছে ব্রজরসপূর॥"

তাঁর টীকাগ্রন্থগুলি মূল বিষয়টীকে এক অচিন্তনীয় নবালোকে উদ্ভাসিত করে প্রেমপিপাসাতুর সুধী সাধকগণের বহুদিনের সঞ্চিত অভাব বিমোচন করেছেন।

এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমভক্তির সাম্রাজ্য দূরদূরান্তে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। শ্রীজীব স্বীয় সাধনশক্তি মনীষা ও কর্মশক্তি প্রভাবে প্রায় একক ভাবে ধারণ করে আছেন

তাঁর পরিচালন রশ্মি।

ইহা ব্যতীত ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলিও সমভাবে সমাদৃত হতে লাগল। শ্রীরূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ দাস, স্বরূপদামোদরের কড়চা, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গল, পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গোস্বামীগণের বিভিন্ন গ্রন্থগুলিও খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

তৎকালীন গোস্বামীগণের মধ্যে শ্রীজীব কনিষ্ঠ হলেও তাঁর কর্মকুশলতার দ্বারা এই বিপুল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যকে এক-দেশদর্শী না করে এবার বাংলার বৈষ্ণব সমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন, যাতে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন হবে। এই শুভ মহৎ সঙ্কল্পে সকলেই পূর্ণ সমর্থন করলেন।

ইতিমধ্যে তিনজন তরুণ ভক্ত বৈষ্ণব সাধক যথাক্রমে শ্রীনিবাস, নরোত্তম, ও শ্যামানন্দ শ্রীজীবের পরমাশ্রয়ে শিক্ষা দীক্ষা ও ভক্তিশাস্ত্রে ও তত্ত্বে অপার বুৎপত্তি লাভ করেন।

শ্রীজীব জীবের কল্যাণ সাধনায় এই ঐশীকর্মের সহায়করূপে এই তিন মহাসাধকের আজীবন সাহায্য পেলেন। সর্ববাদী সম্মতিক্রমে এই তিন তাপসের উপরই পড়ল এই কঠিন দায়িত্বভার—বাংলাদেশের সর্বত্র ভক্তি শাস্ত্রের প্রচারের।

ব্রজভূমির নিয়ামক শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে ভূষিত করলেন আচার্য্য উপাধিতে, নরোত্তম হলেন নরোত্তম ঠাকুররূপে ও উড়িষ্যার সাধক কৃষ্ণদাস হলেন শ্যামানন্দ গোস্বামীরূপে পরিচিত।

গৌড়দেশে ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের দায়িত্ব তাদের উপর পড়াতে তিনজনেই খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। আর বৃন্দাবন ত্যাগ করে যেতে হবে শুনে তাঁরা মর্মাহত হয়ে পড়লেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সম্মত হতে হল।

সুব্যবস্থাপক শ্রীজীব বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারের সমস্ত সুবন্দোবস্ত করলেন। ব্রজবাসীর সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থকারদের গ্রন্থরাজি একটী কাষ্ঠ সম্পুটে তালাবন্ধ করে গোযানে বাংলাদেশে প্রেরণের উদ্যোগ করলেন। সঙ্গে তিন তাপস বন্ধু গৌড়ের কর্মক্ষেত্রের দিকে শুভক্ষণে গোবিন্দজী ও গোস্বামীগণের আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা করলেন।

দীর্ঘপথ অগ্রসর হবার পরে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজ্যের রাজা সীমান্তে পৌছাবার পর সেখানে একস্থানে তাঁরা বিশ্রাম করছিলেন, হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বৈষ্ণবগণ সযত্নে ও সতর্কতার সঙ্গে বিরাট সিন্দুকটি নিয়ে যাচ্ছেন দেখে দস্যুরা অনুমান করল সাধুরা কোন গোপন ভাণ্ডার নিয়ে যাচ্ছে। গভীর রাতে বনমধ্যে তারা বৈষ্ণবদের উপর হামলা করে শাস্ত্রপূর্ণ সম্পুটটি লুট করে নিয়ে যায়।

এই দস্যুরা প্রকৃতপক্ষে মল্লরাজবীর হাম্বিরেরই অনুচর বর্গ। লুণ্ঠিত সিন্দুকটি খুলে তারা হতাশ হয়ে দেখতে পায় ধনরত্নাদির পরিবর্তে গাদা গাদা শাস্ত্রগ্রন্থ।

এই অমূল্য গ্রন্থরাজির শোকে শ্রীনিবাস আদি সকলের আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়। এই দুঃসংবাদ বৃন্দাবনে পৌছিলে গোস্বামীগণের মধ্যে নেমে আসে আত্মজনবিয়োগ ব্যথার গভীর শোকের ছাপ। সকলেই হতাশ হয়ে পড়লেও শ্রীজীব কিন্তু ব্যথিত হলেও তেমন মর্মাহত হন নাই। প্রত্যুৎপন্নমতি শ্রীজীব ভাবলেন—কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই ঘটনার মূলে অবশ্যই কোন মঙ্গল নিহিত আছে। নিঃস্ব বৈষ্ণবগণের যথাসর্বস্ব বিত্তসম্পদ পুঁথিপত্র অপহরণ করে তস্করদের কোন লাভ নাই।

শ্রীনিবাসের অক্লান্ত চেষ্টায় গ্রন্থগুলি শীঘ্রই উদ্ধার হয়। বিষ্ণুপুর রাজা একদিন শ্রীনিবাসের ভাগবত ব্যাখ্যা শুনে ও তাঁর মধুর ভাবণে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান। আচার্যের কাছে গ্রন্থ অপহরণের বৃত্তান্ত শুনে অবলীলাক্রমে তাঁর পদতলে ক্ষমাভিক্ষা করেন ও গ্রন্থগুলি লুণ্ঠনের ইতিহাস বলে সেগুলি ফেরত দিলেন। উপরন্তু শ্রীনিবাসকে গুরুরূপে বরণ করলেন। তারপরেই মল্লরাজের সহায়তায় মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি সাহিত্যসম্পদের প্রচার সত্বর এখান থেকেই শুরু হল।

(শেষাংশ ২৫ পাতায়)

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ সাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(একুশ)

সেদিন মহা হুলুস্থুল নবদ্বীপে।

কি ব্যাপার?

না নবদ্বীপে এসেছে এক পণ্ডিত। এক কাশ্মীরি মহাপণ্ডিত। কেশব ভট্ট নাম। সুদূর কাশ্মীর থেকে এসেছে সে। পথে কতো পণ্ডিতের দম্ভ তার তর্কের ঝড়ে ধূলির মতো উড়ে গেছে।

তাদের কাছ থেকে সে জয় পত্র পেয়েছে। নজরানা পেয়েছে। পেয়েছে হাতী-ঘোড়া আরও মূল্যবান সম্পদ।

সেই সম্পদ নিয়েই কেশব ভট্ট নবদ্বীপে এসে পা দিল। কে আছো হে? এসো আমার কাছে। আমি কাশ্মীরি কেশব ভট্ট। নবদ্বীপে এসেছি তোমাদের মোকাবিলা করতে। ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত যে শাস্ত্রে ইচ্ছে লড়তে পারো আমার সঙ্গে।

আর সে বুকের পাটা যদি তোমাদের না থাকে, তা হ'লে লিখে দাও, জয় পত্র লিখে দাও। যেমন দিয়েছে আর আর দেশের পণ্ডিতেরা। তাদের মতো তোমরাও পরাভব মেনে নাও।

সে আহ্বান ছড়িয়ে পড়েছে নবদ্বীপের পণ্ডিত মহলে। তা নিয়েই এতো হুলুস্থুল।

কেউ নাকে নস্যি গুঁজে পরিচিত সংস্কৃত বুলি আওড়াচ্ছে: বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। বিদ্যা দেবে বিনয়। শূন্য বৃক্ষের মাথা খাড়া। কিন্তু যে বৃক্ষ ফলদান করে, মাথা তার ফলভারে নুইয়ে থাকবে। কাজেই—

কথা শেষ না হতেই কথা সুর করে আর এক পণ্ডিত। মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তোলার বৃথা চেষ্টা করে বলে, 'অহঙ্কারের গায় পচা গন্ধ। বিদ্যার অহঙ্কার? পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার? সেতো আরও খারাপ। আমি বাপু ও সবের মধ্যে নেই। তবে হ্যাঁ তোমার যদি কিছু দেবার থাকে, জগতকে যদি কিছু জানাবার থাকে, তবে পুঁথি লেখো। ছাত্রের মতো ছাত্র তৈরি করো। আমার বাপু সেই পথ। সোজা পথ।'

নবদ্বীপের সব টোলে, সব পণ্ডিতেরই এই এক ধরণের কথা।

কেশব ভট্টের মোকাবিলা করার সাহস নেই কারো। তবুও নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্যে মুখে শুধু কথার ফুলঝুরি।

পথ দিয়ে চলেছে কেশব ভট্টের বিজয় বাহিনী। হাতী, ঘোড়া। লোকজন। নিশান আর নিশান। যেন রাজা ঘরের বিজয় উৎসব।

'কে আছো? বেরিয়ে এসো। কেশব ভট্টের মোকাবিলা করো।'

না, নেই কেউ নেই। পণ্ডিতেরা ঘরে দুয়ার এঁটে আছে। কেউ বা অহঙ্কারের দোষ প্রদর্শনে ব্যস্ত।

কাজেই নবদ্বীপের মান বুঝি যায়। ধূলায় গড়ায়।

'না।'

কেশব ভট্টের বিজয় যাত্রার পথ রোধ করে দাঁড়ালো এক তরুণ অধ্যাপক।

বিরস বিষণ্ণ পথের জনতা এবার হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

'নিমাই, নিমাই। নিমাই এসেছে। নিমাই-ই দিগ্

বিজয়ীর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

হাতীতে উপবিষ্ট দিগ্‌বিজয়ী।

নিমাই তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, আর কেউ না থাক, নবদ্বীপে আমি আছি। আমাকে পরাজিত করে আপনাকে বিজয় পত্রিকা নিতে হবে।'

'তুমি?'

নিমাইকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে হাসলো দিগ্‌ বিজয়ী। তার সঙ্গে তাল রেখে কেশব ভট্টের সঙ্গীরাও হেসে উঠলো।

কেশব ভট্ট বললো, 'তুমি কে হে? কতো মহারথী তলিয়ে গেলো, আর তোমার এ দুঃসাহস?

'আমি নিমাই।'

কেশব ভট্টের প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়েই উত্তর করলো নিমাই। বললো, 'জানি, মহারথীদের অনেক রথের চাকা আপনি ভেঙেছেন। আমার সে রথও নেই। সে গৌরবও নেই। তবুও আমি আপনার সমনে এসে দাঁড়িয়েছি। কারণ নবদ্বীপের সম্মানকে আমি এ ভাবে বিকিয়ে দিতে পারি নে।'

'তুমি লড়বে?'

'সেই রকমই তো ইচ্ছে।'

'তাই হোক।' বলে হাতী থেকে নামলো কেশব ভট্ট। অদূরে গঙ্গা। কূলপ্লাবিনী গঙ্গা কল কল করে বয়ে চলেছে। কেশব ভট্ট বললো, 'চলো, ঐ গঙ্গা তীরেই চলো; ও খানেই গাছের ছায়ায় বসা যাবে।

'চলুন। বলে নিমাই গঙ্গা তীরে চললো। পেছনে উৎসুক আকুল জনতা।

গঙ্গায় এখন ঢেউ নেই। প্রশান্তি। যেন সবুজ মাঠের পরে কে একখানি মস্ত রূপোর পাত বিছিয়ে রেখেছে। ধীরে বইছে সমীরণ।

গঙ্গা তীর এখন স্নিগ্ধ।

সেই স্নিগ্ধ গঙ্গা তীরেই মুখোমুখী বসেছে দু জন। কেশব ভট্ট আর নিমাই। তর্ক-যুদ্ধের দুই যোদ্ধা। একজন প্রবীণ। আর একজন নবীন।

নিমাই বললো গঙ্গা তীরে বসেছি। গঙ্গা নিয়েই কাব্য হোক। গঙ্গার মহিমা নিয়ে শ্লোক রচনা করুন।

প্রস্রবন যেন বাঁধ ভাঙলো।

গঙ্গার মাহাত্ম্য নিয়ে দ্রুত শ্লোক রচনা করে চললো কেশব ভট্ট। কি তার অলংকার! কি তার শব্দ সংকার! তার কাব্য রসে গঙ্গাকূল যেন প্লাবিত হয়ে গেলো।

নিমাই বললো, 'থামুন।'

শত শ্লোক রচনা করে এবারে থামলো কেশব ভট্ট।

নিমাই বললো, 'আপনি বড়ো পণ্ডিত। বড়ো কবি তাই এতো সুন্দর কবিতা বেরিয়েছে আপনার মুখ থেকে। গঙ্গা ধারার মতোই এ কবিতা স্বচ্ছন্দ। কিন্তু'—বলে থামলো নিমাই। একবার কেশব ভট্টের মুখের দিকে তাকালো।

অধীর আগ্রহে কেশব ভট্টের দুটি চোখ যেন জ্বলছে। নিমাই বললো, 'দেখুন, সুন্দরী মহিলার গায়ে শ্বেত রোগ যেমন তার সৌন্দর্যকে ম্লান করে, সুন্দর কবিতার প্রসাদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা।'

'মানে?' নিমাইয়ের কথায় একেবারে যেন খেঁকিয়ে উঠলো কেশব ভট্ট।

বিনম্র কণ্ঠে নিমাই বললো, 'মানে নিশ্চয়ই একটা আছে। নইলে মিছেই কি আমি উপমার আশ্রয় নিয়েছি'।

'তুমি কি বলতে চাও যে আমার কবিতায় কোন ত্রুটি আছে?'

'হ্যাঁ' বলে একটু থামালো নিমাই। একবার হাসলো। তারপর বললো, 'আপনার কবিতা সুন্দর। অপূর্ব তার ভাব। মুক্ত তার ছন্দ। কিন্তু—'

কেশব ভট্ট বললো, 'কিন্তু? কিন্তু কি? নিমাই, নবদ্বীপে এসে, শুধু নবদ্বীপে এসেই কেন, দূর থেকেই আমি তোমার পাণ্ডিত্যের খবর পেয়েছি। তুমি বয়সে কাঁচা, বিদ্যায় প্রাজ্ঞ। কিন্তু তোমার পাণ্ডিত্যাভিমান এতো বেশী যে তুমি আলো দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভট্টের

কবিতায় দোষ ধরতে ?'

নিমাই আবার সেই বিনয় কণ্ঠেই বললো, 'আজ্ঞে হাঁা, সুন্দরের মধ্যে যা অসুন্দর, গোলাপের মধ্যেই যে কীট তা-ই মনকে খোঁচা দেয় সব চেয়ে বেশী। অসুন্দরের বিকৃতিই মনকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয়। আর সত্যি বলতে কি, আপনার কবিতা আমাকে তাই দিয়েছে।'

'নিমাই !' কেশব ভট্টের কণ্ঠে প্রায় ধমকের ঝাঁঝ। নিমাইয়ের ঠোঁটে আবার সেই হাসি মিষ্টি হাসি।

হাসতে হাসতেই নিমাই কেশব ভট্টের একটি শ্লোক আবৃত্তি করে গেলো।

কেশব ভট্ট মুগ্ধ। বিস্মিত। বাকহীন। কি আশ্চর্য স্মরণশক্তি ! একবার শোনার সঙ্গে সঙ্গেই নিমাই কেশব ভট্টের পুরো কবিতাটি মুখস্থ করে ফেলেছে !

কেশব ভট্টের চোখে এখন আর জ্বালা নেই। জ্বালা গিয়ে বিস্ময় এসেছে। সেই বিস্ময়ের আলোই চিক্‌চিক্ করছে তার বড়ো বড়ো দু'টি চোখের তারায়।

আবৃত্তি শেষে বিশ্লেষণ সুরু করেছে নিমাই। পাকা আলংকারিকের ন্যায় কবিতার বিচার করছে। তার দোষ-ত্রুটি একটি একটি করে প্রকাশ করছে।

কেশব ভট্ট এবারেও নিশ্চুপ। তার চোখে এখনও সেই বিস্ময়ের ঘোর।

এ বিস্ময় হয়তো তার কোন দিনই আর কাটবে না। কারণ যাত্রিক এই মহাপণ্ডিত আজ নবদ্বীপের এক তরুণ অধ্যাপকের কাছে পরাজিত। উৎসুক জনতার কাছে অপমানিত।

এ অপমানের জ্বালা কি ভুলবার ?

(বাইশ)

'মা !'

'কি রে নিমু ? কিছু বলবি ?'

'হাঁা মা।'

'বল না।' বলে শচীদেবী নিমাইয়ের কাছে এসে বসলেন। নিমাই বললো, 'এবারে কিন্তু আর বাধা দিতে পারবে না।'

শচীদেবী নিমাইয়ের কথার খেই ধরতে পারলেন না। শুধু বিস্ময় ভরা চোখে চেয়ে রইলেন পুত্রের মুখের দিকে।

নিমাই-ই বললো, 'বঙ্গদেশে যাবো স্থির করেছি। দেখো আবার যেন না বলে বসো না।

পুত্রের কথায় শচীদেবী যেন শিউরে উঠলেন।

বললেন, 'সে কি রে ! বঙ্গদেশে যাবি কি ?'

'হাঁা মা, বঙ্গ থেকে তো কতো ডাক আসছে। নিমাইকে তাঁরা দেখতে চান। কিন্তু সাড়া দিতে পারছি কৈ ! একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে।'

পুত্রের কথায় একটু ভাবলেন শচীদেবী। বললেন, 'ওরে দেখতে চায়, তবে তাদের খবর দে'না। তারাই আসুক নবদ্বীপে। আমার বাড়িতে তাদের সমাদরের অভাব হবে না।

'কিন্তু মা'—বলতে বলতে হাসলো নিমাই। হেসেই বললো, লোক কি দু'দশ জন যে তাঁদের নবদ্বীপে আসতে বলবো। লোক যে অনেক। শত শত, হাজার হাজার। তাঁদের ক'জনকে তুমি আশ্রয় দিতে পারবে ? তা ছাড়া ঘরে তো অর্থেরও দরকার। প্রতিদিন নিজেদের ব্যয় আছে। অতিথি সৎকার আছে। এ সব ব্যয় মেটাতে গিয়ে হাতে পাতে যা ছিল, তার সব তো ফুরুলো। এখন কিছু অর্থের ব্যবস্থা না করলে কি চলে ?' বলতে বলতে থামলো নিমাই। মা'র মুখের দিকে তাকালো।

শচীদেবীর চোখে জল এসেছে। দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হ'য়ে গেছে। পুত্রের আসন্ন বিরহের কথা ভেবে মনে ঝড় উঠেছে। সেই ঝড়ের দোলায় তিনি কিছুটা বেসামাল।

নিমাই তা লক্ষ্য করলো। ছোট ছেলের মতো মা'র কাছে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলো।

বললো, 'এ কি ! কাঁদছো তুমি মা ?' চোখের জল মুছতে মুছতে শচীদেবী বললেন, 'না-রে কাঁদবো কেন ? এখন তুই বড়ো হয়েছিস্। পণ্ডিত হয়েছিস্। এখনও

কি তোকে আমি আঁচলে বেঁধে রাখতে পারি বাবা?' একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'তবে কি জানিস্ নিমু, আমি বড়ো দুর্ভাগিনী, জনমটা শুধু দুঃখে দুঃখেই কাটলো। তাই তোকে ছেড়ে দিতে আমার ভয় হয়।'

'মা-গো, আমারও তোমাদের ছেড়ে যেতে ভালো লাগে বুঝি? তবুও যেতে হয়। কি করবো সবারই তো মন রাখতে হবে। তা ছাড়া পূর্ব পুরুষের ভিটেটা একবার দু'চোখ ভরে দেখে আসি, এ আমার বহুদিনের ইচ্ছে। বঙ্গ দেশে গেলে আমার সে সাধও পূর্ণ হবে। তুমি আমায় নিষেধ করো না মা, তুমি নিষেধ করলে যে আমার যাওয়া হবে না।' বলতে বলতে নিমাই মায়ের দু'টি হাত জড়িয়ে ধরলো।

মা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'যেতে যখন ইচ্ছে হয়েছে, তাহ'লে যা বাবা। তবে বেশী দিন থাকিস্ নে কিন্তু। তোকে চোখে না দেখলে যে আমি থাকতে পারি নে রে নিমু।'

শচীদেবীর চোখ থেকে আবার ঝর্‌ঝর্ করে জল গড়িয়ে পড়লো।

তা দেখে নিমাইয়ের চোখেও জল এসে গেছে।

রাতে লক্ষ্মীদেবীও শুনলো কথাটা। শুনে যেন তার প্রাণ উড়ে গেলো। কাঁদলো, ফুলে ফুলে কাঁদলো লক্ষ্মীদেবী।

নিমাই কাছে গেলো তার।

বললো, 'তুমি কাঁদছো লক্ষ্মী'?

লক্ষ্মীদেবী এ কথার কোন জবাব দিল না।

নিমাই-ই আবার বললো, 'এই, কাঁদছো কেন'?

চন্দ্র-আনন জলে ভেসে গেছে লক্ষ্মীদেবীর। কথা বলতে গিয়েও যেন কথা বলতে পারছে না। কথা বলতে গেলে চোখের জলই শুধু বলকে পড়ে, মুখের কথা বেরোয় না!

নিমাই ডাকলো, 'লক্ষ্মী।'

অনেক কষ্টে লক্ষ্মীদেবী উত্তর করলো, 'প্রভো!'

'চোখের জলে আমার সংকল্পকে ভাসিয়ে দিয়ো না লক্ষ্মী!'

'আমি যে সইতে পারিনে প্রভু।'

'সইতে হবে। যে প্রেম ধরিতীকে আটকে রাখে, সে প্রেম বন্ধন। নিজের স্বার্থ ভুলে যে প্রেম তাকে জগতের হিতে এগিয়ে দেয় সেই প্রেমই সত্যিকারের প্রেম। সেখানেই সার্থক প্রেম ফুটে ওঠে শতদলের মতো।'

'আমি জানি প্রভু।'

'তবে— ।'

আমি অতো বড়ো নই, অতো বড়ো হতে পারি নে।'

'কিন্তু আমি যে তোমায় সেই রূপেই দেখতে চাই লক্ষ্মী।'

লক্ষ্মীদেবী এবারে নীরব।

নিমাই-ই আবার বললো, 'কি, চুপ করে রইলে কেন? আমার কথার উত্তর দিলে না?'

'উত্তর তো আমি দিয়েছি প্রভু।'

'না, বড়ো তোমায় হতে হবে। নিজের মনকে পরের কল্যাণে বিলিয়ে দিতে হবে। সেখানেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব। জীবনের তো সেখানেই সার্থকতা।'

'আপনি পণ্ডিত, আপনার মুখে এ কথা মানায়।'

'ছিঃ, ও কথা বলো না। অমন করে বলো না। সবার কাছে আমি পণ্ডিত হতে পারি, কিন্তু তোমার কাছে আমি প্রিয়। আর তুমি আমার লক্ষ্মী। আমার গৃহলক্ষ্মী।'

'প্রভো!'

'বাধা দিয়ো না লক্ষ্মী। বঙ্গ তো বেশি দূরের দেশ নয়।' লক্ষ্মীদেবী আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বললো, 'আপনার অদর্শন যে আমার সয় না প্রভু।'

'আমার জন্যেই তোমায় তা সইতে হবে। আরে, তারি তো একটা বছর। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে যাবে।'

'এ-ক-টা ব-ছ-র' বলতে বলতে লক্ষ্মীদেবীর বুক

থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেলো।

নিমাই বললো, 'আমার কথা মনে হলে আকাশের ঐ চাঁদের দিকে তাকাবে। মনে করবে, তোমার প্রাণ-কান্ত আকাশের ঐ চাঁদের মতোই অন্ধকারে আলো বিলাতে গেছে। কিন্তু দূরে গিয়েও সে দূরে যায় নি। দূরে বসেও সে ভাবছে তোমার কথা। দূরে গিয়ে সে তোমার আরও কাছে এসেছে।'

নিমায়ের মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে লক্ষ্মী দেবী। নিমায়ের কথাগুলো তার কানে যেন সঙ্গীতের মতো বাজছে। সে সব কথার অর্থ করতে পারছে না। অর্থ করতে পারছে না, তবুও স্বামীর কণ্ঠস্বর কথাকে ছাপিয়ে তার হৃদয়কে গভীর ভাবে আন্দোলিত করছে।

নিমাই-ই আবার কথা বললো, 'লক্ষ্মী।'

'নাথ।'

'বলো তোমার মনে ক্ষোভ নেই।'

'না।'

'এই তো আমার প্রাণ-লক্ষ্মীর মতো কথা। তাই না তোমায় এতো ভালোবাসি।'

'আমি—আমি ধন্য প্রভু। আমার নারী জনম সার্থক।

'তাই নাকি?' বলে একবার হাসলো নিমাই। বললো, 'এই না তুমি কথা বলতে শিখেছো। কে বলে তোমাকে অবলা, অবোলা।'

নিমাইয়ের চোখে চোখ রেখে লক্ষ্মীদেবী বললো, 'তাই বুঝি?' 'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তুমি আমার লক্ষ্মী, এ-তো সেই লক্ষ্মীর মতোই কথা।'

লক্ষ্মীদেবী আবার বললো, 'প্রভু, আমি ধন্য।'

'আমিও।' বলে লক্ষ্মীদেবীর দু'খানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

চাঁদের আলো ঘরে ঢুকে ঘরকে একেবারে আলোয় আলোময় করে তুলেছে।

বিশ বছরের তরুণ অধ্যাপক নিমাই।

সেই নিমাই গেলো পূর্ববঙ্গ সফরে।

সেখানে গেলো সেখানেই বিপুল অভ্যর্থনা। ছুটলো এসে পদ্মার দল। মিললো ভক্তমণ্ডলী।

নিমাই যেন তাদের চোখের মণি। কেউ যেন তাকে কাছ ছাড়া করতে চায় না।

প্রায় বছর খানেক তাই পূর্ববঙ্গেই কাটিয়ে দিল নিমাই। এই এক বছরে সেখানকার বহু স্থান ঘুরলো সে। একবার শ্রীহট্ট গিয়ে পিতৃপুরুষের ভিটেও দেখে এলো। তারপর বছর শেষে একদিন সন্ধ্যায় সে নিজের বাড়িতে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু একি?

এই সন্ধ্যায়ই সারা বাড়ি নিস্তব্ধ কেন? বাতাসও যেন ধীরে বইছে!

কি, কি হলো এ বাড়ির?

চমকে উঠলো নিমাই।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে সে ডাকলো, 'মা, মা গো!'

শচীদেবী বাইরে এলেন। একবার আবেগে প্রায় চিৎকার করেই উঠলেন, 'কে রে, নিমু এলি? আমার নিমু এলি?' কিন্তু পরক্ষণেই নিশ্চুপ। কণ্ঠ মূক। চোখে শুধু অঝর ধারায় জল পড়ছে।

নিমাই এবার এগিয়ে এলো। মা'র পায়ের ধূলি নিল। বললো, 'মা? কি হয়েছে মা?'

শচীদেবী কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন।

বললেন, 'ওরে নিমু, বৌমা নেই রে। আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়েছে।'

নিমাইয়ের পা দু'টি যেন হঠাৎ পাথর হয়ে গেলো। হৃদয় এক মুহূর্তের জন্যে আন্দোলিত হয়েই আবার হলো শান্ত। পুত্রের কাছে সব কথাই খুলে বললেন শচীদেবী।

নিমাই পূর্ব বাঙ্গলায় যাবার পর লক্ষ্মীদেবীর এক মুহূর্তও বিশ্রাম ছিল না। সব সময়ই শাশুড়ীর সেবা যত্নে ব্যস্ত।

শচীদেবী কিছু বলতে গেলেই লক্ষ্মীদেবী হাসতো। হেসেই উত্তর দিত, 'নিজের ছেলে কাছে নেই বলে পরের মেয়ে কি সেবা করতে পারে না?

'ছিঃ, ও কথা কি বলছো বৌমা, তুমি আমার পর হতে যাবে কেন?'

'পর বৈ কি! নিজের মেয়ে হলে কি আর মায়ের সেবায় অমন করে বাধা দিতেন? বাধা দিতে পারতেন?'

বৌমা'র কথায় হেসে ফেলতেন শচীদেবী। বলতেন, 'না, না, আমি বাধা দিচ্ছি কৈ? আমি বাধা দেবো কেন?'

একটু থেমে লক্ষ্মীদেবীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে শচীদেবী আবার বলতেন, 'তবে কি জানো মা, দেহ তো কারো অক্ষয় অমর নয়। দেহ থাকলেই রোগ-বালাই আছে। তাই নিজের দেহের দিকেও তো একটু চাইতে হবে। এমন ভাবে পরিশ্রম করলে তা আর ক'দিন টিকবে?

লক্ষ্মীদেবী বলতো, 'আমার কিছু হবে না। তা ছাড়া এখন আমি কি করছি মা যে আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে'।

'করো নি মানে? এই যে দিন রাত খেটে মরছো! সময় মতো চান নেই, আহারাদি নেই, অমন করলে কার শরীর টেঁকে?

'ও' সেই কথা? আচ্ছা, এখন থেকে আমি আপনার কথা মতোই চলবো।'

শচীদেবী আনন্দে পুত্রবধূর মাথাটা নিজের বুকে টেনে নেন।

সেদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিল লক্ষ্মীদেবী, প্রভু নেই ঘুম নেই, তার চোখে। অনেক দিন নীলাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই তার সারা রাত কেটে গেছে। সেদিনও ঘুম হয়নি লক্ষ্মীদেবীর।

সাত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে সে সংসারের কাজে মন দিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ—হঠাৎ কি একটা যেন তার পায়ে দংশন করলো।

(চলবে)

বৈষ্ণব সাহিত্যে গোস্বামী প্রভু শ্রীজীবের অবদান

(১৯ পাতার পর)

শাস্ত্র-গ্রন্থসকল ফিরে পাওয়ার শুভসংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছিলে শ্রীজীবসহ ব্রজবাসীগণের আনন্দের সীমা নাই। শ্রীজীব সকলকে ডেকে বলতে লাগলেন—"ওগো রাধা-দামোদরজী ও মহাপ্রভুর কৃপায় সেদিনের গ্রন্থ-লুণ্ঠনের মধ্যদিয়েই আজ পাওয়া গেছে রাজ-সহায়তা। শ্রীভগবানের কাজ তিনিই কিভাবে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে সত্বর প্রচারের সুযোগ করে দিলেন।"

জীবের কল্যাণকামী শ্রীজীবের আন্তরিক ব্যবস্থাপনায় এই অনুরক্ত ভক্তত্রয়ীর দ্বারা গৌড় থেকে নীলাচল পর্যন্ত প্রতি পল্লীতে ভক্তি-মন্দাকিনীর খরতর ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। শ্যামানন্দ উড়িষ্যায়, নরোত্তম উত্তরবঙ্গে ও শ্রীনিবাস পশ্চিমবঙ্গে যেমন লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে অযাচিত ভাবে ত্রাণ করলেন তেমনই বৃন্দাবনেও শ্রীজীবের প্রচেষ্টায় নব নব ভাবের উদ্দীপনা মানবগণকে ভগবৎ প্রেমিক করে তুলতে লাগলেন।

এইভাবে মহাপ্রভুর অভীষ্ট কর্মধারাকে শ্রীজীব স্বীয় অপরিসীম নিষ্ঠা, সংগঠন কুশলতার গুণে এই দুরূহ কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হন। ইহার প্রভাবে সারা বাংলাদেশের বুকে বয়ে চলে এক নতুন প্রাণ-স্পন্দন। এক নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা জেগে ওঠে।

ভক্তি শাস্ত্রের সংকলন, প্রচার, নব প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সাহিত্যের বিস্তার—অনেক কিছুই শ্রীজীব স্বীয় জীবনে দেখে ও করে যান। তাঁরই প্রেরণায় রাজা মান-সিংহ প্রস্তুত করে দেন গোবিন্দজীর বিরাট মন্দির। বৃন্দা-বনের দিকে দিকে রাধাকৃষ্ণের নয়নাভিরাম দেব দেউল নির্মিত হতে থাকে। গড়ে ওঠে এক সুসংবদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ। ভারতীয় দর্শন ও সাধনতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই মহা-সাধক তাঁর নিজস্ব প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি রেখে যান।

এই ভাবে ঐশীব্রতের আশানুরূপ সংকলন করে বৃন্দা-বনের এই অদ্ভুত করিৎকর্মা মহাসাধক ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর স্বনামধন্য যশস্বী চিহ্নিত জীবনের ভূমিকা এবার সমাপ্তির পথে এসে দাঁড়ায়।

সুদীর্ঘ পঁচাশী বছরের অতীত কর্মময় মহাজীবন রাধাকৃষ্ণ ইষ্টদেবতা পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে চির বিশ্রামের মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে যায় ১৫৯৬ সালে। প্রাণপ্রিয় শ্রীরাধাদামোদর মন্দির প্রাঙ্গনে তাঁর নশ্বরদেহ সমাহিত করা হয়।

তাঁর নশ্বরদেহ বিলীন হলেও বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর অবদান, তাঁর অতিমানবীয় কর্মধারা চির অবিনশ্বর হয়ে আছে ও থাকবে।

পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

বাগুইআটি নরনারায়ণ আশ্রমে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য যাত্রা

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া পথ চলিয়াছি। সারা বাঙ্গালা ঘুরিয়া বাগুইআটি গ্রামে যাইতেছি। ইহা শ্রীনিত্যগোপাল-ব্রহ্মবিদ্যা-র কেন্দ্র হউক। রওয়ানা হইয়া আসার সময় সুধাংশু, শচীন ঘোষ আসে। সন্তোষ খুব সকালে আসিয়া প্রণাম করিয়া গিয়াছে। ভোর ৭৪০টার পর ২টি ট্যাক্সীতে সব গুছাইয়া এক গাড়ীতে আমি ঊষাঙ্গিণী-স্বয়ং ও অপর গাড়ীতে লেলু-লীলা-বিপু-লীলা-গোপা আসে। ১ ঘণ্টায়ই পৌঁছাই, ২টি ট্যাক্সী ভাড়া ৯৲ টাকা করিয়া ১৮৲ টাকা, মালের জন্য ১৷৹+১৷৹ =৩৲ টাকা। ঠাকুরের নূতন ফটো প্রতিষ্ঠা করি। এখানে ৪ বারই ভোগ দেওয়া হয়।··· বাগেরহাটের কালীপদ হাস নামে একটী যুবকের সঙ্গে দেখা হয়। সে বাগেরহাটে আমার বক্তৃতা শুনিয়াছে। ২ বেলাই এই আশ্রমে আসে, এটা ওটা করে। আজ বৈকালেও আসে। লীলারা ৪ টার পরে রাণাঘাট যাইবে। একটি মেয়ে টিউব ওয়েল হইতে দুই বেলা জল দেয়। কিছু চেরল গাছ লাগাইয়াছে। সন্ধ্যার পর আরতি করে ঊষাঙ্গিণী! আরতির পর 'আরতি' ও এখানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করি। আরতির পরে ও সকালে প্রার্থনার পরে আশ্রমবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব, মনে উদিত হইয়াছে! ঠাকুর বুদ্ধি যোগান। আমি কি জানি কিসে আশ্রমের স্থায়ী কল্যাণ হইবে। আমাদের আসিবার আগে জিতেনবাবু ঘরের অবস্থা দেখিবার জন্য আসেন। ঠাকুরঘরের এ্যাসবেসটেস-এর জোড়ার স্থানে দিয়া জল পড়িয়াছে। সিমেন্ট দিয়া দিতে বলিলেন। রাজেন সিমেন্ট বালী দেয়, কালীপদ আরতিতে যোগদান করে। ৯৷৹ টার পর প্রসাদ পাই। রাত্রিতে মশারী ব্যবহার করিতে হয় নাই। ···ঠাকুর আমি ঊষাঙ্গিণী প্রতিষ্ঠা তাই! লেলু ঘর গুছাইতেছে। ২৩শে এপ্রিল

৪৷৹ টার পর প্রার্থনার পর সঙ্ঘ সম্বন্ধে কিছু বলি। গোপীসঙ্ঘই অবর কৃষ্ণকে ধরিতে পারিয়াছিল। 'সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে'। দৃষ্টান্ত 'বেহযন্ত্র'; পায়ের কোনো আঙুলে খোঁচা লাগিলে সেহে টিটেনাস হয়। সমাজের যে কোনও ক্ষুদ্র অংশে আঘাত লাগিলে সমস্ত সমাজ যেদিন আহত হইবে, সেইদিনকার সমাজই জীবন-যন্ত্র। এই সঙ্ঘ রচনার জন্যই সারা জীবন চলিয়াছি। নরনারায়ণ সেবকবৃন্দ 'এক' হউন। এখানে সকলেই আশ্রমের সেবক। কর্মী জ্ঞানী ভক্ত আশ্রমের সেবা করিবে যে যাহার বৈশিষ্ট্য লইয়া। সঙ্ঘে প্রতিটি 'কাজ' বড়। কীর্তন করাও ভগবানের সেবা, মহোৎসবে রান্না করাও ভগবৎ-সেবা। কর্ম-কৌশীণ্য সঙ্ঘে চলেনা। দেহের মল পরিষ্কার না করিলে ঠাকুর ঘরে ঠাকুর-সেবা কোথায় থাকিত? সকলের অন্তরে 'ব্রহ্মযন্ত্র' সুপ্ত, তাহাকে জাগ্রত করিয়া 'ব্রহ্ম' হইতে হইবে, পুরুষোত্তম-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে হইবে। লেলু ১৷৹টায় গাড়ুলীর ওখানে যায়, খগেনবাবুর সঙ্গে ফোনে কথা কয়। শনিবার টিউব পাইতে পারে। শুক্রবার যাইতে বলিয়াছেন। ৫ টার পর নারায়ণী ও তাহার এক পুত্র, কৃষ্ণধি ও তাহার দুই পুত্র আসে। রাজেনকে প্রুফ আনিতে মশারীগ প্রেসে পাঠায়। প্রুফ সহ ৯টার পর ফেরে। সন্ধ্যায় আরতি হয়। আরতির শেষে জগন্নাথ নিত্যগোপালকী জয় বলার পর 'যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়' শ্লোকটি ব্যাখ্যাত হয়। বিশ্বের সকল কর্ম যোগস্থ হইয়া করিতে হইবে। আমিকে কেন্দ্র করিয়া আমাকেই পাওয়া যায় না, কর্ম তো দূরের কথা। নদীর জোয়ার ভাটার গতি সাগরযোগেই সম্ভব। জোয়ারের ভিতর দিয়া নদী নিজে পবিত্র হইয়া জনপদকে শস্যশালিনী করে, সকল বিষ বুকে করিয়া সাগরের জলে ঝাঁপ দিয়া

আবার বিস্তৃত হয়। মানুষও তোমারে তাটায় বিশ্বকেই সেবা করিবে নদীরই মত। নিত্যগোপাল dynamic। তাঁহার আলোই নরনারায়ণ আশ্রম বহন করিবে, বিতরণ করিবে। ২৪শে এপ্রিল।

ঠাকুর, আমি তোমা-কৈন্দ্রিক, তোমা-মূল, সমূল, ঊর্ধ্বমূল জীবন যাপন করিব। তোমা হইতে রস আহরণ করিয়া নিজে পুষ্ট ফলে ফুলে সুশোভিত হইব, বিশ্বে তাহা বিলাইয়া দিব। মৃত্তিকা-মূল বৃক্ষের ইহাই সার্থকতা। তোমার রসে জীবনের সকল বৃত্তিকে গুছাইব, সংহত করিব, তোমার ব্রহ্মসূত্রে নিজের ভিতরের সঙ্গে বিশ্বের যোগ স্থাপন করিব—নর-নারায়ণ আশ্রমের এই আদর্শ সার্থক হউক। আজ সকালে প্রার্থনায় পর এই আলোচনা করি। প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নাৎ 'সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্তঃ। যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্'। জল তোমার পূজা, মাটি কাটা ,বেড়া বাঁধা, ক্ষেত করা, চলা বলা সব তোমার পূজা হউক। সকল করা সকল খাওয়া তোমার সেবা হউক। চাই আশ্রমবাসীদের মধ্যে একপ্রাণতা, এবং সেই একপ্রাণতা দ্বারা পরিবার সমাজ রাষ্ট্রে একপ্রাণতার সিদ্ধি। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথ-হারা'। সকালে একটু বেড়াইতে বাহির হই। পায়ে জোর নাই, বেশী পারি না। রাজেন ৯টায় উজ্জ্বল ভারতের 3rd form-এর order লইয়া প্রেসে যায়। ফেরে ১৪ টায়। ৪ টায় পর নারায়ণীরা রওয়ানা হইয়া যায়। গ্রাহক হওয়া ও মুষ্টি ভিক্ষার কথা বলি। 'সমবয়-মূর্তি নিত্যগোপাল' মিষ্টা দেই। সন্ধ্যায় আরতির পরে 'ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি' শান্তিপাঠ ব্যাখ্যা করি। আমার অঙ্গ সকল আপ্যায়িত হউক, তৃপ্ত হউক। ছন্দ ঠিক রাখিয়া, মাত্রা ঠিক রাখিয়া, সকলের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া চলিলেই অঙ্গ আপ্যায়িত হয়, তৃপ্ত হয়, পুষ্ট হয়। বৈকালে কালীপদ ও বিষ্ণু বেড়ায় আলকাতরা লাগায়। ২৫শে এপ্রিল

সকালে প্রার্থনার পরে সকল অঙ্গের আপ্যায়িত হওয়ার কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করি। দিনের সকল কর্ম, সকল ব্যবহার যেন সংযত হয়, ছন্দানুবর্তী হয়। প্রতিটি বৃত্তি যেন গোপী। উহারা যখন কৃষ্ণাভিমুখী ও অন্যোন্যবদ্ধ বাহু হইয়া এক দেহের অঙ্গ হইবে, তখনই উহারা আপ্যায়িত হয়। সকল কর্ম সুকর্ম হউক, সকল চিন্তা ব্রহ্মময়ী হউক, সকল ব্যবহারের মধ্য দিয়া ব্রহ্মবিদ্যা স্ফুরিত হউক। নরনারায়ণ আশ্রমের সেবকগণ যেন স্বচ্ছন্দ হয়, তাহারা যেন পুরুষোত্তম-ছন্দে বিশ্বকে গড়িয়া তোলার জন্য বাঁচিয়া থাকে। শ্রীনিতা গোপাল ছন্দের দেবতা। তিনি আশ্রমীদের জীবনে জয়যুক্ত হউন। রেণু ও প্রতিভা ৯টার মধ্যে খায়। রেণু মমতাকে লইয়া হিন্দু বিদ্যাপীঠে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করাইয়া আসে।...সেখান হইতে পি সাহা, কিং কোং, মহেশ ভট্টাচার্য, রাইটার্স বিল্ডিং, প্রচার সমবায়, প্রিমিয়ার প্রভৃতি স্থান হইয়া ৫টার মধ্যে ফেরে। রাজেন প্রতিভাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাইয়া দেয়, সে বাঁশবেড়িয়া যাইবে। রাজেন ৬টার পর জেনারেল প্রিন্টার্সে ১০ খানা ঘরে যাইবে, ১০ খানা শেষ প্রুফ বই দিয়া আসে। প্রেস হইতে প্রুফ নিয়া ফেরে ৯টার পর। টালির ঘরটার বারান্দা মেঝের টিন দ্বারা করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। সন্ধ্যায় ভূপতিবাবু ও তাঁর স্ত্রী এবং জিতেনবাবু আসেন। এখানে কিভাবে চালাইতে হইবে, অশ্বিনী নগর বা বাণ্ডইআটি নাম হইবে কিনা আলোচিত হয়। নীরোদবাবু ভূপতি বাবুর সঙ্গে অশ্বিনী-নগর নাম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আশ্রম কোনও দলে যাইবে না, বলেন। 'নরনারায়ণ আশ্রম' নাম ছাপাইবার কথা ঠিক হয়। আরতির সময় ভূপেন বাবুরা উপস্থিত ছিলেন। আরতির পর আশ্রমের উদ্দেশ্য ও পথ-চলা সম্বন্ধে আলোচনা করি। ...২৬শে এপ্রিল

না

হিমাংশু কুমার সেন

রেখার পায়ের তলার মাটি সরে গেল খবরটা শুনে। জলন্ত উনুনে সে জল ঢেলে দিল। কাঁদুনে মেয়ে বুলিকে কোলে করে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। রাগ বুকের মধ্যে ফুঁসতে ফুঁসতে ঠোঁট কেটে বেরিয়ে পড়ল। সুধন জবাব না দিয়ে পারল না।

সংসার চলবে কি করে?

আবার জোটাতে হবে।

চাকরি এত সহজে কি আর পাওয়া যায়? বিয়ের সময় তুমি না বলেছিলে চাকরিটা পার্মানেন্ট।

তখন জানতুম পার্মানেন্ট।

দেখলে ত আমার কথা না শুনলে কি হয়? কত টিক টিক করে বলি ওগো মুখের ওপর কথা বোলো না।

তা কি করব? আমাকে তাড়াবার জন্যে রোজ পেঁাদে লাগে। খালি খ্যাচ খ্যাচ করে। কেন সেল ডাউন হচ্ছে?

সে ত বলবেই। পয়সা দিচ্ছে সেল কম হলে বলবে না?

কিন্তু আমি ত মানুষ। বাজারে দারুণ কমপিটিসন। সবাই ধার চায়। রোজ একটা করে ছোট ছোট কোমপানী গজাচ্ছে এ দেশে।

একেবারে পাকা জবাব?

হ্যাঁ।

তবু তুমি কাল একবার দেখো।

: ওদের এক গোঁ। শুনবে না। আসলে এটা একটা ট্রিকস। মার্কেট করিয়ে নিলে আমাকে দিয়ে। নতুন কোমপানীর ওষুধগুলো চালু হয়ে গেল। এবার কম পয়সায় নতুন লোক নেবে।

বললেই হল? আইন কানুন নেই?

: না, ছোট কোমপানীতে ইউনিয়ন হয় না। আর সবাই কমিশনে কাজ করে।

যত দুঃখ আমাদেরই কপালে। কই অন্য লোকেদের ত এমন হয় না?

হয় বই কি? আজকাল আকচার এই রকম। কেন তোমার বাবাকে দিল বসিয়ে দেয় নি?

রেখা বুলিকে ভোলায়। বুলি বীভৎস গরমে অস্বোয়াস্তি মেনে নিতে চায় না।

তুমি চা খাবে?

না, ভীষণ গরম।

যাও, ভেবে আর কি হবে? আজ রান্না করতে ভাল লাগল না আর। সকালের লুচি আছে। তোমার হয়ে যাবে। আমি মুড়ি খেয়ে নোব।

বুলির?

ওর দুধ আছে। মুড়ি দিয়ে খাবে?

রাত গাঢ় হয়। গাছের ঠাণ্ডা বাতাস জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকে। বুলি ঘুমুচ্ছে। ঘুম নেই দুজনের চোখে।

কোমপানী কি মানুষ নয়?

পৃথিবীটা স্বার্থের। দয়া মায়া ভালবাসা সব স্বার্থকেন্দ্রিক। ছোট কোমপানী কমপিটিশনে বড় কোমপানীর সংগে পারে না। ব্যাংকের লোনে কোমপানী গড়ে উঠেছিল। নিজের অস্তিত্ব রাখার জন্যে তাকে অমানুষ বনতে হচ্ছে। নানান রকম ছল চাতুরির আশ্রয় নিতে হয় ওদের।

তবু তুমি যদি নিজের টা বুঝতে?

চারধারে পাওনাদার। কি করে সংসার চলবে?

এ ভাবে আর কতদিন চলবে?

চেষ্টা ত করছি।

বুলিটার গা গরম।

জ্বর বেশি?

থার্মোমিটারটা ভেঙে গেছে।

কবে?

আগে বলো নি ত ?

সব কি আর মনে থাকে ?

তা কেন থাকবে ? তোমার জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা।

আমাকে বিয়ের করে দিয়ে ভাল দেখে বউ নিয়ে এস না। মুরত দেখি।

মুখ সামলে কথা বলবে।

আমি কিছু বললেই তত দোষ।

দুম করে বিয়ে না করলেই ভাল হত।

থাক, আর মাথা খারাপ কোর না। চান করতে যাও।

আজ ?

: ভাত নেই। রুটি। নবিতার মার কাছ থেকে আটা এনেছি এক পামলা।

বুলিটা ভাত পাবে না। অবশ্য আজ জ্বর। সুমন চঞ্চল হয়ে উঠল। দুটো চোখের পাতা তার ভারী হয়ে উঠল। সে একটু টাচি হয়ে পড়ল।

—আর আমার কপাল।

নাও, আর চঙ করতে হবে না। চান করতে যাও। ভেবে লাভ নেই। কাজ একটা জোটাও।

সত্যিই। এভাবে কত দিন ?

সুমন রেখার চোখের কথা পড়ল। কতদিন তারা ভুলে গেছে শরীরের আদান প্রদানের কথা। আত্মরক্ষার তীব্র সংগ্রাম এখন।

সুমন উঠল। চান করতে যাবে। রেখাকে ডুবে থাওয়া প্রশ্নটা করল।

বুলি কি খাবে ?

সাবু।

ডাক পিওন সাইকেলের বেল বাজিয়ে একটা খাম দিয়ে গেল। রেখা কুড়িয়ে নিয়ে এল। ইনসিওরের চিঠি। প্রিমিয়াম জমা দিতে হবে।

ভরাট দুপুর ডাক ছেড়ে গরমে ফুটছে। রেখা দুশ্চিন্তায় ঘুমিয়ে পড়েছে বুলির পাশে। রেখার মুখে অনেক রকমের ভাবনার করুণ চিহ্ন ফুটে উঠেছে। গরিবের মেয়ে না হলে আর তার মতন ছেলের সংগে বিয়ে হয় ? উদাস্ত। বাঙাল। সুমনের বড় রকমের ঘা লাগল মনে। সে জোরে শ্বাস নিল। কোথাও চাকরি নেই। ছোটা রুক্ষ পৃথিবী। আশপাশে সব কিছু ভাঙছে। মানুষ এমনি সময়েই বোধ হয় চুরি করে। টাকা। টাকার জন্যে চাকরি। চাকরির জন্যে এমন কি নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা। সুমনের মনে হল সারা পৃথিবীতে না হোক অন্তত: এই এই এলাকায় এখন এক পশলা বৃষ্টি হওয়া দরকার। দারুণ গরম। অবশ্য সারা পৃথিবীতে এখন গরমকাল নয়। সৌভাগ্যই বটে।

সুমন কলকাতায় গেছে। বাড়িওয়ালা ওপরে ঘুমুচ্ছে। দুপুরটা ভারী নির্জন। আজ অবশ্য চাল ফুটেছে ঠিকই। তবে কাঁচের আয়নাটার বদলে। একজন বিহারী লোক কিনে নিয়ে গেছে সামান্য দামে। তিন টাকায়। সুমন দিয়ে দিল।

তা হলে চুল বাঁধা ? মুখ দেখা ?

কাজ হলে আবার মুখ দেখব।

কিন্তু আমি ত মেয়ে ছেলে। তুমি না হয় বাইরে রেখতে পাবে।

তবুও বিক্রি হয়ে গেল আয়নাটা। বুলি কিছুতে দেবে না। বলে আমার মার আয়না। বোকা মেয়েটা।

একটা লম্বা কালো মতন লোক। স্বামীর বন্ধু। হ্যাঁ, এ বাসায় অনেকবার এসেছে। একটা অর্ডার এনেছে।

মিসেস সেন, এই নিন বড় দুটো নোট। একশো করে। মাসে মাত্র দুদিন দুবার।

না—না—না—না।

ঘুম ভেঙে যাবার পর রেখা টের পেল সে ভীষণ জোরে চেঁচিয়েছে। বুলিরও ঘুম ভেঙে গেছে। মেয়েটা একমনে কি ভাবছে ? ও কি ভয় পেল ? রেখা বুলিকে বুকে টেনে

(শেষাংশ ৩২ পাতায়)

দূরের আকাশ

অমিলাভূষণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকক্ষণ বসে আছ। বল, কী অভিজ্ঞতা হোল এ ক'দিনের মার্কেট সার্ভে থেকে—

রিভলভিং চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে সৈকতের দিকে মুখ ফেরালো বিজন।

কী বলবে সৈকত? যে অভিজ্ঞতা ওর এই ছোট্ট জীবনে হোয়েছে তা শুনলে কি স্থির ভাবে বসে থাকতে পারবে বিজন? বোধ হয় না।

কারণ বিজন চায় এ যুগের ছেলেরাও একটা কিছু নিয়ে জীবন শুরু করুক চাকরী না পেলেই যে অন্য কিছু অবলম্বন নেওয়া যায় না একথা বিজন বিশ্বাস করে না।

বিজনের জগত আর যে জগতে ঘুরছে সৈকতরা তার মধ্যে যে আকাশ পাতাল ফারাক।

এ কথাটুকু কেমন করে বুঝাবে সৈকত।

অনাথদা ডিক্টেশনের খাতা নিয়ে পাশের চেম্বারে ঢুকল। ঘরে শুধু বিজন ও সৈকত।

বিরাট ঘরের মধ্যে ওরা মাত্র দুটি প্রাণী থাকলেও সৈকতের মনে হোল বহু লোক এ ঘরটার বিভিন্ন স্থানটুকু অধিকার করার জন্য লড়াই করছে। চারধারের জানালা কপাট গুলো বন্ধ। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হোচ্ছে। আবার ঘনীভূত হয়ে আসছে। সৈকতও ঐ লড়াই-এর একজন সৈনিক। এলোপাথারি সংগ্রামে ওর সমস্ত স্নায়ুগুলো কেমন যেন খিঁচিয়ে আসছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে এই অদ্ভুত দৃশ্যের সামনে নিজেকে দেখেও। ওতো চায় নি এমন ধারা একটানা সংগ্রাম। সংগ্রাম করবে কিন্তু এরও তো একটা শেষ থাকবে যখন কিছুটা বিশ্রাম নেবে। জীবনের চাহিদাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবে, ভাববে, দেখবে, বলবে, শুনবে। এই তো জীবন?

কিন্তু এমন জীবন তো চাই নি যেখানে সংগ্রাম শুধু জীবনের আলোকে বারবার ঘুরপথে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে শুধু কদাকার কতগুলো হিংস্র জন্তুর বীভৎসতার সামনা সামনি।

না-না, এ চায় নি সৈকত?

কী হোল? এমন চুপচাপ কী ভাবছ?

আবার বিজনের দৃষ্টির সামনা সামনি এলো সৈকত।

দেখছে আর, ভাবছে। এবার সত্যি সত্যিই খুলে ধরবে ওর এ ক'দিনের অভিজ্ঞতার ঝুলি।

না—খুলতে পারলো না, কেমন যেন একটা সংকোচ বোধ করছে। যেনেছে যা তা আর কারও সামনে তুলে ধরে নিজেকে ছোট করতে চাইলো না।

শুধু বলল, যা দেখছি দাদা তাতে খুব আশা হোচ্ছে না কিছু একটা করতে পারবো বলে। যেখানেই যাচ্ছি দেখছি কেউ না কেউ সেই জায়গাটা দখল করে ফেলেছে। কোথায় যে আমাদের স্থান হবে সেটা ভেবেই ভয় পাচ্ছি।

—ভয় নেই সৈকত—এত অল্পেই যদি এত ঘাবড়ে যাও তাহলে ব্যবসা করবে কী ভাবে? জানো ত তিনবার গণেশ উল্টালেও গণেশই আবার বেচে এসে নিজের স্থানটুকু করে নেয়। উদ্যমীকে সাহস জোগায়—কাজে এগিয়ে নিয়ে চলে। ব্যবসা করতে গেলে তারও কতগুলো নর্মস আছে যা তোমাকে জানতে হবে, শিখতে হবে,

মানতে হবে। তাহলেই দেখবে একদিন তুমিও সাকসেস-ফুল ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট বনে গেছ—

—এমন ভাবে জীবনকে দেখেছেন বলেই তো ঐ যোগ্য জায়গায় বসেছেন দাদা—

—তুমিও বসবে, আরও উদ্যম চাই—চাই আরও উৎসাহ—আরও খাটার জন্যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা—তুমি নেক্সট সপ্তাহে এসো; আমি ঘুরে এলে তোমাকে আমি পাঠাব আমার এক বন্ধুর কাছে, সে ব্যাংকে আছে। নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবে।

সৈকতের মুখে কিছুটা আলোর আভাস ছড়িয়ে পড়ল।

ভাবলো অনেক দিন বৈশাখীর সঙ্গে দেখা হয় না।

আজ ওর সঙ্গে দেখা করে জানবে কতটুকু ও এগিয়েছে এ পর্য্যন্ত। দুদিকে দু'জনে চললেও মাঝে মাঝে—

বৈশাখীও ভাবছিল সৈকতের সঙ্গে দেখা করা দরকার। অনেকদিন আগে থেকেই একটা চিন্তা ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছে চাকরী পাওয়া সম্ভব না। যদি সৈকতের সাথে দেখা হয় তাহলে ওর কাছ থেকে জানবে ও কি ছেলেদের মতো কোন ইণ্ডাষ্ট্রি করতে পারে না? অনেক মেয়েরাই তো এ পথে আসছে।

বিয়ের যা বাজার তাতে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম অথচ নিজের একটা অবলম্বন না হোলে বাপমায়ের উপর আর কত বোঝা চাপাবে সারা জীবন ধরে।

অনেকগুলো বোন হোলেও বাপমায়ের স্নেহ যত্নের অভাব কোনও দিন দেখেনি। অভাবে অনটনে মানুষ করতে হোচ্ছে বলেই হয়তো বাপমায়ের ভালবাসা একটু বেশী। যদি ভালবাসা দিয়ে কিছুটা অভাবের ঘাটতি মেটাতে পারে।

সবচেয়ে কষ্ট হয় ওর বাপের মুখের দিকে তাকালে। দিদি অতবড় একটা আঘাত হেনে নিজের পথে চলে গেল।

ফিরেও তাকালো না কিংবা ভেবেও দেখল না সংসারের কী হাল হবে ওর এই সিদ্ধান্তে।

ওরকম কোনও কাজ ওর দ্বারা সম্ভব না।

বাপমায়ের মনে আর দুঃখ দিতে চায় না বৈশাখী।

যারা এমনিতেই দুঃখে ও অভাবে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে তাদের বুকে ছুরি বসাতে ও পারবে না।

কখনও না।

তা'হলে উপায়?

উপায় শুধু সৈকতের সাহায্যে যদি কিছু করা সম্ভব হয়।

আশ্চর্য্য এই আশা।

যে নিজে ঠাঁই করতে না পেরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেহালা থেকে বরানগর ও টালা থেকে বড় বাজার সে রক্ষা করবে ঐ একটি যুবতী মেয়েকে।

যুবতী মেয়ে মানেই তো আগুনের হলকা। যেদিকে যাবে সেদিকেই বিপদ ওৎ পেতে আছে।

নির্বিঘ্নে চলতে হোলে দরকার উপযুক্ত সওয়ারী।

হোতে পারবে কি সেই সওয়ারী সৈকত?

অতটা আশা না করলেও অন্ততঃ চলার নিশানার একটা আভাস তো দিতে পারবে?

এই বা কোথায় পাবে? বৈশাখী ভাবলো সৈকতের উদ্দেশ্যেই আজকের বিকেলটা রাখবে। ওদের বাড়ী থেকে বড় রাস্তার দিকে বেরোবার পথে যে পানের দোকানটা আছে ওখানেই অপেক্ষা করবে।

মাঝে মাঝে বিড়ি কেনে সৈকত ঐ দোকান থেকে। বিকেলে অপেক্ষা করলে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

দেখা হোক না হোক চেষ্টা করা দরকার।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি হোচ্ছে। বিকেল থেকেই আকাশের এই অবস্থা ক'দিন ধরেই চলছে।

বর্ষা নামবে এবার। বর্ষা নামলেই চিন্তা হয় বাড়ীতে ফেরার সময় ট্রাম বাস পাবে কিনা।

যে কোনও জায়গায় যে কোনও অবস্থায় যে কোনও ট্রাম বাস দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

বললেই হোল পথে জল অতএব ট্রাম বাস চালানো

সম্ভব না। এখন দেশেতো সকলে নিজেই নিজের নিয়ামক। আইন, কানুন কেতাবে লেখা থাকলেও ক'জনেই বা তা মেনে চলছে?

আইন-ভঙ্গকারীরা আইনভঙ্গ করেও উপযুক্ত শাস্তি পায় না।

অনায়াসে আইন ভঙ্গ করে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করে। একজনকে দেখে আর একজন শেখে।

যেমন ভৃত্য তেমনি মনিব। কারও দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। শুধু নিজের আখেরটুকু গোছাতে পারলেই হোল। এতে অন্য কারও কোনও অসুবিধা হলো কিনা সেটা তলিয়ে দেখতে কেউ রাজী নয়।

মনিব আখের গোছায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে তার কর্মস্থলে আর ভৃত্য গোছায় সেই মনিবের বাড়িতে যেটা তার কর্মস্থল।

যে যেভাবে পারে সেই ভাবেই নিজের ভবিষ্যৎটা উজ্জল করতে চাইছে। জীবনে উঠতে গিয়ে পিছন ফিরে কেউ তাকাতে চাইছে না।

সৃষ্টি হোচ্ছে নানা ঝঞ্ঝাট। নানা সমস্যা, নানা অশান্তি।

সকলেই ভাবছে এর জন্য দায়ী অন্য কেউ। নিজের বিবেকটুকু ছোট্ট হোতে হোতে কোন স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে তা খতিয়ে কেউ দেখতে রাজী নয়।

যেমন বাড়ীতে তেমনি অফিসে। কিছুদিন আগে বৈশাখীর এক দাদা বেড়াতে এসেছিল ওদের বাড়ীতে। বৈশাখীকে দেখে চোখ বড় বড় করে বলল, দেখতে দেখতে তো বেশ বড়টিই হোয়েছিস্। কিছু দিয়ে হোল?

কথা বলার ভঙ্গীটা একটু বেয়াড়া ধরণের হোলেও এই দাদা ওকে একটু মনে মনে স্নেহ করে। মনে হয় ওর জন্য কিছুটা চিন্তাও করে।

কিন্তু ঐ শ্রীবেণুদা হঠাৎ সংসার সম্বন্ধে বড় উদাসীন হোল। একদিন তো বলেই ফেলল, সংসারের যা হাল চাল দেখছি তাতে মনে হচ্ছে এখন থেকে দৌড়ে গিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেই বোধ হয় ভাল হতো রে। ছোট বেলা থেকে সংসারের সঙ্গে লড়ে ছোট ভাইদের মানুষ করেছিল সে। ভাইরা দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু শ্রীবেণুদা যা ছিল তাই আছে। বিশেষ কোন পরিবর্তন আসে নি। ওর ভাইদের সম্বন্ধে বড় আশা ছিল। কিন্তু এখন দেখছে ওর হিসেবে ভুল হয়েছে। তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলে, আমি 'যাত্রাদলের দাদা'।

অর্থটা আগে বুঝতো না বৈশাখী।

এখন বুঝেছে। অনেক কিছু দেখে বুঝেছে এ দুনিয়ায় অনেক কিছুই ঐ যাত্রাদলের লোকদের সংসারের মতোই। সম্পর্কটা ততক্ষণই যতক্ষণ যাত্রা চলবে।

যাত্রা হোলে গাল থেকে রংও তুলে ফেলে, তুলে ফেলে ঐ অনুরাগ, স্নেহ, ভালবাসাও ঐ অভিনেতা অভিনেত্রীরা।

বিকেলের দিকে সাড়ী পাল্টাবে কী পাল্টাবে না ভাবছিল। বেরোবার মতো বেশী সাড়ী নেই। মাত্র দু'খানা সাড়ী।

রাস্তায় বেরোতে গেলে একটু চলন-সই হোয়ে বেরোতে হয়। এখন লোকের সংসারের হাল যাই থাকুক, বাইরের রংটা যাতে ফ্যাকাসে না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি।

আলনা থেকে ব্লাউজ নিয়ে পাশের ঘরে গেল বৈশাখী .....

না

(২৯ পাতার পর)

নিলু। তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে। ভীষণ তেষ্টা। তবুও বুকেতে তার বিবেকের শীতল প্রস্রবণ।

সুমন আজ বড় ক্লান্ত। কলকাতায় সারাদিন টো টো করে ঘুরেছে। সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ল। এমনকি বুলিরও আগে।

মাঝ রাতে তার ঘুম ভেঙে গেল। আচমকা। মাথাটা ঝন ঝন করছে। সে রেখার গায়ে হাত দিল। রেখা বলল, রেখা জেগে উঠল।

: আমরা কিন্তু—

: না।

: দাঁতে দাঁত চেপে—

: না।

: এমন কি মৃত্যু এলেও—

: না।

: আজ একজন একটা আপলি এ্যাপ্রোচ এনেছিল। কুৎসিত আবেদন—

: না।

ঘুমের ছড়তায় রেখা শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করছিল। এবার দুপুরের স্বপ্নের ছুটটা সুমনের কাছে রেখা বলল।

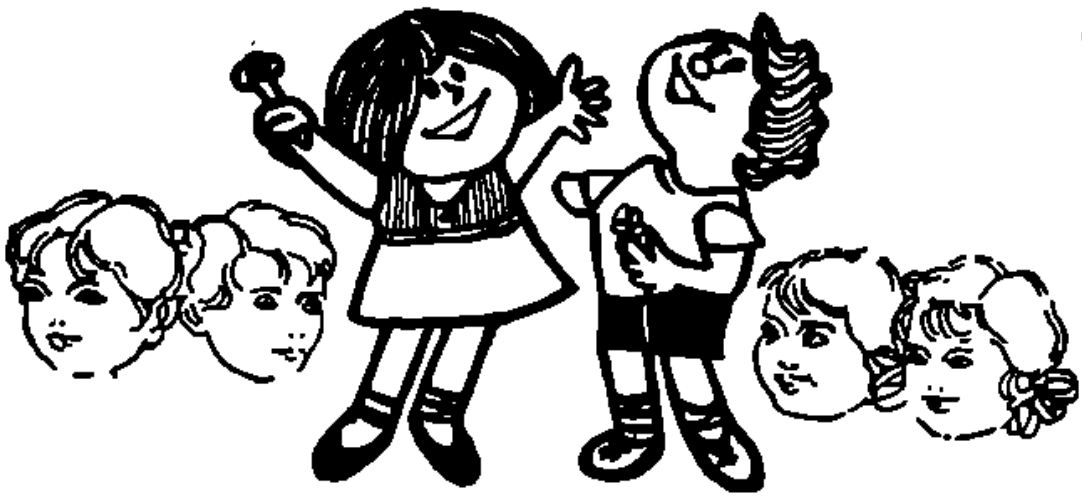

শিশু জগৎ

প্রেমের শপথ নাও

অসীমা গাঙ্গুলী

ওকা মেরে শঙ্কাটাকে করতে পারো দূর ?
তবেই বুঝি, তোমরা সবাই মহা মহা শূর।
অন্ধকারে একলা পথে পিছিয়ে পড়া নয়
এগিয়ে চলো, জলদি চলো কিসের এত ভয় ?

দুনিয়াটাকে জেনে নেওয়ার এটাই তো সময়।
এক নিমেষে পাঠ করে নাও বিশ্ব-পরিচয়।
অন্ধকারের ভ্রূকুটিকে করতে হবে জয়।
এগিয়ে চলো, জলদি চলো কিসের এত ভয় ?

তোদের পরে অনেক আশা অনেক কাজের ভার।
"মানুষ গড়ার" শক্ত সে কাজ সবার আগে তার।
মায়ের আশীষ মাথায় নিয়ে এগিয়ে সবে যাও।
ত্যাগ ও সেবার মন্ত্র আর প্রেমের শপথ নাও।

———

জেনে রাখা ভাল

অংশুমান মিত্র

পৃথিবীর কোন্ মানুষটির সবচেয়ে বেশী ওজন জান ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট আর্ল হিউগ্‌সের। তার সর্বোচ্চ ওজন পাওয়া গিয়েছিল ১,০৬৯ পাউণ্ড। এবার পৃথিবীর সব চেয়ে হাল্‌কা মানুষটির ওজন এবং নাম শোন। মেক্সিকোর লুসিয়া জারাটের ওজন ১৭ বছর বয়সে ছিল ৪.৭ পাউণ্ড।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট পার্শিং ওয়াডলোর উচ্চতা ছিল ৮ ফিট ১১ ইঞ্চি। সবচেয়ে বেঁটে মানুষটির নাম জান ? শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে হল্যাণ্ডবাসী পলিন্ মাস্টার্সের উচ্চতা ১৯ বছর বয়সে ছিল ২৩.২ ইঞ্চি।

সবচেয়ে উঁচু জন্তু হ'ল আফ্রিকার 'লাহেরা' মরুভূমির দক্ষিণে এক জাতীয় জিরাফ। এদের উচ্চতা সাধারণতঃ ২০ ফিট থেকে ২৩ ফিট হয়।

ডাঙার দ্রুততম জন্তু হ'ল চিতাবাঘ, যার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ মাইল থেকে ৮৩ মাইল পর্যন্ত ওঠে। অপর দিকে ডাঙার ধীরতম জন্তু আমেরিকার তিন আঙুল ওয়ালা স্লথের গতিবেগ মিনিটে ৭ ফিট থেকে ৮ ফিট। গাছের ওপর তার গতিবেগ মিনিটে ১৫ ফিটও হতে পারে।

———

শ্রীশ্রী নিত্যগোপালের বাল্য লীলা

দীপেন রাহা

মহাপুরুষদের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁদের ক্ষেত্র তৈরী থাকে। সেই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে তাঁরা যে বীজ বপন করেন, সেই বীজ থেকে পরবর্তী কালে মহামহীরুহের সৃষ্টি হয়। সেই সৃষ্টির ফল ভক্তগণ ভোগ করেন।

কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম-যোগ-বৈরাগ্যের সাকার বিগ্রহের

প্রতীক শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব ঘটে পানিহাটিতে ১২৯১ বঙ্গাব্দে ১৩ই চৈত্র রোববার অশোকাষ্টমী তিথিতে। তাঁর আবির্ভাবে সৌরভে জাতকের গৃহ আমোদিত হয়েছিল। একদিন একটি বিষধর সর্প এসে তাকে বেষ্টন করে তার মুখের উপর ফণা বিস্তার করে রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করবার প্রচেষ্টা করছে। দেব শিশু খিলখিল করে হাসছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি দেখে মাতা গৌরী দেবী ভীত হয়ে। আর একদিন এক রহস্যময় অপূর্ব লাবণ্যযুক্ত শিশুকে হঠাৎ কোলে তুলে নিয়ে গাছের উপর চড়ে বসল। শিশু সন্তানকে না দেখে আকুল করে স্নেহ চুম্বন করে ঠিক তেমনি রহস্যময় দেব শিশুকে চুম্বন করল। শেষে সুপক্ক কদলীর কোড় দেখিয়ে শিশুকে তার কবল থেকে মুক্ত করা হয়। আরো কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের শৈশবে। তিনি নিদ্রিতাবস্থায় কোলে বসে তাঁকে ইষ্ট মন্ত্র দান করেন। দিব্যিনী ক্রোড়স্থ দেব শিশুকে প্রণাম করেন।

শিশুর যখন আড়াই বছর বয়স তখন তিনি ঘরের প্রকোষ্ঠে চড়ার কোলে ঢলে পড়েন। ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে যান। এমনি সময় একজন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। সন্ন্যাসী আবিষ্কার করেন, শিশুর মৃত্যু হয় নি, নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে। ক্ষণিকক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। ঠিক তাই হলো। শিশুর নির্বিকল্প সমাধি; এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। কিন্তু মহাপুরুষের লীলার কথা ক'জন জানতে পারে? লীলার সময় বয়স কালে নেই।

কথায় বলে, 'সকালেই দিনের অবস্থা বুঝা যায়'। এ উক্তির আক্ষরিক সত্যতার কথা শ্রীশ্রী নিত্যগোপালের জীবনে প্রমাণ হয়েছে। উপরোক্ত অলৌকিক ঘটনা ছাড়াও উল্লেখ্য তিনি শিশুবেলা থেকেই মাছ-মাংস খেতেন না। সুস্বাদু খাদ্যের চাইতে তাঁর সাধারণ শাক সব্জি প্রিয় ছিল। একদিন তাঁর ধাইমা শাকের রান্না করে গোপালকে ঘন ঘন স্মরণ করছেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা গোপাল অর্থাৎ শিশু নিত্যগোপালকে নিজের হাতে

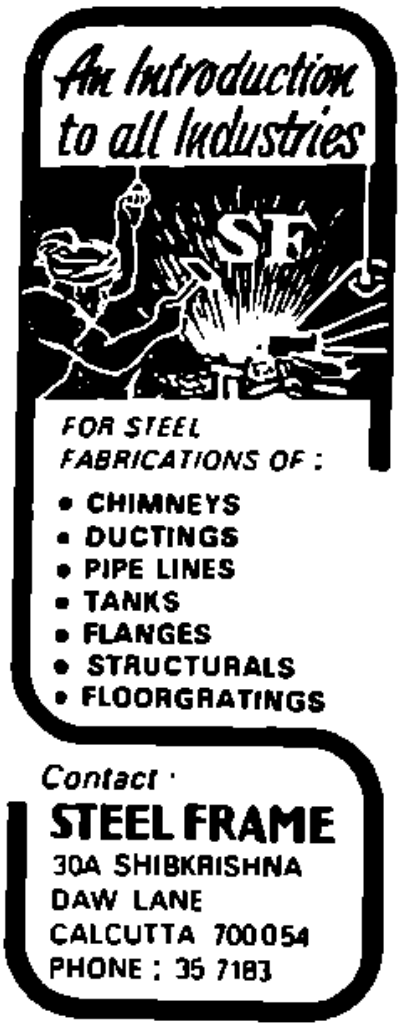

খাওয়াবেন। আন্তরিক সদ্ভাব বা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে না। গোপাল কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ধাইমার কোলে এসে বসে পড়লেন। আনন্দে আত্মহারা ধাইমা। তিনি গোপালকে তার শাকান্ন খাইয়ে প্রভূত আনন্দ পেলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠল।

শ্রীশ্রী নিত্যগোপালের বাল্য লীলা যেমন অত্যাশ্চর্য বিস্ময়কর তাঁর শৈশবের ছাত্র হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব সেই রকম চমৎকার। তিনি সাত বছর বয়সে বাইবেল পড়েন। তাঁর অধ্যয়ন প্রীতি বিশেষ উল্লেখ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, শাস্ত্রাদি পাঠ ছাড়াও তিনি কবিতা ও সংগীত রচনা করেন।

অধ্যাত্ম জীবনে তাঁকে সদ্গুরু খুঁজে বেড়াতে হয়নি। সবই যেন পূর্ব নির্দিষ্ট। দেব দেবীর প্রতি তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। তিনি প্রায়ই কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করতে যেতেন। একদিন তাঁর চোখে পড়ল আলিপুর পুলের উত্তর পূর্ব কোণে ত্রিকোণেশ্বর শিবের মন্দিরের কাছে এক জটাজুটধারী তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী স্থির হয়ে আসনে বসে আছেন। তাঁর শিরোদেশ থেকে যেন আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। নিত্যগোপাল এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। সমাধি ভঙ্গে সন্ন্যাসী নিত্য-গোপালকে উদ্দেশ করে বললেন, বৎস, গঙ্গাস্নান করে সত্বর এস।

মন্ত্রচালিতের মত নিত্যগোপাল গঙ্গাস্নান সেরে সন্ন্যাসীর কাছে এলেন। দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি সমাধিস্থ হলেন। সমাধি ভঙ্গ হলে সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি আমার শেষ শিষ্য। তোমার দ্বারা জগতের বহু কল্যাণ সাধন হবে"। শ্রীশ্রী নিত্যগোপালের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র। সন্ন্যাসী তাঁকে গৈরিক বসন দান করেন ও সন্ন্যাস নামকরণ করেন জ্ঞানানন্দ অবধূত। ষড়দর্শনী পরমহংসাচার্য শ্রীশ্রী ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহারাজ পুণ্য গুরু পূর্ণিমা তিথিতে ভাবী শ্রীশ্রী নিত্যগোপালের ললিপত্রে বীজ মন্ত্রের কুসুম প্রস্ফুটিত করলেন। অবধূত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল সর্ব সংস্কার মুক্ত হলেন। তিনি ছিলেন সাধক প্রেমময় মূর্তি। তাঁর প্রেমপূর্ণ চক্ষুদ্বয় প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ থাকত। তিনি কোন সম্প্রদায়কে হেয় জ্ঞান করতেন না। নিন্দা বা সমালোচনা করতেন না। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলতেন, "আমি এক সম্প্রদায়ের নই, সর্ব সম্প্রদায়ের। আমার ইষ্ট যখন শিব আমি তখন শৈব, তিনি যখন বিষ্ণু আমি তখন বৈষ্ণব"।

শ্রীশ্রী নিত্যগোপাল পৈতৃক সম্পত্তি অকাতরে দান করে ছ'বৎসর পদব্রজে তীর্থ পর্যটন করেন। তিনি তাঁর মায়ের উপদেশ শিরোধার্য করেন। মা বলতেন, "বাবা, গ্রন্থ পড়ে যা না হয়, সাধু সঙ্গ করে তা হয়"।

শ্রীশ্রী নিত্যগোপালের সাধু সঙ্গ লাভ বিনা প্রচেষ্টাতেই হত। অজ্ঞাতসারেই তিনি যেন তাঁদের সংস্পর্শে এসে পড়তেন। যেমনি এসেছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঠাকুরের সংস্পর্শে। ঠাকুর বলতেন, নিত্য গোপাল নিত্য সিদ্ধ।

With Best Compliments Of

PHONE : 66-5250
66-5848

PATHAK INDUSTRIES

HOUSE FOR HEAVY MACHINERY

117, G. T. ROAD, SALKIA
HOWRAH

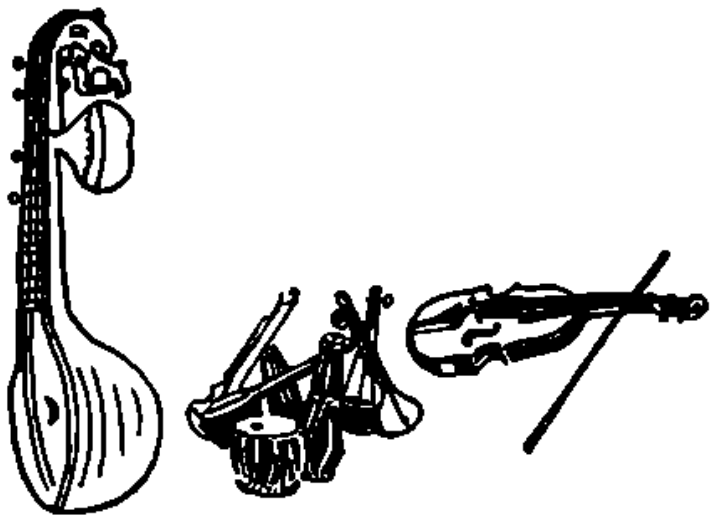

সঙ্গীত জগৎ

সার্থক টপ্পাগায়ক মহেশ ওস্তাদ

(আনুমানিক ১৮৩৪-১৯১৪-১৬ ?)

আর্য কুমার মুখোপাধ্যায়

কালীমির্জা আর নিধুবাবু পশ্চিম থেকে গান শিখে এসে বাংলাদেশে প্রথমে টপ্পাগানের প্রচার করে ছিলেন। তাঁরা যে সব গান প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে তাঁদের নিজেদের রচনা বাংলা গানেই ছিল বেশী। আর সেই সব বাংলা গানে টপ্পার সুন্দর সুন্দর অলংকার পরানো হয়েছিল। তবে সে গান তাঁরা কার কাছে শিখেছিলেন ও টপ্পা বলতে যে শোরী মিঞার টপ্পা অথবা পাঞ্জাবী টপ্পা বোঝায়, সেই টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবু অথবা কালীমির্জার প্রচার করা টপ্পার কোন মিল ছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁদের পরে বহুদিন চলে গেছে কালের অতলে। বাংলাদেশে অনেক ওস্তাদ অনেক রকম গান গেয়েছেন, অনেক রকম গান শিখিয়েছেন কিন্তু পুরোপুরি পাঞ্জাবী টপ্পা বলতে যে গান বোঝায় সেই গান কেউই তেমন করে শিখেছিলেন কিনা সে কথা আজও কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে একজন বাঙালী ওস্তাদকে পুরোপুরি পাঞ্জাবী টপ্পা গেয়ে আসর মাত করতে দেখা গিয়েছিল। তাঁকে সবাই বলতো মহেশ ওস্তাদ। যশোর জেলার মহেশপুর গ্রামে মহেশ ওস্তাদের পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন। তাঁর পিতামহের পিতামহ ছিলেন যশোরের বিখ্যাত মন্দিরের রাজপুরোহিত। আসলে তাঁদের উপাধি ছিল মুখোপাধ্যায়। কিন্তু শাস্ত্রচর্চা ও পূজা অর্চনা করার ফলে তাঁদের বলা হত চক্রবর্তী। মহেশচন্দ্রের বাবার নাম ছিল জগমোহন মুখোপাধ্যায়। জগমোহনের পরে তাঁর ছেলে মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গানের জগতে এসে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন মহেশ ওস্তাদ নামে। কালীমির্জার মৃত্যুর ১৫ বছর পরে আর নিধুবাবুর মৃত্যুর ৪ বছর আগে আনুমানিক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয় মহেশ ওস্তাদের।

পাঞ্জাবী টপ্পার সবচেয়ে বড় শিল্পী শোরিমিঞার প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন হামেদুন মিশ্র। বারানসীর মনোহর আর প্রমুদ্দ মিশ্র একটি ঘরাণার সৃষ্টি করেছিলেন। প্রমুদ্দর বড় ছেলের নাম ছিল রামকুমার মিশ্র। শোরিমিঞার প্রিয় শিষ্য হামেদুনের শিষ্য ছিলেন প্রমুদ্দ মিশ্র। তিনি হামেদুনের কাছে টপ্পারীতির গান শিখে বিখ্যাত

হয়েছিলেন। এই প্রসুন্ন মিশ্র থেকেই ওদের ঘরে টপ্পাগান চলে আসছে। মহেশচন্দ্র ঐ প্রসুন্ন আর মনোহর মিশ্রের দুই ছেলের কাছেই দীর্ঘ দিন ধরে পোরিমিঞার পাঞ্জাবী রীতির টপ্পা শিখেছিলেন।

মহেশচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই গান ভাল বাসতেন। ভাল গান শুনলে সেই গানকে হুবহু নকল করে গাইতে পারতেন। তাঁর সেই নকল করা গান শুনেও অনেকে তাঁকে প্রশংসা করতো। এমন কি অনেকে বলতো শিখলে ঐ ছেলে বড় ওস্তাদ হবে। একটু বড় হতেই গানবাজনার জলসায় কিংবা বৈঠকী আসরে মহেশচন্দ্র যেমন করে হোক হাজির হয়ে গান শুনতেন মন প্রাণ ভরে। এমনি করেই তাঁর মনের মন্দিরে সুরের দেবতাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মনের মত ওস্তাদ পেয়ে গেলেন বেনারসের শিবসহায় আর রামসহায় মিশ্রকে। টপ্পা গান শিখতে হলে প্রথমে রীতি মত ভাবে শিক্ষা করতে হয় রাগসংগীত। তাই তিনি প্রথমে ধ্রুপদাঙ্গ তারপর টপ্ খেয়াল শিখেছিলেন। আজকাল দ্রুতলয়ে যে খেয়াল গান করা হয় তাকেই ওস্তাদরা আগে বলতেন টপ্ খেয়াল। এই টপ্ খেয়ালের নানারকম অলংকার শিক্ষা করার পর শিখতে হয় টপ্পার গিটকিরির কৌশল। রাগের সঙ্গে পরিচয় বজায় রেখে বিভিন্ন রকমের মীড় আর দানাদার গিটকিরি প্রয়োগ করে টপ্পা গাওয়া যে কী কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ সে কথা লিখে বোঝান যায় না। যাঁরা সাধনা করেছেন তাঁরা ছাড়া আর কেউই সেই অমানুষিক পরিশ্রমের কথা কল্পনা করতে পারবেন না। তাই ধ্রুপদ খেয়াল অথবা ঠুংরীগায়ক যত দেখা গেছে তার চেয়ে টপ্পাগায়ক দেখা গেছে অনেক কম। মহেশচন্দ্র খেয়াল গানেরও দক্ষ শিল্পী। বাংলাদেশে যাঁরা টপ্পা গান গেয়ে বিখ্যাত হয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বোধহয় প্রথম পোরি মিঞার পাঞ্জাবী রীতির সার্থক টপ্পাগায়ক। তাঁর আগে এমন কি তাঁর পরেও যে সমস্ত বাঙালী ওস্তাদরা টপ্পাগান গেয়ে গেছেন তাঁদের গায়কিশৈলীর মধ্যে পাঁচমিশালী ভাব ছিল কিন্তু মহেশ ওস্তাদের গানের মধ্যে খাদ ছিল না এতটুকু। একজন শিল্পীকে যেমন দেখতে হওয়ার প্রয়োজন তিনি ছিলেন ঠিক সেইরকম। একহারা লম্বা চেহারা, গায়ের রঙ ছিল চাঁপা ফুলের মত। কোঁচকানো কালো চুল আর সুন্দর মুখশ্রী নিয়ে মহেশ ওস্তাদ যখনই যে আসরে গেছেন সেই আসরকেই মাতিয়ে দিয়েছেন রূপে গুণে। তাঁর গান গাইবার সুন্দর ভংগি, সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য, উচ্চারণের শুদ্ধতা মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতো। মহেশ ওস্তাদ গান গাইতে আসছেন, একথা শুনেই বহু শ্রোতা অধীর আগ্রহে আসরে উপস্থিত হতেন। প্রথমে পাঞ্জাবী টপ্পা গান গেয়ে মহেশচন্দ্র প্রায় প্রতিটি আসরেই নিজের লেখা বাঙলা ভাষার ভক্তিমূলক গান গাইতেন এমন মধুর ভাবে যে, আসরের নারীপুরুষ সকলেই সহজেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। বিশেষ করে সিন্ধুড়া রাগে তাঁর গান হত অপূর্ব। সবাই বলতেন মহেশ ওস্তাদ সিন্ধুড়া রাগে সিদ্ধ পুরুষ।

প্রথম জীবনে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। তাঁর জীবনের শেষের দিকে পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন তারাচরণ গুহ। মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের স্বনামধন্য গুহ পরিবারের এই তারাচরণ গুহ তাঁদের যজ্ঞেশ্বর বসু লেনের একটি বাড়িতে মহেশচন্দ্রকে রেখেছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একটানা প্রায় ত্রিশ একত্রিশ বছর ঐ যজ্ঞেশ্বর বসু লেনের বাড়ীতে মহেশ ওস্তাদ বাস করে গেছেন। উত্তর কোলকাতার ১১ নং বৃন্দাবন বোস লেনে গুহদের যে বিখ্যাত কালীবাড়ী আছে, সেই মন্দির যেদিন প্রতিষ্ঠা হয় সে দিন মহেশচন্দ্র নিজে একটি শ্যামাসংগীত রচনা করে গান গেয়েছিলেন। সেদিনের সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে কোলকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সে যুগের সংগীতরসিক হরকুমার ঠাকুর। সেদিনের মহেশ ওস্তাদের সেই শ্যামাসংগীত গান সমস্ত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস্ হয়ে কোলকাতায় এসেছিলেন, তখন

বিখ্যাত বেলগাছিয়া ভিলায় একটি বিরাট সভায় তাঁকে জানানো হয়েছিল সম্বর্ধনা। সেই সম্বর্ধনা সভায় মহেশ ওস্তাদের গান প্রত্যেক শ্রোতার প্রশংসা অর্জন করেছিল। এমনি ভাবে কোলকাতার বহু সভায় মহেশ ওস্তাদ গান গেয়ে অজস্র মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

সংগীত সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত রচনা করাটাকেও মহেশ ওস্তাদ জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচনা বেশীর ভাগ গানই ছিল ভক্তিমূলক।

তিনি শুধু নিজে গান গেয়ে আর গান রচনা করেই আত্মতৃপ্তি লাভ করেন নি, সেই সব গান তিনি শিখিয়েছেন অনেক ছাত্রদের বহু যত্ন করে। যাঁরা তাঁর কাছে গান শিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর শেষ জীবনের উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আত্মীয় সতীশ চন্দ্র ছিলেন তাঁর প্রিয়তম ছাত্র। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ৯২ বছর বয়সে সতীশচন্দ্রের ইহলোক ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মহেশ ওস্তাদের টপ্পাগানের রীতি শৈলীর অবসান হয়ে গেছে।

মহেশ ওস্তাদের বৈমাত্র ভাইয়ের নাম ছিল শ্রীধর শিরোমণি। এই শ্রীধর শিরোমণির নাতি ছিলেন কাশীর বিখ্যাত গায়ক হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। যাঁর কাছে ভারতবর্ষের বহু সংগীতজ্ঞ বহু কিছু শিক্ষা লাভ করে বর্তমান উচ্চাংগ সংগীতকে বাঁচিয়ে রেখে গেছেন। অবশ্য হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় টপ্পারীতির গান শেখেন নি। তিনি শিখেছিলেন সংগীতাচার্য রামদাস গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ গান।

সারা জীবন কঠিন সাধনা করে যে সংগীত মহেশচন্দ্র শিক্ষা করেছিলেন সেই সংগীতই দিয়েছিল তাঁকে সম্মান, দিয়েছিল আচার্যের স্থান, দিয়েছিল অর্থপ্রতিপত্তি। অতুল যশ অর্জন করেও অহংকারের কোন চিহ্ন ছিল না তাঁর ব্যবহারে। সকলের সংগে সমান ভাবে মিলেমিশে তিনি অতি সাধারণ মানুষের মত জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

সাধেকইবওস্তাদ বহুরূপ তিনি নিজেকে কোনদিন ওস্তাদ বলে স্বীকার করেন নি। তিনি বলতেন গান-বাজনার কিই বা শিখেছি আর কি-ই বা জানি। এ তো এক জন্মের ব্যাপার নয়, এ জন্মে যা হ'ল হ'ল, যা হ'ল না তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে বহু জন্ম। কত জন্ম পরে কতটুকু শিখতে পারব তাও জানি না। তবে গানকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না। গান আমার দেবতা, আমার ধ্যান, আমার ঐশ্বর্য, আমার সাধনা। গান ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতেই পারি না।

এই মহান মরমী গুণী সংগীতজ্ঞের জীবনের প্রদীপ কবে নিভে গিয়েছিল সে কথা আজ আর সঠিক ভাবে কিছু পাওয়া যায় না। তারাচরণ ওস্তাদের বজেশ্বর লেনের যে বাড়ীতে মহেশচন্দ্র বাস করতেন সেই বাড়ীতেই তাঁর ইহলীলা ৮০ অথবা ৮১ বছর বয়সে হয়েছিল সমাপন। সেই হিসাবে মনে হয় ১৯১৫ অথবা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের কোন একসময়ে তিনি পরলোক গমন করেছিলেন।

With Best Compliments Of

Phone : 55-5853

M/S. M. L. DASS & CO.

Contractors & General Order Suppliers

10 Jagabandhu Modak Road
Calcutta-5

পুস্তক সমালোচনা

শবরী পৃথিবী জাগে॥ শান্তশীল দাশ। প্রকাশক : রমাপ্রসাদ সরকার সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ। সোদপুর, ২৪ পরগণা। 'শবরী পৃথিবী জাগে'—ছন্দবাধুর্যে, শব্দচয়নে ও কাব্য ব্যঞ্জনায় কাব্য গ্রন্থটির এমন একটা আবেদন আছে যা পড়তে পড়তে প্রতি মুহূর্তে রুক্ষ করবীর রাজার কথা মনে করিয়ে দেয়—"দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে প্রাণের মাধুরীটুকু কেড়ে আনতে পারি নে"। বর্তমান দশকের অধিকাংশ কবিতায় প্রতীক, আঙ্গিক ও দুর্বোধ্য শব্দ সংযোজনে হয়তো কবিতার সূক্ষ্মতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রাণের বাসরে তা বাসি ফুলের মালার মতই পরিত্যক্ত হয়। অথচ এমনই এক কালে বসে 'শবরী পৃথিবীর' কবি তাঁর সাদরে সঞ্চিত ফেলে আসা দিনগুলি আমাদের যখন ছন্দোবদ্ধভাবে উপহার পাঠালেন তখন প্রায় ফুরিয়ে আসা প্রাণের মধ্যে একটা বোধই জেগে ওঠে—প্রাণ এখনো নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

কবি তাঁর কথা গাঁথেন আপন খেয়ালে, যুগচেতনায় তার মূল্যায়ন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত যার বিস্তৃতি, ১৯৮০তে বসে যখন তাকে আলোচনা করতে বসেছি তখন কবির তাৎক্ষণিক মানসিকতা থেকে তা সরে যেতে বাধ্য।

'চিরন্তনী' থেকে শুরু কোরে 'এখনো অনেক রাত' পর্যন্ত পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়েছে গতিশীল বস্তু-জগতের অলক্ষ্যে এক নিভৃত অবকাশ রচনার প্রয়াসী কবি তাঁর প্রতিদিনের দিনপঞ্জী লিখে চলছেন নিয়মিত অভ্যাসে। ক্লান্ত ক্লান্ত কবি কেবলই ফিরে যেতে চেয়েছেন পুরোণো দিনের স্বাচ্ছন্দ্যে—যেখানে নিস্তব্ধ পল্লী পরিবেশে পাখীর ডাক, পাতার মর্মর, "গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ"। অথচ কবি ভুলে গেছেন "কালের বিবর্তনে রুচির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী"। তাই যখনই কবি চলতি জীবনে পথযাত্রায় দেখেছেন কলকোলাহলমুখর অসংখ্য মানুষের ভীড়, তখনই তাঁর—"অসুস্থ এ দেহমন ছুটে যেতে চায় সব ফেলে।" (ঘুম)

যেখানে জীবনের কথা বলে 'চরৈবেতি' সেখানে চলার পথে ছেদ আনা জীবনের লক্ষণ নয়। আঁকড়ে ধরা মানসিকতায় স্বচ্ছন্দতার অভাব। তাই চলতি পথের জীবনযাত্রাকে মনে হয় সাদামা (মেঘালোকে)।

যুগচেতনায় যুগের বার্তা বহনকারী কবিই সার্থক। শান্ত সরল জীবনে আছে শুদ্ধতার অবিলতা কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার বাস্তব রূপ কর্মক্লিষ্ট হৃদয়ের বেদনার্ত ঘোষা অভিব্যক্তি। মূক জীবনকে ভাষায় রূপান্তরিত করবার কঠিন দায় যে কবির, সে-ই যুগন্ধর; সে-ই তৃষিত মরুভূমিকে গড়ে তুলতে পারে 'রসাল নন্দনে'।

কবি-জীবনকে আকর্ষণ করে প্রকৃতির শুদ্ধতা, পল্লীরমণীর সাঁঝের প্রদীপ (পৃথিবী)। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য—যাতে প্রাণ নেই তা প্রাণে মেশে না। যান্ত্রিক সভ্যতার পরিবেশে কবি সেই প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাননি।

তাই তাঁর সখেদ উক্তি—"কেবলি মনে হয়, পৃথিবী মরু ধূ ধূ"—অনুভূতির সীমানা যার ঘেরাটোপে, তার 'পৃথিবী মরু ধূ ধূ'। সেখানে থেকে বেরিয়ে এলেই মুক্তি। কবি সেই ঘেরাটোপে যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণই তিনি চলতি পৃথিবীর জীবন থেকে কোন আশ্বাস খুঁজে পান নি। যেই মুহূর্তে এসেছেন বেরিয়ে, সেই মুহূর্তেই 'নামলো রঙ্গরস' (আকাশে মেঘ এল)। মোটামুটি ৫৮, ৫৯ সালের কবি-ভাবনায় স্থিতিশীল মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার যে অনুভূতি ও প্রচেষ্টা, পরবর্তী কবিতায় সেই কবিকে আর সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। ৫৮,৫৯ এ নতুনকে মেনে নিয়ে জেগে উঠেছিলো যে কবি-মন, পরবর্তীকালে তা পুরোণোর মাঝে হারিয়ে গেছে যেন ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে। জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে শিল্প বিপ্লবের প্রকাশে যে সমৃদ্ধি, তা যে গ্রামীণ শুদ্ধতা দিতে পারে না, তাৎক্ষণিক কবি-চিন্তায় সে সত্য অনুপস্থিত। তাই যন্ত্রের ঘর্ঘরকে মনে হয়েছে 'মৃত্যুগভীর'। কলুর বলদের আবর্তনের গতিপথ আর মানুষের আবর্তনের গতিপথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের আবর্তনের পরিধি

ক্রম-বিস্তৃত। তাই তার ভ্রমণেই জ্ঞান। ভ্রমণে ইন্দ্রিয় রুদ্ধ থাকবার কথা নয় বরং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে (বৃত্তপ্রসঙ্গে)। 'এখানে অনেক ভ্রান্তির মধ্যে কবি তুলনামূলক ভাবে বর্তমান জীবন-সভ্যতা থেকে মরুভূমিকে উৎকৃষ্ট বলেছেন। মরুভূমির মধ্যেও যে ক্ষীণ আশা থাকে ওয়েশিসের, এখানে তাও তিনি খুঁজে পান নি। অথচ প্রশ্ন হল এই বদ্ধ জগতে রুক্ষতার মধ্যে যদি কোন ওয়েশিসের সন্ধান মানুষ না পেত তাহলে তারা বাঁচতো কি কোরে? জীবনযুদ্ধের সৈনিক যে কবি, ওয়েশিসের সন্ধান দেবার প্রথম দায়ভাগ তো তারই।

আগে পরে কবিতায় দেখেছি কবি হঠাৎ বেরিয়ে এসেছেন সকলের মধ্যে, ভাব ভাষা ছন্দ ও চিন্তার গভীরতা নিয়ে—জীবন-যুদ্ধের অঙ্গীকার নিয়ে (সহজিয়া, চলবো শুধু, জীবন, আলোর স্বপ্ন, মধুমিতা, স্বপ্ন)। কবির অনুভূতির মধ্যে একটা চরম সত্য মূর্ত হয়ে উঠেছে তা হল—নগর সভ্যতা মানুষকে বেঁধে ফেলেছে আষ্টে পৃষ্ঠে। তা হলেও সেখান থেকে মুক্তির দর্শন তো দিতে হবে কবিকেই। সে দর্শন জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, জীবনে থেকেই। নন্দনতত্ত্বের বিশ্লেষণে—শুধুমাত্র বস্তু-নির্ভর যে সৃষ্টি তা যেমন পূর্ণ সৃষ্টি নয়, তেমনই শুধুমাত্র শিল্প-নির্ভর যে সৃষ্টি তাও পূর্ণ নয়। যে সৃষ্টি বস্তু এবং শিল্পের সমন্বয়ে সৃষ্ট তাই পূর্ণ।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন শিল্পের জন্যই শিল্প-বোধই কবি-চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। তাই প্রকৃতি-লীলাময় কবি বারবার ফিরে যেতে চেয়েছেন শিহরনের দিনে শবরী পৃথিবীর আদিমতায়। হয়তো মানুষ মাত্রই অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য খোঁজে একটা নিভৃত অবকাশ যা তার একান্ত নিজের, যার মধ্যে সে ডুব দিতে পারে আপন আনন্দে। যখন সে অবকাশ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে তখনই হয়তো মন তার বিদ্রোহী হয়ে কবিগুরুর সাথে প্রার্থনা করে "যাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—"।

গবেষণ চক্রবর্তী

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

৩। টাকা, চেক, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা : ২৪ পরগণা (ফোন : ৫৭-২৫৪০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক অবশ্যই হওয়া চাই Crossed a/c Payee Payable to UJJWAL BHARAT.

গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক গণের লেখার সঙ্গে উজ্জ্বল-ভারত উপযুক্ত মানের নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনাও প্রকাশ ক'রবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বল ভারত পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

With Best Compliments from

VARAS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

(Engineers, Manufacturers & Exporters)

- Electrical Division
- Alcohol Division
- Coke Briquette Division
- Export Division

Regd. Office :	**405, Saraswati Building,**	**Telephone :**	**68-1527**
	27, Nehru Place	**Telex**	**031-4333**
	New Delhi 110019	**Gram**	**RANJI**
Head Office	**7C, Urvashi Apartments**	**Telephone**	**44-8760/44-0191**
	3, Hungerford Street	**Telex**	**021-2915**
	Calcutta-700 017	**Gram**	**RANJI**

UJJWAL BHARAT Registered WB/NP-34 Central Regd. No. R. N. 2571/67

With best compliments from :

KLIPCON AND ASSOCIATES

STRUCTURAL AND MECHANICAL ENGINEER

Gram : "

Office : 22-8211
" : 22-0759
Resi. : 24-8020
Plant. : 66-4248

Plant :
261/276/277/2, G. T. Road, (N)
Salkia, Howrah.

Regd. Office :
6, Clive Row,
Calcutta-700001

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগুইহাটি, পো: অশ্বিনী নগর, কলি-৫২ ৫৭-২১৪০ হইতে প্রকাশিত এবং নিউপ্রিন্টার্স, ১১২/১২ বেলেঘাটা মেইন রোড, কলিকাতা-৭০০০১০ হইতে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ-মুদ্রণে : রেনবো আর্ট প্রিন্টার্স ১৭ এইচ মদিন সরকার স্ট্রীট।

স্বাধীনতা-দিবসের পতাকায় আন্দোলিত হোক জাতীয় সংহতির প্রতিশ্রুতি গণতন্ত্রের শপথ

আজ থেকে ৩৩ বছর আগে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এই দেশের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। সেই আন্দোলিত-পতাকার সামনে রক্তে ও স্বেদে কঠোর উত্তাল জনতা স্বপ্ন দেখেছিল এক সংহত ভারতবর্ষের; শপথ নিয়েছিল গণতান্ত্রিক সমাজ ও মেহনতী মানুষের শোষণ মুক্ত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, সমাজতন্ত্রের।

সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের ইতিহাসের সেই স্বপ্ন, সেই শপথ বারে বারে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। বিদেশী চক্র ও তারই স্বার্থবহ দেশীয় চক্র অবিচ্ছিন্ন আঘাত হেনেছে ভারতের সংহতির উপর, কখনও সাম্প্রদায়িকতার শাণিত অস্ত্রে, কখনও বা প্রাদেশিকতার হিংস্র আক্রমনে। আবার এই আঘাত ভয়ংকর ও নৃশংস হয়ে উঠেছে মেহনতী মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে। ১৯৮০ সাল সেই হীন চক্রান্তেরই এক রক্তাক্ত অধ্যায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পার্বত্যভূমিতে এই চক্রের পদচারণা। পশ্চিমবঙ্গেও তার অশুভ ছায়া। উত্তর-পূর্ব ভারতের জাগ্রত, গণতান্ত্রিক জনমতকে ব্যাহত করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে লালন করার জঘন্য ষড়যন্ত্র।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এই ঘনায়মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। মেহনতী মানুষের সরকার, জাতীয় সংহতী ও গণতন্ত্রের শত্রু এই বিচ্ছিন্নতাবাদের মোকাবিলায় অগ্রণী। গ্রাম-গঞ্জের ক্ষেত-খামারে, শহরের কলকারখানায় মেহনতী মানুষের কাঁধে কাঁধ দিয়ে, অনেক সংগ্রাম ও রক্তের মূল্যে অর্জিত যুক্তফ্রন্টীয় কাঠামোকে অটুট রাখতে, গণতন্ত্রের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে সমাজের দুর্বল ও অনুন্নত শ্রেণীর অধিকারকে প্রসারিত করতে বদ্ধপরিকর।

গত তিন বছরের শাসনে বামফ্রন্ট সরকার তার অতি সীমিত শক্তি নিয়েই এই উপলব্ধ সত্যকেই রূপায়িত করার প্রাণপাত চেষ্টা করেছে। গ্রামীণ দরিদ্রশ্রেণীর স্বাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় এনেছে গণতন্ত্রের বিস্তৃতি, কলকারখানার মেহনতী মানুষকে দিয়েছে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের অধিকার। দীনতম কুটিরেও প্রসারিত করতে চেয়েছে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ। বিচিত্র ও বহুবর্ণ ভাষা সংস্কৃতির আলোকিত দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে উত্তরের পার্বত্য ভূমি থেকে সমুদ্র-মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত এই গঙ্গাঞ্চলি বঙ্গভূমিতে। এক নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়েছে।

দরিদ্র শ্রেণীর জন্য আরও অনেক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মর্যাদাময় প্রতিষ্ঠার জন্য বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিষ্ঠিত মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তিই তো জাতীয় সংহতির বুনিয়াদ; তার প্রতিরোধের প্রাচীরেই তো গণতন্ত্রের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদের চূড়ান্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের বুনিয়াদ সেই সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতিশ্রুতিই ১৫ই আগস্টের উত্তোলিত পতাকায় আন্দোলিত হোক।

১৮৭২(৪০) / ডি, আই, ও, তাং—৯/৮/৮০

বর্গাদার ও পাট্টাদারদের প্রতি একটি আবেদন

আপনি কি ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়েছেন ?

তা হলে আজই তা শোধ করে দিন। শোধ করলে নতুন করে ধার পাবেন।

শোধ না করলে আর টাকা পাবেন না।

ব্যাংকের ধার না পেলে আপনারা আবার সেই রক্ত-চোষা জোতদার ও মহাজনদের খপ্পরে পড়বেন।

সেটা কি আপনারা চান ?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং ১৭৬৩(৪০) তাং ১. ৮. ৮০

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

পল্লী-জল সরবরাহের উন্নতির ব্যবস্থা

পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দৃষ্টি আকর্ষণার্থে বিজ্ঞপ্তি

পল্লী-জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতিসাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ একটি সমীক্ষা করতে চান। সেজন্য নিম্ন-লিখিত তথ্যাবলী সরকারের প্রয়োজন। তথ্যগুলি হ'ল :—

(১) মোট কতগুলি জল উৎস (কূপ এবং নলকূপ) ঐ এলাকায় আছে, (২) উহার মধ্যে কতগুলি সচল, (৩) কতগুলি অকেজো অবস্থায় আছে, (৪) কতগুলি জল উৎস সামান্য মেরামতির পর সচল করা যাবে।

প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে নিজ নিজ এলাকায় ঐ তথ্যগুলি যুগ্ম-সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা-৭০০০০১ এই ঠিকানায় অবিলম্বে সরবরাহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১৮৩২(৪০) / ডি. আই. ও. ভাং—৯/৮/৮০

With Best Compliments From

M/s. JAY KAY ENGINEERING

Manufacturer of

CEMENT PACKING MACHINES,
SPARES AND ELIVATOR HOBS

48-A, Karbala Tank Lane
Calcutta-700006

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

টাকা, চেক, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাঘেইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা : ২৪ পরগণা (ফোন : ৫৭-২৫৪০ ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক অবশ্যই হওয়া চাই Crossed a/c Payee Payable to UJJWAL BHARAT.

গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের লেখার সঙ্গে উজ্জ্বল-ভারত উপযুক্ত মানের নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনাও প্রকাশ করবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বল ভারতে পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

উজ্জ্বল ভারত

৩৩ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
ফাল্গুন '৮৬

সূচীপত্র

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা |
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৪৫
এক অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্ব/সম্পাদকীয়/৪৬
ফাল্গুনে বসন্ত আসে/শান্তশীল দাশ/৪৭
জীবন থেকে | বাণী নাগ | ৪৭
ও | কুমারেশ ঘোষ | ৪৮
সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি/স্বপন বুড়ো/৪৯
এক ফোঁটা নদী | নির্মলা প্রসাদ গৌমিক | ৫০
দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার চেতনা | সন্তোষ কুমার অধিকারী | ৫৯
নিমাই তার নাম | পরেশ সাহা | ৬৩
কর্তাভিজা ধর্ম সম্প্রদায় ও আউলে ফকির | তৃপ্তি ব্রহ্ম | ৭৫
পুরুষোত্তমানন্দ দিনপঞ্জী | ৬৭
দূরের আকাশ | অখিলরঞ্জন রায় | ৬৯
মার্কিনীরা কি শুধুই জড়বাদী ? | শরদিন্দু সাহা | ৭১
টক্কা টরে-টক্কা | ভবানী প্রসাদ মজুমদার | ৭৩
পোকা আর বোকা | সুব্রত দাস | ৭৩
লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী | অর্ণকুমার মুখোপাধ্যায় | ৭৫
আমেরিকা ভ্রমণ | অনুপমা সেন | ৭৭

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র
যুগ্ম সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা
মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক ১২ টাকা (সডাক)

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা

যেভাবে বিশ্বরাজনীতির মধ্যে এই বিশ্বের প্রতিটি দেশ জড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে কেহই আর অন্যকে অন্ধ বুদ্ধিতে দেখিয়া দূরে রাখিতে পারিবে না। আজ সব দেশের স্বার্থ এক, সমস্যা এক এবং সমাধানও এক।···বিশ্বকে পশ্চিমী দেশসমূহ একটি 'মৃত যন্ত্র' (machine) বলিয়াই জানে। তাই তাহারা সমস্ত অংশের সমস্ত দেশের (correlation) জানে না।···এই বিশ্ব একটি জীবন্ত যন্ত্র (organic) এবং ইহার প্রতিটি অংশ প্রত্যেকে প্রত্যেকের পারস্পরিক ভাবে উদ্দেশ্য ও উপায় (reciprocally end and means)। ভারতবর্ষও বিশ্বের প্রতিটি দেশের end and means এবং অন্যান্য দেশও ভারতবর্ষের end ও means। শুধু অংশগুলিই পরস্পরের উদ্দেশ্য ও উপায় তাহা নয়, এমনকি সমগ্র ও অংশ প্রত্যেকে প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ও উপায়। প্রতিটি cell-এর মধ্যে জীবনের যে রহস্য লুকায়িত রহিয়াছে, আজ তাহাই সমস্ত বিশ্ব-সমাজে প্রযোজ্য হইবার জন্য আকুপাকু করিতেছে। ভারতবর্ষ সর্ব প্রথমে এই রহস্য ধরিতে পারিতেছে বলিয়াই সে বিশ্বের অংশ হইয়াও এই ক্ষেত্রে কেনোপনিষদের ভাষায় 'ইন্দ্র' হইবে, বিশ্ববরেণ্য হইবে।···জড়বাদের দিক দিয়া পাশ্চাত্য end ভারতবর্ষ তাহার means। আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে ভারত end অন্যান্য দেশ means। বিধাবিভক্ত এই বিশ্ব এইবার পারস্পরিক end ও means হইয়া নিজ সমগ্রতাকে আস্বাদন করিবে।···

যেমন পারিবারিক সামগ্রিক 'স্বার্থে'র মধ্যে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত, যেমন দৈহিক স্বার্থের মধ্যে চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতির ক্ষুদ্র স্বার্থ নিহিত, তেমনই বিশ্বের সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যে প্রতিটি দেশের স্বার্থ নিহিত। দেহের মধ্যে যেমন দেহের ধারণ পোষণ করা রূপ একটা ক্ষুদ্রাদপি কর্মের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পরের উপযুক্ত হওয়া ও একমত হওয়া প্রয়োজন, ঠিক তেমনই বিশ্বের সামগ্রিক সেবা কর্মের মধ্যে প্রতিটি ছোট বড় দেশ পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পরিক সহযোগিতার জন্য উপযুক্ত ও একমত হইবে, বিশ্ব তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কৌষিতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে আছে দেহমন্থ সকল প্রাণ (ইন্দ্রিয়) একত্র হইয়া এক এক করিয়া সকল প্রাণকে প্রজ্ঞাপন করায়। সবেন্দ্রিয় এইভাবে পরস্পরের মধ্যে পরস্পর একীভূত হইয়া চলিতে পারিলেই সঙ্ঘ গঠিত হয়। Either co-existence or co-destruction—এই নীতিই উপনিষদের যুগে আবির্ভূত হইয়াছে। আজ তাহাই বাস্তবের ক্ষেত্রে কার্যকরী হইয়া চলিয়াছে। কোন জাতিই অন্যান্য জাতির সঙ্গে একীভূত না হইয়া নিজের সমস্যা সমাধান করিতে পারে না।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

এক অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্ব

এক অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে সাড়ে চারি শতাব্দিক বর্ষ পূর্বে এক ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে দেহ ধারণ করেছিলেন সে-দিনের নদীয়ার পরে সারা ভারতের শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর অপরূপ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন সেদিনের বাঙ্গালা আসাম উড়িষ্যা উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে যেভাবে পড়ে ছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বৃন্দাবন থেকে নীলাচল অবধি তাঁর জীবন ও চিন্তাধারা মানুষকে নতুন জীবন-চেতনার আস্বাদ দিয়েছিল। চূড়ান্ত যুক্তি এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী একটা প্রাণ কি করে চূড়ান্ত কৃষ্ণ-প্রেমেরও অধিকারী হয়ে কৃষ্ণময় হয়ে গেলেন আর সমগ্র সমাজের প্রাণকে এক নতুন চেতনায় জাগিয়ে তুললেন শ্রীচৈতন্য তারই দৃষ্টান্ত। তাঁর তত্ত্ববত্তার খোঁজ রাখবার যোগ্যতা যদি আমাদের নাও থাকে, তবু শুধু তাঁর মনুষ্যত্বের বিকাশ সেদিনের সমাজকে যতখানি উদ্বোধিত করেছিল তার হিসাব নিলেও আমরা দেখব অস্ত্র-ব্যবহার বা রাজনৈতিক কলকিকির না করে শুধুমাত্র কল্যাণবুদ্ধি বা প্রীতি প্রেমের দ্বারা মানুষকে শুধু জয় করাই যায় না, তার জীবনকে উন্নততর স্তরে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার স্বকীয় সত্তা নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ না করেও তাকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়।

বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে গীতিকাব্য-প্রবণতা, তার প্রাধান্য ও ক্ষুদ্রতাকে দূর করে তাকে বিশ্বের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিল, ব্যক্তির কথা বিশ্বের কথায় পরিণত হল শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের ফলে। বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুকুমার সেনের লেখায় শ্রীচৈতন্য-প্রভাবে বাঙ্গালী ঘরের কোণ ছাড়িয়া সমগ্র ভারত-বর্ষের দৃষ্টি-পথে দাঁড়াইল। পূর্বে বাঙ্গালী যে সকল প্রদেশ হইতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি লাভ করিয়াছিল, এখন সেই সকল প্রদেশবাসীকে তাহার নিজের অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির অংশীদার করিয়া সমধিক মর্যাদা লাভ করিল'। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে ধর্ম সমাজ সাহিত্য রাজনীতি সমস্তই নতুন রূপ পেল। ধর্মকে তিনি সমষ্টিগত করলেন, সঙ্ঘের মধ্যে নামিয়ে আনলেন যা একেবারে বিপরীত হল ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্গে। শ্রীচৈতন্য-প্রসাদেই ধর্মসাধনায় অবচনেরও অধিকার জন্মাল। সেই থেকেই সমাজের তথাকথিত নিম্নতমদের ঘরেও হিন্দুর দেবতার আর তুলসীর মঞ্চের প্রবেশাধিকার ঘটল। কীর্তন আর মহোৎসবের সৃষ্টি হল, গগনস্পর্শী তার আত্মিক প্রকাশের একটা সমষ্টিগত উপায় পেয়ে শান্ত হল, অস্পৃশ্যতার কঠিন দেওয়ালেও আঘাত লাগল।

শ্রীগৌরাঙ্গ-জীবন অহিংস অসহযোগ অন্দোলনের পরিচয়ও রেখেছে। কাজীর নিষেধে তিনি তাঁর সংকীর্তনের অধিকার প্রত্যাপনে কুণ্ঠিত হন নি। সংঘবদ্ধ প্রাণকে সঙ্গে নিয়ে নিজে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে।

'যে ধর্ম মানুষকে অধিকার রক্ষায় উন্মাদ করে না, সে কি আবার ধর্ম? এমন ধর্ম বর্তমান ভারতের প্রয়োজন যার আস্বাদন ভারতবর্ষকে তার অন্নের অধিকার, বস্ত্রের অধিকার, জলের অধিকার, ধর্মের অধিকার অটুট রাখবার জন্য সমস্ত বিরুদ্ধকে হজম করবার শক্তি দেয়। মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম মানুষকে ভীরু করে নি, মানুষকে সে শক্তিমান করেছে' পুরুষোত্তমানন্দ।

কবিতা

ফাল্গুনে বসন্ত আসে

শান্তশীল দাশ

অশোকে-পলাশে-রাঙা,
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে সে আলোর সমারোহ –
কোথায়-যে গেল সব !
সে-কোকিল আজো ডাকে, মনের গভীরে তার
প্রবেশ নিষেধ।
যে-ডাকে আনন্দ ছিল, আজ ক্লান্ত করে।
অতিক্রান্ত সেই যুগ ;
প্রকৃতির কাছাকাছি ছিল যারা আত্মীয়ের মত,
আজ তারা নেই।
ভিন্ন জগৎ দু'জনার—কত-না অচেনা !

ঘুরে চলে দিন রাত,
সে ঘড়ির তলায়
একটু একটু ক'রে অনুভূতিগুলো সব
পিষ্ট হয় ; যন্ত্র হয়ে যায় সেও :
কাজ করা, কথা বলা
দম দেওয়া কল যেন সব !

আবর্তিত হয় শুধু যথারীতি সে-দিনের মতো ;
সেই আবর্তনে
ফাল্গুনে বসন্ত আসে :
কৃষ্ণচূড়ার ডাল রাঙা হয়ে যায়,
সেজে ওঠে অশোক-কিংশুক,
চূত মঞ্জরীর গন্ধে আমোদিত বন—
যারা আছে, তেমনই আছে,
আছে সেই ঐশ্বর্য সম্ভার।
শুধু নেই সে মানুষ, সেই মন, সেই অনুভূতি—
কোথায় হারিয়ে গেল ! কোথায়, কোথায় !

পথে যেতে যেতে যেতে হঠাৎ কখন
আনমনা হয়ে ওঠে মন ;
দূর কোনো কোকিলের স্বরে
সর্বহারা পথিকের বুকে
অস্পষ্ট বেদনা এক, অব্যক্ত যন্ত্রণা—
সেই দিনগুলি আর
ফিরবে কি কখনো ?

জীবন থেকে

বাণী দাশ

একই সঙ্গে শুনলেও গান
আমার যেন অন্য শোনা
একই সঙ্গে দেখি, তবু
আমার যেন অন্য দেখা
চলেও পথ সবার সঙ্গে
আমার পায়ে অন্য ছন্দ
কেউ না পেলেও আমি ত পাই
জীবন থেকে দুঃখের গন্ধ।

সুখ

শ্রীগোপাল ভৌমিক

ব্যথার 'পরে ব্যথা পেলে দুঃখ বাড়ে
কোথায় সুখ ?
বুকের ভেতর রঙিন স্বপ্ন সাজিয়ে রাখার
ইচ্ছাতেই,—হৃদয় জাগুক।

৩

কুমারেশ ঘোষ

ওর কাজই হচ্ছে শ্মশানে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া। কত যে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বাজারে এক দোকানে ওর আড্ডা।

কেউ মরে গেলে সেই বাড়ির লোকেরা এসে ওকে নিয়ে যায়। ও কোন আপত্তি না করে তাদের সঙ্গে চলে যায়। তাদের বাড়ির মৃতদেহ বিনা আপত্তিতে বিনা দ্বিধায়, জাত বিচার না করে বয়ে নিয়ে যায় শ্মশানে। সেখানে মৃতদেহ পৌঁছে দিয়েই ওর কাজ শেষ হয়। পরে সেখান থেকে প্রায় সে যায় শ্মশানের ডোমেদের ঘরে।

শ্মশানের ডোমেদের সঙ্গে ওর খুব ভাব।

খানিকক্ষণ সেখানে থেকে একটু বিশ্রাম করে ও আবার চলে যায় বাজারে, তার আরগায়।

ও সত্যিই পরোপকারী।

অথচ ওকে সেজন্যে কেউ ধন্যবাদটুকুও দেয় না।

লোকে ভেবে নিয়েছে, ঐ হচ্ছে ওর কাজ। ঐ কাজ না করলে ওর ঘুম হবে না।

তাই বটে। রাত্রেও ওর ডাক পড়ে। না ঘুমিয়েই ও ছোটে ওর কাজে। কেউ ওকে আনতে গেলেই হলো।

আর পাড়ার লোকগুলোও যেন জেনে ফেলেছে, ওকে আনতে গেলেই আসবে। ঐ কাজটাই ওর নেশা।

সেদিনও দেখলাম, ও আমারই পরিচিত এক ভদ্রলোকের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চললো শ্মশানে। আমিও সঙ্গে গেছলাম। দেখলাম, কাজ সেরে সে চলে গেল শ্মশানের ডোমেদের ঘরে। বোধ হয় নেশা করতে।

যতক্ষণ শ্মশানে ছিলাম, বেরুলো না ও।

তবে পরদিন বাজারে গিয়ে দেখি ও ওর সেই ঘর খানার দাঁড়িয়ে ফিকফিক করে হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

বুঝি চোখ টিপে বলছে, কী? যাবো নাকি?

আমি হেসে বললাম, এখনও আমার সময় হয় নি। সময় যেদিন আসিবে সেদিন, বন্ধু আসিবে তোমার এ কুঞ্জে।

বেশ, আমি সে আশাতেই রইলাম।—হেসে বললো খাটিয়াটা।

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের : শ্রীগীতা ২৮·০০
ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৫·০০ সদা পাঠ্য গীতা ২·০০
বৃহৎ পকেট গীতা ১১·০০ শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ২৫·০০
সুলভ পকেট গীতা ৩·৫০ কর্মবাণী ৩·০০
পদ্যগীতা ৩·৫০ ভারত আত্মার বাণী ৩·০০
নিত্য পাঠ্য গীতা ২·৫০ Soul of India Speaks ১২·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী ৮·০০ রাজর্ষি রামমোহন ৬·০০
বীরত্বে বাঙালী ৬·০০ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ৮·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী ১০·০০ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ৪·০০
বাংলার ঋষি ৮·০০ যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ৬·০০
বাংলার বিদুষী ৬·০০ রবীন্দ্রনাথ ৬·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি ৪·০০ নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন ৪·০০
সরল যোগ ব্যায়াম ৪·০০ যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ৪·০০
ও ব্যায়াম ৪·০০ যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ ৭·০০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

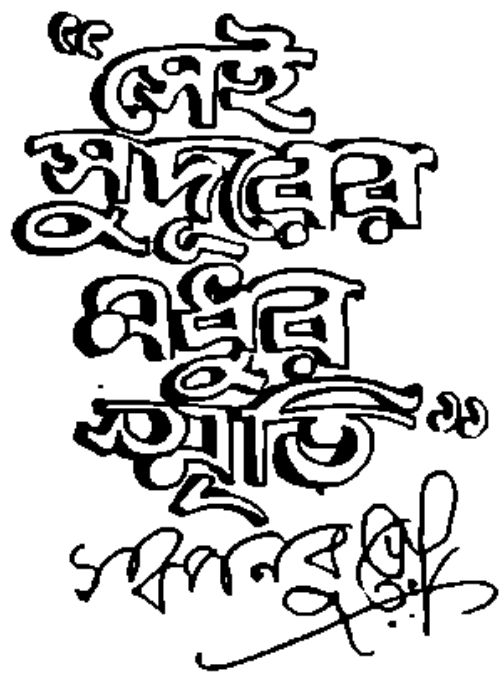

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[এগারো]

মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেল।

আমরা ধীরে ধীরে নীচু ক্লাশ থেকে ওপরের ক্লাশে উঠলাম।

অবশেষে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলাম।

আমি ছাত্র হিসেবে—অঙ্কে ও সংস্কৃতে বেশ কাঁচা ছিলাম।

বাবা যখন সন্দিহান হলেন যে, হয়ত আমি অঙ্কের জন্যেই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবো না, তখন তিনি খুঁজে পেতে এক প্রাইভেট টিউটার জোগাড় করে আনলেন।

তিনি এসে তেড়ে মেড়ে আমায় দিন রাত অঙ্ক কষাতে লাগলেন।

আমি হতাশায় আর উত্তেজনায় শুধু মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলাম, আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এই অঙ্ক করে আমার কি লাভ হবে ?

এর মধ্যে এক কোঁটা রস-কস নেই—না আছে কবিতার মিল আর ছন্দ—না আছে এক বিন্দু আনন্দ !! আর—না আছে সুন্দর রসালো অনুভূতি— !! এই "পাইথাগোরাস—পিথিগোরাস—পেন্সিল আর "টাকা আনা পাইয়ের" হিসেব করে আমার কি পরমার্থ লাভ হবে ?

কিন্তু কর্মফল ছোড়তা নেহি।

কাজেই চিরতা খাওয়া মুখ করে আমায় দুইবেলা নানা জাতের কাল-টক্-নোন্‌তা আর বিস্বাদ অঙ্ক করে যেতে হল।

কয়েকদিন বাদে দেখা গেল—

আর এক প্রাইভেট টিউটর এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর নাম কষ্টু পণ্ডিত।

ঝটিশের ছাত্ররা ওই নামেই তাকে ডাকত।

এই কষ্টু পণ্ডিত তাঁর মাথা-জোড়া টাক নিয়ে—আমার অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে নানা খাটা—খাটনি করে সংস্কৃতের ব্যাকরণ শিখিয়েছিলেন।

সে কথা আজও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

নিজে পড়ছি,—আর আশে পাশে খবর নিচ্ছি—আমার অন্যান্য বন্ধুরা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য কি ভাবে তৈরী হচ্ছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, মুখে কেউ স্বীকার করবে না—সে রাত দিন পড়ে পড়ে চোখের ঘুমকে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

পড়া—পড়া আর পড়া !

তখনকার দিনে ছাত্রদল সত্যি ফাঁকিবাজ ছিল না। পড়তে পড়তে বইয়ের পাতা তারা ছিঁড়ে ফেলত। সে যুগে আজকের মতো নোট পড়বার এত রেওয়াজ ছিল না। মূল পাঠ্য পুস্তকই ছাত্রদল—মন্থিয়া হয়ে মুখস্ত করত।

তবে একথা ঠিক যে মুখস্ত বিদ্যেটাই ছাত্রদলে বেশী

প্রয়োগ করত। তার ফলে হত কি, অনেক সময় ছাত্ররা না বুঝেই মুখস্ত করা বস্তুটি পরীক্ষার খাতায় বেমালুম উগড়ে দিয়ে আসত। আর মনে মনে এই ভেবে আত্ম-তৃপ্তি লাভ করত যে এক কুড়ি নম্বর পাওয়া যাবে।

আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বে অনেক ছাত্র রাত দিন বই মুখস্ত করে একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়ল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা এসে গেল এবং একদিন সেও হয়ে গেল।

মোটামুটি পরীক্ষা ভালই দিয়েছিলাম। কারুর পড়া তৈরীতে ফাঁকি দি নি। মূল পাঠ্যপুস্তক পড়েই পড়া তৈরী করেছিলাম। কোনো চলতি নোটবুকের আশ্রয় নেই নি।

অঙ্ক আর সংস্কৃতে কাঁচা ছিলাম।

সে কথা আগেই বলেছি।

দুই প্রাইভেট টিউটার আমাকে বেশ করে পড়ে পিটে তৈরি করে দিয়েছিলেন।

সেজন্যে আজও এই বৃদ্ধবয়েসে তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

পরীক্ষাত' শেষ হয়ে গেল।

ফল বেরুতে অনেক দেরী।

সামনে দীর্ঘ অবকাশ।

কিছু বাইরের বই, শিশু মাসিক ইত্যাদি পড়ে সময় কাটাতে লাগলাম।

হঠাৎ লোভনীয় প্রস্তাব এলো, দেশের বাড়ী ঘুরে আসতে পারি।

অনেক কাল দেশের বাড়ীতে যাওয়া হয় নি। সেই খাল-বিল-নদী-বাঁশায় ভর্ত্তী—ছায়ায় ঢাকা আমাদের ছোট্ট গ্রামটির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

পরীক্ষার পর অবসর যাপনের জন্যে মাকে নিয়ে আমার সেই চির পরিচিত গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। ছায়ায় ঢাকা, পাখীডাকা—শ্যামল সবুজ নীড়ে!

সেই আমার পূর্ব পুরুষের ভিটে— মুন্সী বাড়ী।

যেখানে এককালে ঐশ্বর্যের দিনে নহবৎ বাজত—সেই নহবৎ খানা, শিবের মন্দির, মুন্সী বাড়ীর পুকুর, নাটমন্দির, তিন মহলা বাড়ী—আর মুন্সী বাড়ীর চারটি দিঘি।

বড় তরফ, মেজো তরফ, রাঙা তরফ, আর ছোট তরফ। আমাদের দিঘির নাম—বড় তরফ।

অন্যান্য তরফের সবাই দেশের বাড়ীতেই আছে। কেউ বিদেশ যায়নি।

মুন্সী বাড়ীর সঙ্গে প্রায় লাগোয়া গ্রামের বারোয়ারী কালীবাড়ী। প্রতি বছর এখানে ধুম করে কালী পুজো হয়, মেলা বসে, যাত্রাও হয় একদিন। গ্রাম একেবারে জেগে ওঠে।

সেই সব ভুলে যাওয়া ছবি আমার চোখেরওপর ভেসে উঠল।

আমাদের গ্রামের নাম সাকরাইল গ্রাম।

আমাদের পাশেই বিখ্যাত সন্তোষ গ্রাম। যে গ্রামের জমিদাররা সন্তোষ ট্রফির প্রবর্তন করেছেন।

দুই ভাই প্রমথ মন্মথ কৃতি পুরুষ। প্রমথ রায় চৌধুরী খ্যাতিমান কবি—কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু। ছোট ভাই মন্মথ বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

সে যুগে খুব নাম করা শিক্ষাবিদ জমিদার ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন—সেই ইংরেজী আমলে।

আমাদের ছোট গ্রাম সাকরাইলেরও শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বেশ খ্যাতি ছিল।

সেই পুরোণো আমলে আমাদের ছেলেবেলায় মাইনর স্কুল ছিল, মেয়েদের বিদ্যালয় ছিল, টেলিগ্রাফ, অফিস ছিল। সরোজ নলিনী নারী সমিতির একটি শাখা ছিল। গ্রামের মেয়ে ও বৌরা এখানে মিলিত হতেন। আমার এক কাকার অর্থানুকূল্যে গ্রামে একটি স্থায়ী মঞ্চ ছিল। সেখানে গ্রামের তরুণ সম্প্রদায় মাঝে মাঝে অভিনয়ের আয়োজন করতেন। বীণাপাণি রঙ্গমঞ্চ।

তাদের নাট্যাভিনয়ের সুনাম ছিল।

আশে পাশের বহু গ্রাম থেকে—বিশেষ করে চান্দাইল

থেকে দল বেঁধে দর্শকদল আসত—আমাদের গ্রামের অভিনয় দেখতে।

আমরা ছেলেবেলায় এই বীণাপাণি রঙ্গমঞ্চে অনেক অভিনয় দেখেছি।

তার ভেতর হরিশ্চন্দ্র, সাজাহান, আলিবাবা প্রভৃতি নাটকের কথা এখানো মনে পড়ে।

অমৃতলালের কি একটা নাটক ছিল—যার গান এখনো মনের কোনে উঁকি দেয়—

"নৈহাটির ঘাটে
বসে পৈঠের পাটে—"

আরো বহু নাটক সেকালে এই মঞ্চে অভিনীত হয়েছে।

এবার গ্রামে ফিরে গিয়ে শুনলাম—আবার নতুন করে নাটক করবার তোড় জোড় হচ্ছে।

আসল কারণটাও অবশ্য জানা গেল—আমাদের গ্রামের তরুণ শিক্ষিত যুবক গ্রাজুয়েট হয়েছেন। তাঁর নাম-হরিপদ নিয়োগী। তাঁর বিয়ে ও ঠিক হয়েছে। আর এই উপলক্ষে সারা গ্রামের তরুণদল মেতে উঠেছে। সুতরাং বিয়ের একটি উল্লেখ যোগ্য অঙ্গ সাকরাইলের নাটক।

আমিও এই দলে ছুটে গেলাম।

একে বিয়ের আনন্দ—

তার ওপর আবার নাটক—

দিনরাত রিহার্সেল সুরু হয়ে গেল—

কিন্তু এই সময় হঠাৎ আমি দারুণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লাম।

যতদিন কলকাতায় ছিলাম-স্বাস্থ্য বেশ ভালোই যাচ্ছিল।

কিন্তু দেশের বাড়ীতে এসে—রৌদ্রে জলে ভিজে পুড়ে অনেক অনিয়ম করে এই ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হয়ে পড়লাম।

কোথা দিয়ে যে বিয়ে গেল—

কোন পথে যে নাটক শেষ হয়ে গেল—

কিছুই জানতে পারি নি।

যখন জ্বর উঠত—একেবারে ১০৫°—১০৬° ডিগ্রি উঠে যেতো। আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে যেতাম। তখন গ্রামে—বরফ কোথায়? কুয়োর ঠাণ্ডা জল ক্রমাগত মাথায় ঢালা হত। জ্বর ধীরে ধীরে কমে আসত। ইতিমধ্যে একটি সুখবর গ্রামে এসে পৌঁছে গেল—আমি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। কিন্তু এই পাশ করার আনন্দ আমি উপভোগ করতে পারলাম না। তখন দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আমি একেবারে শয্যাশায়ী। পাশের খবরটা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।

তারই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে অনেকে এসে আমার অভিনন্দন জানিয়ে গেল।

কেউ কেউ ভোজ খাবার আবদার জানালো। কিন্তু ভোজ খাওয়াবে কে?

সেত' তখন জ্বরে কাতরাচ্ছে।

কিন্তু অসুখের অজুহাতে চুপচাপ পড়ে থাকলেত' চলবেনা।

কলেজে এবার ভর্ত্তী হতে হবে।

বেশী দেরী করলে-হয়ত কলেজে সিট্ পাওয়া যাবে না।

কাজেই কুইনিন দিয়ে ম্যালেরিয়াকে কোনো রকমে কাবু করে কলকাতার উদ্দেশেই রওনা হতে হল।

কলকাতায় ফিরে ঘটা করে চিকিৎসা চললো। প্রথমে কবিরাজী, তারপর অ্যালোপাথী।

আমার মামা কবিরাজ।

কিন্তু কবিরাজীতে ম্যালেরিয়া সারে না।

অগত্যা এ্যালোপাথীর শরণাপন্ন হতে হল। এখানে এসে শুনলাম, মামা আমার অসুখের কথা শুনে আর কিছুতে দেরী দেখে স্কটিশ কলেজে আর্টে ভর্ত্তী করে দিয়েছেন। স্কটিশের ছাত্র, আর নম্বর মোটামুটি বেশ ভালোই ছিল। সুতরাং ভর্ত্তীর কোনো অসুবিধে হয় নি কিন্তু মামা স্কটিশ কলেজে আমাকে ভর্ত্তী করে দিয়েছিলেন বটে। আমার আবার "পিক্চর আর্ট" পড়ার মোটেই ইচ্ছে ছিলনা।

সেই অনিচ্ছার কথা মামাকে জানালাম। কিন্তু মামা উত্তরে জানালেন, অভিভাবকেরা অনেকেই চান তুমি ওকালতি পাশ করে উকিল হও। আর হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিশ করো।

দিনাজপুরে আমার ছোটমামাই—কেদার নাথ সেন—আমার বিশেষ কল্যাণকামী। তিনিও মত প্রকাশ করেছেন যে, আমি যেন উকিল হই।

আমার কিন্তু উকিল হতে আদৌ ইচ্ছা নেই। ইতিমধ্যে বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে আমি গোপন আমন্ত্রণ পেয়ে গেছি। ক্ষণে ক্ষণে তার আহ্বানও আমি মনে প্রাণে অনুভব করি।

এছাড়া উকিল হয়ে ক্রমাগত মিথ্যার বেসাতি করার বাসনা আমার মনে কখনো উদয় হয়নি।

ছেলেবেলা থেকেই আমার ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল। "বটানি" শাস্ত্রটা গাছপালার বিষয় নিয়ে লেখা। ছেলে বয়েস থেকে আমি বনে বাদাড়ে গাছ পালার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছি। তাছাড়া আমি জানতে পারলাম, বটানি নিলে অনেক ছবি আঁকতে হয়।

তা হলে আমার দুটো মনোবাসনাই পূর্ণ হবে।

সুতরাং আমি "বটানি" নিয়ে কেন পড়বো না? এই বটানি বিষয়টি আমার মনকে সত্যি আকর্ষণ করল। সুতরাং অভিভাবকের কাছে আমার মনোবাসনার কথা জানালাম।

প্রথমে তিনি আমার প্রস্তাবটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন।

—বটানি পড়ে কি লাভ হবে?

জীবনে মানুষ হয়ে উপার্জন করতে হবেত'!

মায়ের দুঃখ দূর করতে হবে ত?

তখনই জমিদারীর অবস্থা কাহিল হয়ে আসছে।

অবশ্য নানা অঞ্চলে ছড়ানো আছে আমাদের জমিদারী। তা থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যে অর্থ সংগ্রহ হয়—আমাদের ছোট সংসার তাতে দিব্যি হেসে খেলে চলে যায়।

কিন্তু আমি ত' মামাবাড়ীতে মামার কাছে মানুষ হচ্ছি। আমার সে ভাবনা নেই।

সমস্যা দেখা দিল আমরা পড়াশোনা নিয়ে। স্কটিশ কলেজে আর্টস্ নিয়ে দিব্যি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ওই বটানি আমার মগজে এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করল।

ভাবনা তাতেও আছে।

স্কটিশ কলেজে বটানি বিষয়টি পড়ানো হয় না। আশে পাশের কলেজে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সেখানেও বটানি পড়ানো হয় না।

বটানি পড়ানো হয় বউবাজারের সেই "সায়েন্স এসোসিয়েশনে।" সন্ধ্যাবেলায় ক্লাস হয়। কিন্তু স্কটিশে পড়লে সে অনুমতি পাওয়া যাবে না।

অন্য কলেজে ভর্তী হয়ে—সেই কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এই বটানি পড়তে হবে সায়েন্স এসোসিয়েশনে।

সুতরাং প্রথমে আমি স্কটিশ কলেজে পড়বার লোভ ত্যাগ করলাম।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সিটি কলেজে ভর্তী হয়ে—কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সেই বউবাজারের "সায়েন্স এসোসিয়েশনে" আবার ভর্তী হয়ে বটানি পড়তে সুরু করে দিলাম।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্লাশ হত।

সুতরাং সিটি কলেজের ক্লাশ শেষ করে বাসায় ফিরে কিঞ্চিৎ জলযোগ সম্পন্ন করে আবার খাতা পত্র নিয়ে বউ বাজারে গিয়ে হাজির হতাম।

বটানি পড়তে সুরু করে ওখানে অনেক ছবি আঁকবার সুযোগ পেয়েছি।

তাতে আমার ছবি আঁকার উৎসাহ আরো বেড়ে গেছে।

এই ভাবে ছুটোছুটি করে কলেজে আমার পাঠা-জীবন সুরু হয়ে গেল—

কিন্তু সাহিত্য চর্চা সেই সঙ্গে চলছে।

[চলবে]

॥ ছোট গল্প ॥

এক ফোঁটা নদী

নির্মাল্য প্রসাদ ভৌমিক

নিথর রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে পি-ডাবলিউ-ডি রোড হতে যাত্রীবাহী বাসের তীক্ষ্ণ হর্ণ কানে এলে বাসু সাহেবের তন্দ্রাভাব ভাঙ্গল। খানিকটা দূর হলেও কণ্ডাক্টরের "লাইট বাস" "লাইট বাস" বলে চীৎকার স্পষ্ট কানে আসছে।

ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে দশটা। ফাইল বন্ধ করে তিনি এয়ার-কণ্ডিশনারের সুইচ অফ করলেন, টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে পুসবাটন টিপে নাইট ল্যাম্প জ্বালালেন, তারপর সামনে রাখা ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ কালো কফি ঢেলে নিয়ে একটি চুরুট ধরিয়ে জানালা খুলে ধারে রাখা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে ষ্টেট হাউসটি সত্যিই সুন্দর। আধুনিক বিলাস-ব্যসনের প্রায় সব সরঞ্জামই সমুপস্থিত। এখানে আসার পূর্বে মনে যে অপ্রসন্ন ভাব ছিল তা সম্পূর্ণ কেটে গেল।

পাড়াগাঁর রাত্রি — চারিদিক ইতিমধ্যেই নিস্তব্ধ ও স্তব্ধ। এখন জুলাই মাস-এ সময়ে সাধারণতঃ বর্ষা নামে-এবারে বর্ষা আসছে দেরী করে বসে থেকে দমদম এয়ারপোর্টে রাত্রি পৌনে আটটায় যখন এসে পৌছান তখন আকাশে ছেড়া খোড়া মেঘের ভীড় ছিল বটে, তবে প্রচণ্ড গুমোটে শীঘ্র বৃষ্টি হবে মনে হয়নি।

ষ্টাডিতে বসে থাকাকালে সম্ভবতঃ কিছু বৃষ্টি হয়েছে। জানালা দিয়ে আর্দ্র ঠাণ্ডা, মৃদু হাওয়া বইছে। আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের স্তূপের ফাঁকে ব্রীড়াবগুণ্ঠিতা লজ্জাবতী বধূর মত এক ফালি চাঁদ। গাছের পাতায়, পি-ডাবলিউ-ডি রোডের ভেজা পীচের উপর জলের কণাগুলো অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় হীরের কুচির মত জ্বল জ্বল করছে। কোথায় কোন গাছ থেকে একটা রাত জাগা পাখী কুক্ কুব্ করে ডাকছে। অন্ধকারে নিঃশব্দ জোনাকি মেয়েদের ইতস্তত: বিচরণ, উতলা কলাপীর ও ঝিঁঝির একটানা ঐকতান, বেলফুলের মিষ্টি গন্ধ—বাসু সাহেব আত্মবিস্মৃত হলেন।

সারাদিন বম্বেতে প্রচণ্ড দৌড়ঝাঁপ হয়েছে। দিনের অনেকটা সময় পথে পথেই কেটেছে। অফিস পাড়া থেকে অনেক দূরে ফ্যাক্টরি এক্সটেনশন বিল্ডিং সংক্রান্ত দুটো মিটিং, অফিস পাড়ার ভেতরে একটি নোতুন ফ্যাক্টরির ব্যাপারে কনফারেন্স—এক ফাঁকে অফিসে এসে জরুরী কিছু কাজ কোনক্রমে সেরে, রঙ্গনাথনকে ডিকটেশন আর ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সান্তাক্রুজ এয়ার পোর্টে সেক্রেটরিকে নিয়ে যখন পৌছেছেন প্লেন টেক্ অফ করার তখন আর দশ মিনিট বাকী—ছ'টা থেকে রাত প্রায় পৌনে আটটা অবধি আকাশে ভেসেছেন এবং সে সময়ে আগামীকাল নিউদিল্লীর যোজনা ভবনে কনফারেন্স সংক্রান্ত ফাইলে ক্রত চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন—রাত্রি আটটায় দমদম এয়ার পোর্ট আর ন'টায় বসন্তপুর। গভীর ক্লান্তিতে দুচোখ বুজে এল।

কতদিন পরে তিনি গ্রাম বাংলায় ফিরে এলেন? মনে মনে হিসেব করলেন বাসু সাহেব। প্রায় তের বছর—অশোক যখন শিয়ালদার পোষ্টেড তখন তিনি এই পথ—এই বসন্তপুর গ্রামের উপর দিয়ে মার্টিন লাইট রেলওয়ের ছোট গাড়ী করে অশোকের কাছে বার কয়েক বেড়াতে এসেছেন—মাঝখানের এগার বছর বিদেশের প্রবাস জীবন—তারপর আজ প্রায় এগার মাস বম্বে। এই এগার মাসে বার ছয়েক কলকাতায় কার্যব্যপদেশে এসেছেন বটে, কিন্তু চৌরঙ্গী আর ডালহৌসী স্কোয়ারেই তার চলাফেরা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এবারেও আসার তেমন স্থিরতা ছিল না, কিন্তু নাছোড়বান্দা সেক্রেটরি গত ছ'মাস ধরে এমন করে পেছনে লেগে আছে যে তার হাত এড়ানো গেল না। আসল কথা, ওদের job টা এত ছোট যে

সিম্পসন, পাটেল এণ্ড এসোসিয়েটস্ এর ক্ষেত্রে ঠিক আসে না। এখন মনে হচ্ছে respite হিসেবে এ মন্দ হয়নি— দীর্ঘ বারোবছর অতিক্রম করে তিনি যেন সুধাভাষলিমা পারে এসে পৌঁছেছেন। ওঁর ক্লান্তিক্লিষ্ট, ক্লান্তার্ত মন যেন জুড়িয়ে গেছে। তিনি চার বছর আগে যখন কানাডায় তখন যা চোখ বুজেছেন, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে, নিঃসীম আকাশ আর অন্তর্হীন হাওয়ার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মায়ের উষ্ণ শরীর আর স্নেহের ছোঁয়া—তবু কলকাতা, তাঁর পূর্ব পরিচিত ঘনিষ্ঠ পরিবেশ, আত্মীয়, বন্ধু—কারো জন্য তিনি লালায়িত নন—বরং তিনি এদের সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলেন। অপরিচিত সমাজ আর দেশই প্রেয়—সেখানে তিনি নিজেকে খুঁজে পান। এখানে এসে কি রকম যেন নগণ্য হয়ে যান—এখানে এসে তিনি আর খ্যাতনামা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কাউন্সেশন স্পেশালিষ্ট ও আর্কিটেক্ট বাসু সাহেব থাকেন না, নানা বিষয়ে যাঁর সুচিন্তিত অভিমতে দেশের ও বিদেশী সরকার গভীর ভাবে আগ্রহী— নন বোধের বিখ্যাত সিম্পসন, পাটেল এণ্ড এসোসিয়েটস এর কনসালটান্ট ও সিনিয়র পার্টনার— এখানে তিনি এক অখ্যাত, অবজ্ঞাত অরবিন্দ বসু— যাঁর স্ত্রী বার বৎসর কাল নিরুদ্দিষ্টা—যিনি পরিচিত সমাজে করুণার এবং উপহাসের ও পাত্র। কেন এমন হল? উনি জানেন না। সে প্রশ্ন আজ ও অনুদ্ঘাটিত, সে প্রশ্নের উত্তর আজ ও অনুচ্চারিত। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ বিপর্যয় তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে ওটাকে কোন কারণ বলেই মনে হয় না বাসু সাহেবের। তা হলে কেন ওঁর স্ত্রী এমন বীভৎস পথ বেছে নিল? ইণ্ডিয়ায় ফিরে এই এগার মাস তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রাণপণে ওকে খুঁজেছেন-কিন্তু না, কেউ দীপার হদিস জানে না— দীপা নামের একটা মেয়ে, একটা অসহিষ্ণু মেয়ে যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। সকলেই ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত। কারো সময় নেই। এই তাণ্ডব কাণ্ড বিদেশে যাবার আগে ঠিক এই চেহারায় তাঁর চোখে পড়েনি। তা, তোমাদের কি হলো? হবে আবার কি? এখন আমাদের চাহিদা অনেক। আমাদের ফ্রিজ চাই, টি-ভি চাই, টেলিফোন চাই, গাড়ী চাই, বাড়ী ন্যূনপক্ষে একটা ফ্লাট ত চাই-ই। আর ও অনেক কিছু চাই— এখন তাড়াতাড়ি সব ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। আর এ সবের জন্য টাকা চাই— অনেক টাকা, অনেক অনেক টাকা—আর বেশী টাকা রোজগার করতে হলে সময় চাই, অনেক সময় চাই— ছুটতে ছুটতে কেউ যদি হারিয়ে যায়, পিছিয়ে যায়, পদস্খলিত হয়, আমরা অবশ্যই দুঃখিত হবো। কিন্তু তার বেশী আর কি-ই বা করতে পারি? দীপা হারিয়ে গেছে তো কি হয়েছে, যার যেমন কর্মফল সে তো ভোগ করবেই। বাসুসাহেব, দীপা— ওদের জীবন নিয়ে, নিজেদের ভবিষ্যৎ উপেক্ষা করে ভাইবোনদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণপণ করেছেন। তা কি হয়েছে— সে ত কর্তব্যানুরোধেই করেছেন। অদৃষ্টের পরিহাস বটে। বাবা গত হলে যখন তিনি কলকাতায় বাসা করেন তখন সহজবোধ্য কারণেই বড় ফ্লাট ভাড়া নিতে পারেন নি, তিনঘরের ফ্লাটটা ওদের পক্ষে বরং ছোটই ছিল— ছোট বোন দুটির জন্য একটি, একটি মায়ের, ওঁর এবং দীপার জন্য মাত্র একটি ঘর— অসুবিধা প্রচুরই ছিল আর এ নিয়ে দীপার খুতখুতে শুচিবাইগ্রস্ত মনে চাপা অসন্তোষ ও ছিল। অতিথি এলে, ফিটফাট সাজানো গোছানো বলে, ওঁর ঘরেই বসাতে হতো আর এটাতে ছিল দীপার ভীষণ আপত্তি। আর এখন! যেহেতু যে ফ্লাট উনি অফিস থেকে পেয়েছেন ওঁর একক জীবনের পক্ষে তা এত বিশাল যে সেখানে নূতন আর এক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে— ঝড় জলের রাতে প্রবল হাওয়া যখন শন শন করে বয়ে যায়, বজ্র ও বিদ্যুতের ঝলকানিতে আকাশ থর থর করে কাঁপে তখন ওঁর গা ছম্ ছম্ করে— নির্জনতা যেন হা হা করে ওঁকে গিলতে আসে—অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে কেমন ভয় ভয় করে—ছোট্ট টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে, রেডিও চালিয়ে এমনি কত রাত গান আর অর্কেস্ট্রা শুনে কাটিয়ে দেন। এমনি কাটে ছুটির দিন ও। সময় যেন থেমে যায়। টুকরো জীবনে ছুটি বলিও কদাচিৎ মেলে, তখন সময় যেন আর কাটে না। চরিত্র গত ভাবে তিনি অন্তর্মুখী—

ধার, আড্ডা-এসব ভালো লাগে না। এক আধটুকু মদ্যপান কখনও যে না করেন তা নয়— কিন্তু তা ও ওঁর ভালো লাগে না। উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে মদ্যপান যে অত্যাবশ্যকীয় এ যুক্তি ওঁর হাস্যকর মনে হয়। আসলে পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত চরিত্রটি ওঁর জীবনে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ।

অথচ জীবনের কাছে মানুষের যা কাম্য— সম্মান, খ্যাতি ও অর্থ—তা প্রভূত পরিমানেই ওঁর করায়ত্ত—বংশের সফিস্টিকেটেড সোসাইটিতে ওঁর অবারিত দ্বার— তবু জীবনে বৈরাগ্য আসছে কেন? মাঝে মাঝে ভাবেন অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে বিধ্বস্ত জীবনকে আবার নূতন করে গড়ে তুলবেন— কিন্তু তা ও ত হয় না। বিদেশে, ইদানিং দেশে কটি-উদ্ঘাটনি পোষাক পরিহিতা, পীনোন্নতা, বিলোল, মদিরাক্ষী, উগ্রপ্রসাধন সম্পৃক্তা, নব-যৌবনোদ্ভিন্না নানা বয়সের, নানা জাতির মেয়ের সান্নিধ্যে এসেছেন কিন্তু প্রতিবারই তিনি বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। দীপার উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়েই তিনি দেশত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু যত দিন কেটেছে স্পষ্ট অনুভব করেছেন দীপা এখন ও ওঁর সমগ্র সত্তা সম্রাজ্ঞীর মত জুড়ে আছে। তিনি এখন ও তাঁকে গভীর ভাবে ভালবাসেন। নূতন করে অন্য কোন মেয়ের ভালোবাসার জালে জড়ানো আর সম্ভব নয়। অদৃষ্টের এ ও আর এক পরিহাস বই কি? নারী যদি সুধাসমুদ্র তবে তার জীবন-পাত্র উছলিয়া শুধু গরল উঠল কেন? তিনি যে সমাজ ও পরিবার সম্ভূত সেখানে এসব নোংরা কাণ্ড ভাবাই যায় না— সেখানে এ শুধু লজ্জার ব্যাপারই নয়— মানুষগুলো, এমন কি পরিবার পর্যন্ত চিহ্নিত হয়ে যায়— আর ভাগ্যচক্রে ওঁর জীবনে তাই ঘটল।

গেটহাউজের উপর দিয়ে একটা পাচা দম্-দ্-দ্ শব্দ করে উড়ে গেল। জোরে নিশ্বাস ফেলে বাসুসাহেব বাস্তবে ফিরে এলেন। কাপে হাত দিয়ে অনুভব করলেন কফি একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা। চুরুট ও নিভন্ত। লাইটারে পুনঃ চুরুট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে ওঁর চুয়াল্লিশ বছরের প্রসারিত জীবনে দৃষ্টিপাত করলেন।

নাগরিক জীবনের কুটিলতা, জটিলতা, সঙ্কীর্ণতা থেকে দূরে মফঃস্বল সহরে ডাকাত, প্রকৃতির প্রশান্ত, উদার আবহাওয়ায় গৌর স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে উনি বর্দ্ধিত হয়েছেন। পরিবারের প্রথম আদুরে সন্তান। মেধাবী বলে বাবার বিশেষ দৃষ্টি ছিল ওঁর ওপর—নিজের জীবনের অপূর্ণ আশা ছেলের জীবনে স্ফুরিত করতে চেয়েছেন। এখন ও একান্তে কান পাতলে উনি শুনতে পান বাবা যেন বলছেন: মন দিয়ে পড়ো বাবা। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। চোখ বুজলে যেন দেখতে পান বাবা ওঁর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে। গায়ে হাত বুলোচ্ছেন। সেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের দীর্ঘ অথচ সুঠাম চেহারা এক মাথা ঘন মিশমিশে কালো সুবিন্যস্ত চুল: বাবু! বাবু!! তোর হয়েছে, ওঠো। পড়তে বসো। বাবার ডাকে ঘুম খানিকটা পাতলা হয়েছে বটে, কিন্তু চোখ খুলতে কি কষ্ট। বাবা ওদিকে অবিরাম ডেকে চলেছেন: বড় ঘুমকাতুরে ছেলে তুমি। বাবু! বাবু!!

তারপর সেই কাণ্ড। তখন তিনি বয়সে বেড়েছেন। কিন্তু বাবার কাছে সে সময়ে ও শিশু। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে মামা বাড়ী আসছেন। বাবার সঙ্গে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ ট্রেনে— তারপর ওঁকে সীমারে বসিয়ে বাবা নেমে গেছেন— আকাশ মেঘলা— সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। শেষ ঘণ্টা বাজলে একে একে সিঁড়িগুলো গুটিয়ে নেবার পর দুপুর একটায় সীমার ছাড়ল এবং ধীরে ধীরে স্পীড নিয়ে শীতলক্ষার মাঝখানে এসে পৌছল— এখন ও স্পষ্ট মনে পড়ে বাবা জেটিতে দাঁড়িয়ে, ওঁর দিকে অপলকে তাকিয়ে, হাওয়ার তোড়ে বৃষ্টির ঝাপটায় আপাদ মস্তক ভিজে যাচ্ছে— খেয়াল নেই। বাবার বড় ইচ্ছা ছিল তাঁর বাবু বড় হবে।

তা বড় উনি হয়েছেন, অনেক বড়, সম্ভবতঃ আশাতিরিক্ত, কিন্তু কি নিদারুণ মূল্যে আর কত যন্ত্রণা সয়ে।

ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং সবিশেষ

ভূতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তখন তিনি বিদেশে আর ও উচ্চশিক্ষা নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন—এমনি সময় দুটি অঘটন।

প্রথমে বিয়ে—দীপা এলো। তাৎক্ষনিক তিনি মুগ্ধ হলেন। দীপার শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রত্যাশার দিক থেকে আসমান-জমিন ফারাক। সামান্য কয়েকদিন ক্ষুণ্ণ মনে বসে থেকে আবার বিগুণ উৎসাহে তিনি প্রস্তুত হলেন। সব কিছু পাকা, টেক অফ করার দিনক্ষণ ও সুস্থির, এমনি সময়ে দ্বিতীয় অঘটন। আর এই অঘটন কালো কালির পোঁচড়ায় ওর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একেবারে একাকার করে দিল। তিনি বাবাকে হারালেন। ছোট দু'ভাই অরুণ আর অশোক তখন যথাক্রমে মেডিকেল কলেজে আর খড়্গপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। তিনি ছোট দুইবোন জলি আর মলি ও মাকে চাকা থেকে নিয়ে এসে কলকাতার নূতন সংসার পড়লেন। বাবার সামান্য রেখে যাওয়া অর্থ ও নিজের রোজগার— জীবন সংগ্রাম কাকে বলে অরবিন্দ তা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। কিন্তু সে দিন ও কাটল— এমনি করে ছয়টি বৎসর। অরুণ ও অশোক পড়া সাঙ্গ করে চাকুরীতে ঢুকল, জলি-মলির ও বিয়ে হয়ে গেল।

আর এই ছ'বছরে দীপা পশ্চাৎপট থেকে একেবারে পাদপীঠে এসে দাঁড়াল। শুধু আসাই নয়, বলা যায় সগৌরবে ঘোষণা। তিনি প্রথমে বিস্মিত ও পরে কৌতূহলী হলেন। সচ্ছল বাঙ্গালী ঘরের সাদামাটা ছেলে মেয়েই যেন— কিন্তু একে দেখে হন হন করে চলে যাওয়া যায় না, উপেক্ষা ত নয়ই। বাবার বিচক্ষণ দৃষ্টির প্রতি অরবিন্দ আবার সশ্রদ্ধ হলেন। বর্ণ উজ্জল গৌর—কিন্তু তা ওর প্রকৃত রূপের ভগ্নাংশ মাত্র। ওর বড় বড় কালো দুটি লীলল বাদর চোখে আর রাশি রাশি চিকন কালো চুলে যেন পদ্মার ঢেউ মাখানো।

পাবক আর সবিষ, ধনুণ আর প্রস্ফুটিত কুসুম— দুজনেই তখন এক অপরকে আবিষ্কারের নেশায় তৎপর।

তা একদিন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন : তোমায় দেখে ত ভাল ছাত্রীই মনে হয়, আই-এ তে ভাল ফলও করেছিলে। বি-এ পড়লে না কেন ?

স্তব্ধ হয়েছিলাম। দীপার সংক্ষিপ্ত জবাব : কিন্তু শ্বশুর মশাই যে মানা করলেন।

শ্বশুর মশাই ? মানে আমার বাবা ?

হ্যাঁ। কেন তুমি জানো না : দীপা অরবিন্দের মুখে কি যেন জরিপ করল : সে কবে থেকেই ত আমাদের বিয়ে স্থির। শ্বশুর মশাই আর বাবা ছেলেবেলার বন্ধু। শ্বশুর মশাই বাবাকে বলেছিলেন যেশী লেখাপড়া জানা মেয়ে ওঁর পছন্দ নয়। বেশী লেখাপড়া জানা মানে ত দিদী হওয়া। ছেলে ভোজনবিলাসী। বরং রান্না, ঘর কন্না শিখলে কাজে দেবে।

অরবিন্দ স্তব্ধ। বাবা এতদূর ভেবেছেন ওর জন্য ? উনি এখন কোথায় ? ঐ যে দূরে আকাশে একরাশ তারা জ্বল জ্বল করছে উনি কি তাদের ভীড়ে মিশে আছেন ? তিনি কি দেখছেন ওঁর ভোজনবিলাসী পুত্রের আজ কি নিদারুণ দুর্গতি।

সহসা একটা তীক্ষ্ণ হুইসল্ বেজে উঠল। সম্ভবতঃ কোন ছুট মিলের। ঝিঁঝিঁর আর নানা কীটপতঙ্গের সমবেত কণ্ঠসঙ্গীতে ভূলোক দ্যুলোক তখন মসগুল। ঘড়ির রেডিয়াম ডায়েলের দিকে নজর গেল। রাত্রি বারটা! আর নয়। এবারে নিদ্রা। আজ অনেক ছোটাছুটি হয়েছে, কালও ঠাসা কর্মসূচী— দিল্লীর পেপার গুলো আরও ভাল করে দেখা প্রয়োজন। ইজিচেয়ার থেকে উঠে বসতে গেলেন।

একটু দাঁড়াও ত। অকস্মাৎ দীপার পথরোধ। সকালে বাপের বাড়ী গিয়েছিল, এখন ফিরল।

কি হলো ?

এত কৈফিয়ৎ আমার ভাল লাগে না। দীপা অসহিষ্ণু কিন্তু ইতিমধ্যে দ্রুতহস্তে একটি জবা ফুল অরবিন্দের মাথায়, গালে, গায় বুলিয়ে কানে গুঁজে দিয়েছে : আমাদের বাড়ীর কাছে সুশীলবাবুর কালী-মন্দির। মা আজ ভোরে পুজো দিয়েছিলেন।

শুভ।

জানো সুশীলবাবু কি বলেছেন ?

না ত।

সুশীলবাবু আসনে বসে কারো কথা চিন্তা করলে তার ভবিষ্যৎ দেখতে পান। দীপা গাঢ় স্বরে বলল : সুশীলবাবু যাকে বলেছেন আপনার জামাই দিগ্বিজয়ী পুরুষ হবে। খুব নাম ডাক হবে ওঁর।

তাই ? সম্ভবতঃ অরবিন্দের কণ্ঠস্বরে হাল্কা সুর ধ্বনিত হয়ে থাকবে।

সব ব্যাপারে তোমার ঠাট্টা। দীপার মুখ ভার— দৃশ্যতঃ আহত। অরবিন্দ একেবারে চুপ। তা ব্যাপারটা যে মোটেই ঠাট্টার নয় কয়েকদিনের মধ্যে তা সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হল।

টুর থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। কত রাত্রি কে জানে ? হঠাৎ একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল— মুখের উপর কিসের একটা তপ্ত হাওয়া পড়ছে যেন ? জেগে উঠে অবাক। ঘরে ছোট্ট নীল নাইট ল্যাম্পটি জ্বলছে। কে জ্বালালো ? ওটা ত যথারীতি নিভিয়েই শুয়েছিলেন ! তবে ? ধড়ফড় করে উঠতে গিয়ে বাধা। দীপা হাত দিয়ে চেপে ওকে শুইয়ে দিল। হতচকিত হয়ে দেখলেন সে হাওয়া আসছে দীপার তপ্ত নিশ্বাস থেকে। দীপার আরক্ত মুখ প্রায় তার মুখ ছুঁয়ে। আয়ত চোখের দৃষ্টি তার কালো চোখের তারায় স্থির, নাসিকা স্ফুরিত, চিবুকে স্বেদবিন্দু, অধর বেতসপত্রের মত থর থর করে কাঁপছে। এবারে অরবিন্দ আর এক আশঙ্কায় কণ্টকিত।

কি হলো।

তোমায় দেখছিলাম !

আমায় ? মা-নে আ-মা-কে ? অরবিন্দের চোখের ঘুম অন্ধকারে উধাও।

হ্যাঁ। বাবা, মা, দাদা-সকলেরই এক কথা, তোমায় দেখলে নাকি বোঝা যায় তুমি অনেক বড় হবে। তাই দেখছিলাম, আমি বুঝি কিনা, দীপা পাগল হল নাকি ?… মনের কথা চেপে মুখে বললেন।

এত রাত্রে ! তা বোঝা হলো ?

জবাবে দীপা সমর্পণের বন্যায় তার প্রিয় পুরুষের অস্তিত্ব নিঃশেষে নিজের মধ্যে টেনে নেয় আর তিনি দুটো শক্ত সবল বাহুর নিষ্পেষনে ওকে গুড়িয়ে দিয়ে মুখে মুখ ঘষে অবরুদ্ধ স্বরে শুধু বলেন : দীপা ! আমার দীপা !!

তারপর প্রবহমান সময় কিছুক্ষণ নিশ্চল…কৌতূহলী প্রকৃতি নিশ্চুপ। অবশেষে ক্লান্ত অরবিন্দ কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন জানেন না। পরদিন আর অফিসে যাওয়া হল না— দীপা যেতে দিলে না।

তাহলে দীপার কি হলো ? সে কোথায় গেল ? অরবিন্দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অন্য কারো সঙ্গে কি ঘর বেঁধেছে ? এও ত যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় না। ওঁর অফিসের বন্ধু অথবা সহপাঠী কখনও কখনও ওদের বাড়ীতে এসেছে …একাধিকবার এসেছে—উনি ও সস্ত্রীক ওদের বাড়ী গিয়েছেন— দীপা সবর্ব সময়ে ভদ্র-রুচি সম্মত ব্যবহার করেছে বটে, কিন্তু সবর্বক্ষেত্রেই শীতল দূরত্ব রক্ষা করে— কারো সঙ্গে কদাচ অন্তরঙ্গ হয়নি—অন্তরঙ্গ হওয়া ওর পক্ষে সম্ভবই নয়। এ কাঠিণ্য ওর চেষ্টাকৃত নয়, স্বাভাবজাত… পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে কোনারকের ভাস্কর্যেও ওর একই মানসিকতা লক্ষ্য করেছেন। কত দূর দূর দেশ থেকে শিল্পরসিকগণ ঐ ভাস্কর্য দেখতে আসে-দীপা একবার তাকিয়ে শিউরে উঠেছে আর ওকে প্রায় টেনে, হিঁচড়ে নিয়ে হোটেলে ফিরে এসেছে। এত সুন্দর শিল্প নিদর্শন ওঁর ভাল করে দেখাই হলো না। অথচ এই দীপা যখন ওঁর কাছে এসেছে তখন ওর একেবারে অন্য চেহারা— তখন তার যেন একটি মাত্র পরিচয়— সে রমণী। স্ত্রী-চরিত্র সত্যি বিচিত্র। স্বাধিকার-প্রমত্ত তিনি সময়ে অসময়ে ক্ষুধার্ত নিষ্ঠুর হার্শাদ দস্যুর মত আচরণ করেছেন, কিন্তু দীপা বাধা দেয়া ত দূরের কথা, বরং পরম কৌতুকে, মৃদু হাস্যে উষ্ণ উদার সস্নেহ প্রশ্রয়ে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মুখে অবিচল বেলাভূমির মত, অসঙ্কোচে, দ্বিধাহীন সমর্পণে প্রেমে ও প্রীতিতে ওকে অভিষিক্ত ও উদ্বেল করেছে।

কিন্তু দীপা যে একটা বাড়ী চেয়েছিল—বাহুল্য বর্জিত ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ী। সে নিজের হাতে সাজাবে, কার ও কোন কথা চলবে না। ঐ বাড়ীর সীমানা ঘিরে থাকবে কুপসি কুপসি গাছ—সামনে সবুজ লন—যাকে যাকে কেয়ারি করা ফুলের বাগান—খোকন সেখানে প্রজাপতি ধরবে, টালমাটাল হয়ে খেলা করবে। অরবিন্দ অফিস থেকে ফিরে এলে ছায়া ছায়া অন্ধকারে ওরা লনে বসে চা খাবে গল্প করবে। বম্বের পাশি হিলে ওর বর্তমান আবাসস্থল দীপার স্বপ্নেরই অনুরূপ।

কিন্তু কোথায় দীপা আর কোথায় তার খোকন! তার অভিশপ্ত জীবন নিকুঞ্জ কোন বিশুর কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠল না আর দীপা গেল হারিয়ে।

তাহলে দীপার সবটাই কি অভিনয়?

বাসুসাহেব সেই মর্মান্তিক ঘটনার বিশ্লেষণে তৎপর হলেন। এ কথা ঠিক দীপা ওর নিজের ঘর সম্বন্ধে বিশেষ স্পর্শকাতর ছিল, তার সঙ্গে অনেকটা অর্থহীন শুচিবাই ও যুক্ত ছিল—সে অরবিন্দকে ও বাইরের জুতো পরে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। যে কোন লোকেরপক্ষে ওর বিছানায় বসা ত অমার্জনীয় অপরাধ। নিজের বাপের বাড়ীর লোকদের ক্ষেত্রে ও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। না হয় মেনে নেয়া গেল, অরুণ ওর মেডিকেল কলেজের স্যুটবুটউ বন্ধুদের বৌদির ঘরে বসিয়ে অন্যায় কাজ করেছে। আর স্নান সেরে বাথরুম থেকে অবিন্যস্ত বেশবাসে ঘরে এসে কতগুলো অপরিচিত লোকের সুমুখে পড়ে দীপা অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও বিরক্ত বোধ করেছে তা ও নয় বোঝা গেল। কিন্তু তা বলে এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাড়ীতে তুফান তুলে চিরদিনের মত চলে যাওয়া, এ ভাবা যায়? অন্ততঃ উনি পারেন নি বরং ভেবেছেন মেয়েলি রাগ, দুদিন বাদে ও নিজে থেকেই ফিরে আসবে। তারপর একদিন দুদিন করে তিনমাস কেটেছে, দীপা ফেরেনি। সেদিন সন্ধ্যায় কর্মস্থল থেকে ফিরে চুপচাপ ঘরে একেলা বসে। মা এলেন।

বাবু, বৌমা ত এল না। কতদিন হয়ে গেল। এবারে ওকে নিয়ে আয়।

অরবিন্দ বিস্মিত চোখে মার দিকে তাকালেন। বাবার মৃত্যুর পর মা একেবারে গুটিয়ে গেছেন—কোন ব্যাপারেই থাকেন না। আজ হঠাৎ একথা কেন? খুব নরম গলায়, খুব আস্তে অরবিন্দ জবাব দিলেন: আমি ত অন্যায় করিনি মা।

সব অন্যায় কি আর চোখে দেখা যায় না বলে বোঝানো যায়। মেয়েদের অভিমান হলে স্বামীকেই যে তা ভাঙাতে হয় বাবা। বিয়ের পর মেয়েদের আর থাকে কি!

তা উনি যতবার ভেবেছেন যাবেন কিনা ততই রাগ হয়েছে, আর দিনে দিনে সে রাগ বেড়েছে। শেষ অবধি স্থির করলেন উনি যাবেন না। সামান্য একটা আই-এ পড়া মেয়ের এ আস্পর্দ্ধা অসহ্য। আর ঠিক তারপরেই ঘটল বিস্ফোরণ। এক বন্ধুর বিবাহ-বার্ষিকীর উৎসবে গিয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ্য করলেন দীপার কাণ্ড জানতে কারো বাকী নেই। জিহ্বা দিয়ে চুক চুক শব্দ করে অনেকে সমবেদনা জানালেন। কেউ কেউ আবার পুনর্বিবাহের পরামর্শ ও দিলেন আর এই নিয়ে দুটি পক্ষ হয়ে তাদের মধ্যে তুমুল বাক্-বিতণ্ডা বেধে গেল – তিনি সর্বক্ষণ নির্বাক, কাঠ হয়ে বসেছিলেন এবং তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন আর কলকাতা নয়, পালাতে হবে। শুধু কলকাতা থেকেই নয়, একেবারে এদেশ থেকে। ফিরবেন না আর কখন ও। অমৃত ভাণ্ড বলে যা মুখের কাছে তুলেছিলেন তাই যখন বিষকুম্ভে পরিণত হল তখন এখানে থেকে আর লাভ কি!

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার চেতনা

সন্তোষ কুমার অধিকারী

জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজমের বোধ জাগে ধর্ম, ভাষা, অর্থনৈতিক ঐক্য এবং রাষ্ট্রীয় সংহতিকে অবলম্বন ক'রে। মানুষ তার জাতীয়তার বোধে যখন উদ্দীপ্ত হয়, তখন তার চেতনা জাতীয় সংস্কৃতি ও স্বাদেশিকতার অনুরাগে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার বোধ কোনদিন যেমন পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়নি, উনবিংশ শতাব্দীর আগে ভারতবাসীর মনে স্বজাত্যবোধ ও স্বদেশ প্রেমও তেমনি কোনদিনই জাগ্রত হয়নি।

বিদেশীয় ভারতবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতরাই যে আমাদের চেতনাকে উন্মোচিত করেছেন, এ'কথা স্বীকার করতে বাধা নেই। রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙালী যিনি বৈদিক ভারতকে তার স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিদেশীয় অনুকরণের বিরুদ্ধে স্বদেশীয় পোষাকের মর্যাদাকে তুলে ধরলেন। বিদ্যাসাগরের স্বাদেশিকতা অনুপ্রাণিত করেছিল রাজনারায়ণ বসুকে। তাঁর Prospectus of a Society for the Promotion of national feeling among the educated natives of Bengal (1986) আহ্বান জানালো বাঙালী সমাজকে আত্মসচেতন হ'তে।

রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণাতেই ১৮৬৭ সালে গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র কলকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া ভিলায় প্রথম হিন্দুমেলার উদ্বোধন করেন। হিন্দুমেলাকে জাতীয়তা মেলা নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এই মেলাতেই জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর প্রথম প্রতিষ্ঠা।

১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রর প্রচেষ্টায় জাতীয় মেলার বা হিন্দুমেলা উদ্বোধনের সময় থেকেই যে বাঙালী চেতনায় জাতীয়তা বোধের জাগরণ ঘটল, একথা বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গেছেন। কিন্তু বাঙালীর কাব্য ও সাহিত্যে স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মবোধের সুর তারও আগে অনেক থেকেই ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর গানের একটি পংক্তিতে যার সূচনা—

"বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা"

মধুসূদনের মধ্যে তার পরিণতি।

এর আগে স্বদেশ বলে কোন মহিমাময় ভৌগলিক মমতার চেতনাও যেমন আমাদের ছিলনা, আপন দেশের জন্য রক্তের মধ্যে বেদনার কোন স্পন্দনও আমরা অনুভব করিনি। ভারতবিদ্যাবিদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই এই এই চেতনাকে জাগ্রত করেছেন, একথা অস্বীকার না করাই ভাল।

হিন্দুকলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও যাঁর দেহে পর্তুগীজ রক্ত এবং চিন্তায় ইউরোপের সংস্কৃতি তাঁর কবিতায় যে প্রথম দেশাত্মবোধের সুর শোনা গেল, এও এক বিচিত্র ঘটনা। ডিরোজিওর মধ্যে ভারতচেতনা ছিলনা, অথচ ভারতবর্ষকে তাঁর কাব্যে যে ভাবে বেদনা ও প্রেমের মাধুর্যে অভিষেক করেছেন, তাতে আশ্চর্য হ'তে হয়। উল্লেখ করতে পারি The Harp of India কবিতাটির—

Why hang'st thou lovely on you
withered bough ?
must thou
there remain ?
Thy music once was sweet
who hears it now ?
Why doth thee breeze sigh over thee
in vain ?
Silence hath bound the with her
fatal chain.
Neglected, mute and desolate art thou

Like ruined monument on desert plain.

বিস্মৃত অতীতের জন্য যেমন বেদনা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যও তেমনি প্রত্যাশা Your glories are budding they shall bloom

Patriotism বা স্বদেশপ্রেমের এই চেতনা ডিরোজিও যে ইংরাজী সাহিত্য থেকেই পেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮২১ সালে গ্রীস তুর্কীর সঙ্গে লড়াই করে তার স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করে। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর মনে নিশ্চয়ই তারও রেখাপাত ঘটেছে। ১৮৪৩তে শুরু হয়েছে ইতালীর মুক্তি সংগ্রাম। স্বদেশের মুক্তির জন্য মাৎসিনি, গ্যারীবল্ডী ও কাভুর সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতবাসীকে যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তার পরিচয় ইতিহাসেই আছে। কিন্তু পরাধীনতার বেদনা বাঙালী কবিকে যে কতখানি উদ্বেল করেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল ১৮৫৮ সালে লেখা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান থেকে—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়?

এ ক্রন্দন রাজপুত জীবনের, না ইংরাজপদানত বাঙালী হৃদয়ের?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা করলেন ১৮৬১ তে। বিভীষণকে তিনি দেশদ্রোহীরূপেই চিত্রিত করেছেন। মেঘনাদের করুণ ভর্ৎসনায় বাঙালী আত্মার মর্মবেদনা ই ধ্বনিত

কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি: শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, স্বজন নির্গুণ স্বজন শ্রেয়:, পর: পর: সদা।

এই উক্তির মধ্যে জাতীয়তার চেতনা একটি সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে। পরবর্তী কালে নবীন চন্দ্র সেনের কাব্যে পেলাম –

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত—
এই শৈল প্রাচীরের যথা পুণ্যভূমে—
এক মহারাজ্য প্রভু, হবনা স্থাপিত
এক ধর্ম, একজাতি, এক সিংহাসন

১৮৬৮ সালে হিন্দু মেলায় সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের যে গানটি গাওয়া হয় দেশাত্মবোধ ও ভারতীয় জাতীয়তার উদ্বোধন ঘটল তাতে—

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

১৮৭০ সালে শোনা গেল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সঙ্গীত—

বাজ রে বাজ শিঙ্গা বাজ এই রবে—
সবাই স্বাধীন এ' বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

নবীনচন্দ্র ভারতবর্ষকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করেছিলেন

হে মাতঃ ভারতভূমি! সৃজিলা বিধাতা
মহারাজ্য উপযোগী করিয়া তোমায়।
তুষারকিরীট শুভ্র বিরাট মূরতি
অভ্রভেদী হিমাচল বসিয়া শিয়রে

অবশ্য নবীননচন্দ্রের রৈবতক রচনার অনেক আগেই বঙ্কিমের কমলাকান্ত স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে—

যা যা ছিলেন,
যা যা হইয়াছেন, এবং
যা যা হইবেন।

মধুসূদন যদি জাতীয়তাবোধের প্রথম উদ্গাতা হন, তাহলে স্বদেশকে জননীরূপে কল্পনা করার মন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। স্বদেশ প্রেম ও দেশভক্তি তিনি বাঙালীর অন্তরে অন্তরে গেঁথে দিলেন। তিনি বললেন—দেশ মানে মাঠ,বন, নদী সম্পৃক্ত একটি

ভৌগলিক সত্তা মাত্র নয়, দেশই আমাদের মা—দশ-প্রহরণধারিণী মা। আনন্দমঠের ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বললেন—আমরা অন্য মা মানিনা, আমরা বলি জন্মভূমিই মা। দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে এলেন সত্যানন্দ তাঁর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কিন্তু বীর্যবান সন্তানদলকে নিয়ে। তাদের কণ্ঠে শোনা গেল বন্দেমাতরম্ গান।

ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী—
কমলা কমলদল বিহারিণী—
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।

বন্দেমাতরম্ ১৮৭৬ গানে দেশকে যেমন জননীরূপে কল্পনা করা হয়েছে, আনন্দমঠ উপন্যাসে ১৮৮২ তেমনি দেশ ও দশপ্রহরণ ধারিণী দুর্গাকে অভিন্ন বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এই যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার চেতনা—অনেকে একে হিন্দু জাতীয়তা ব'লে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। কারণ হিন্দু সংস্কৃতিও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করেই এই চেতনার তৎকালিক ব্যাপ্তি।

বঙ্কিমের পথ ধরেই এগিয়ে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—ভারতের মাটি আমার স্বর্গ বললেন···আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের একমাত্র উপাস্য-দেবতা দেশজননী, আমাদের এই ভারতবর্ষ। শুধু দেশ নয়, দেশের অধিবাসী সমগ্র ভারতবাসীই তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল—ভুলিওনা, নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, মুচি—মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী। দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

জাতির অন্তরে স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ এবং নির্ভীকতাও তিনি সৃষ্টি করলেন। উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে ডেকে বললেন—

হায় ভারত, তুমি কি কেবল এই পাথের সম্বল করিয়াই সভ্যতা ও মহত্বের উচ্চশিখরে আরোহন করিতে চাও? যে স্বাধীনতা কেবল সাহসী ও বীরেরাই আয়ত্ব করিতে পারে, সেই স্বাধীনতা কি তুমি তোমার লজ্জাকর ভীরুতা দ্বারা লাভ করিতে পারিবে?

পরবর্তী কালে জাতীয়তার বোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী যুবসমাজে বিপ্লবাত্মক কাজের যে জোয়ার বয়ে গেল, এবং দেশের জন্য আত্মদানের যে প্রেরণা দেখা দিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দই যে তার উৎস—এ কথা সিডিশন কমিটির রিপোর্টেই উল্লিখিত হয়েছে। রিপোর্টের ২৪ নং পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে—He preached that Vedantism was the future religion of the world and that although India was subjected to a foreign power, she must be careful to preserve the faith of mankind. She must seek freedom by the aid of the Mother of Strength.

রিপোর্টের পরবর্তী অংশে বলা হ'য়েছে যে সন্ত্রাসবাদী যুবকেরা বিবেকানন্দের এই উক্তিকে বিকৃত করে তাদের প্রচারের কাজে লাগিয়েছে। রিপোর্টে যাই বলা হোক্ স্বাধীনতার যে বেদনা জাতির অন্তরে গুমরে গুমরে উঠছিল, তাকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার চেতনায় রূপান্তরিত করেছিলেন বঙ্কিম—বিবেকানন্দ। বঙ্কিমের পথ ধরেই অরবিন্দ দেশ জননী এবং শক্তির উৎসরূপিনী জননী ভবানীকে এক ও অভিন্ন কল্পনা করলেন। বাংলায় বিপ্লববাদের মূলে ছিলেন—একদিকে বিবেকানন্দশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা অন্যদিকে অরবিন্দ—যতীন্দ্রনাথ। তাঁর ভবানী মন্দির পুস্তিকায় জননীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অরবিন্দ নিজে লিখেছিলেন—"The infinite energy is Bhavani. She also is Durga She is our Mother and creatress of us all. In the present age the Mother is manifested as the Mother of strength".

কিন্তু বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রকেও উত্তীর্ণ হ'য়ে হঠাৎ ঘুমন্ত অগ্নিগিরির বুক বিদীর্ন করে বাঙালী ও ভারতবাসীর বুকের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের মন্ত্র বহন করে নিয়ে এল যে সঙ্গীত এবং যে ধ্বনি—তাহ'ল

বন্দেমাতরম্। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব বাঙালীর হৃদয়ে বিক্ষোভ ও বেদনার যে ভূমিকম্পন তুলেছিল তারই ফলে সমুদ্র মথিত হ'য়ে উঠে এল সেই অমৃতময় যে মন্ত্রকে সম্বল করে দেশ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ অতিক্রম করে পৌঁছোতে পেরেছে বিজয়ের দুর্গতোরণে।

উল্লেখ করা উচিত যে বাঙালীবিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন যেমন বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে সুর দিয়েছিলেন তেমনি রচনা করেছিলেন সেই স্বদেশী গানগুলি—যা শুধু সেদিন নয় দীর্ঘদিন পরে বাঙলাদেশ এর আত্মচেতনার পথে প্রেরণা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন গেয়েছিলেন—

ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।

বলেছিলেন

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মেলা, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের উদ্দীপক কাব্যসঙ্গীত, সত্যেন ঠাকুরের হোক্ ভারতের জয় এবং বঙ্কিমের আনন্দমঠ বাঙালীখানসে জাতীয়তার যে চেতনা এবং দেশাত্মবোধের যে বেদনা সঞ্চারিত করেছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগ রোধের আন্দোলনে তা সমগ্র জাতির চিত্তকে মহাদেবের শিখামুক্ত ভাগিরথীর মতো এক দুর্বার স্রোতের আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পরবর্তী কালে রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের দেশাত্মবোধক যে কাব্য সঙ্গীত জাতির চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছে, এমনকি ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বন্ধনমুক্তি যে গৌরব ও আত্মশক্তিতে দেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার প্রস্তুতি যে ১৮৬৭ সালের জাতীয় মেলা থেকেই শুরু হ'য়েছে তাতে কোন ভুল নেই।*

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে প্রদত্ত বক্তৃতামালার অংশবিশেষ।

নরনারায়ণ আশ্রম রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

১।	ব্রহ্মসূত্র তিনখণ্ডে	২৬·০০
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০
৩।	শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৫·০০
৪।	ঈশোপনিষদ্	৩·০০
৫।	কেনোপনিষদ্	২·০০
৬।	কঠোপনিষদ্	৫·০০
৭।	প্রশ্নোপনিষদ্	২·০০
৮।	ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	২·০০
৯।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	৩·০০
১০।	তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৪·০০

৺প্রতিভা রায় রচিত

নারীপ্রগতির জন্মকথা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

রেণু মিত্র রচিত

সমন্বয় মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	২·০০
শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৫·০০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

রবীন্দ্র হৃদয়	৫·০০
প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম : বাগুইআটি / পো: অশ্বিনীনগর
কলিকাতা-৫৯ / ২৪ পরগণা, ফোন : ৫৭-২৫৪০

প্রাপ্তিস্থান
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
২৫/২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ সাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চিৎকার ক'রে উঠলো লক্ষ্মীদেবী। আর সেই শব্দে একটি ভীত সন্ত্রস্ত সাপ পাশের কোপ কাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লক্ষ্মীদেবীর চিৎকারে দরজা খুলে বাইরে এলেন শচীদেবী।

ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'বৌমা, কি হয়েছে বৌমা!

লক্ষ্মীদেবীর মুখ ম্লান। একটি দুরন্ত যন্ত্রণা যেন সে চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

শচীদেবীর প্রশ্নের উত্তরে বললে, কী যেন একটা আমায় কামড়ে গেল মা। ব্যথা, বড় ব্যথা। সেই ব্যথা পা বেয়ে উপরের দিকে উঠছে। আমি স্থির থাকতে পারছিনে।

শচীদেবী বুঝি সব বুঝলেন। ছোঁড়ে এসে লক্ষ্মীকে ধরলেন।

দু'জনের চেঁচামেচিতে পাড়ার অনেকে এসে সেখানে জড়ো হয়েছিল। তাদেরই একজন বললে, সর্প দংশন, নির্ঘাত সর্প দংশন। ওরে দড়ি নিয়ে আয়। কষে বাঁধ লাগা লক্ষ্মীদেবীর পায়ে। ওঝার বাড়ি খবর দে।

কিন্তু না। কারো কোন চেষ্টাই সফল হলনা। লক্ষ্মী চোখ বুজল। জ্ঞান হারালো। সে জ্ঞান আর ফিরে এলনা।

মায়ের মুখে সবই শুনল নিমাই। শুনে শুধু একবার তার বুকে ঝড় উঠল। চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তারপরই সে অন্য মানুষ।

চোখে তার উদাস দৃষ্টি।

'মা!

শচীদেবী কাঁদছিলেন। তাঁকে প্রবোধ দিয়ে নিমাই বলল, মা, চোখের জল মোছো মা। সময় হলে একদিন সবাইকেই যেতে হবে। কেউ তো আমরা চিরকালের জন্যে এ পৃথিবীতে আসিনি? তা হ'লে লক্ষ্মীর বিরহে আমরা কাঁদবো কেন? আমাদের চোখের জলে তার মহাযাত্রার পথই শুধু পিছল হবে। কোনদিনই আর সে ফিরে আসবে না।

ছেলের কথায় আঁচল দিয়ে বারবার চোখের জল মোছার চেষ্টা করলেন শচীদেবী। কিন্তু না, চোখের জল বাধা মানছে না। ঝলকে ঝলকে তা গড়িয়ে পড়ছে।

(বাইশ)

কী যেন হয়েছে নিমাইয়ের। পূর্ববঙ্গে যেয়ে যে ছিল ধীর-স্থির দার্শনিক, নবদ্বীপের মাটিতে পা দিয়েই তার স্বভাব যেন পুরোপুরি বদলে গেছে। নিমাই এখন চঞ্চল। ঝঞ্ঝাপ্রিয়। লক্ষ্মীর বিয়োগ-ব্যথা কি তার মনে ঘা দিতে পারেনি? এ নিয়ে অনেক কথা হয় পাড়া-পড়শী, স্বজন-পরিজনের মধ্যে!

কেউ বলে নিমাই অন্য ধাতের মানুষ।

কেউ বা আবার বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বলে, আরে রেখে দাও তোমার ধাত-ফাত। মত হলেও মানুষ তো। আরে যাকে নিয়ে ঘর করলি, সে যখন চলে গেল, তখন তোর মনে একটুও লাগলে না গা? চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জলও পড়ল না?

কাছেই ছিল এক প্রবীণ ব্যক্তি। বয়সের ভারে দেহটি বেঁকে গেছে। মাথার মাঝখানটায় মস্ত একটা টাক। তার এ-পাশে ও-পাশে দু'চার গাছি যা চুল আছে, তা-ও শুকনো পাটের মত অশুছালো। সাদা। সে-ই এখন তার ফাঁকা টাকে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, কথা খানা কিন্তু তুমি ঠিক বললে না বাচস্পতি।

'মানে?' বাচস্পতি একেবারে খেঁকিয়ে উঠলো প্রতিবেশী সেই বৃদ্ধের কথায়।

বলল, তুমি কি বলতে চাও? আমার কথা ঠিক নয়? ডাকোনা নবদ্বীপের আর দশজনকে। শোনো তারা কি বলে। ডাখো তারা এসে এই দিবাকর বাচস্পতির কথায় সায় দিয়ে যায় কিনা?

বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে উত্তেজনা নেই। দু'টি চোখ তার আকাশের মতই উদাস। হাত দিয়ে সেই চোখ দু'টি মুছতে মুছতে সে বলল, এতে, লোক ডাকাডাকির আছে কি? মানুষের মত হাত পা থাকলেই কি মানুষ হয় রে? বুদ্ধিশুদ্ধি তাদের ক'জনের আছে? লক্ষ্মী-বিরহে আমাদের নিমাই যে কতোটা কাতর হ'য়ে পড়েছে, তা তারা বুঝবে কি করে?

বৃদ্ধের কথায় এবার হেসে ফেলল বাচস্পতি। বলল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিও সব গেছে বিশ্বার্ণব। নইলে ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে যে চব্বিশ ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে ফিরছে, তাকে বলছো তুমি দুঃখ-কাতর?

'হ্যাঁ বলছি। বাথাটা বড় বলেই নিমাই তা করছে। তীর বেঁধা পাখী দেখেছো? দেখেছো, যন্ত্রণায় তার ছটফটানি? নিমাইয়েরও ঠিক সেই অবস্থা। সে ঠিক হয়ে বসতে পারছে না। স্থীরচিত্তে কিছু ভাবতে পারছে না। অন্তরের সেই বড় ব্যথাটা তাকে সব সময় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। তাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারছে।

এবার চুপ করল বাচস্পতি। বিশ্বার্ণবের কথায় তার সব উত্তেজনা গলে জল।

বলল, তা তুমি মন্দ বলোনি বিশ্বার্ণব, সে দিকটাও একবার ভাবতে হবে বটে। আমরা তো কেউ সে দিকটি একবারও ভেবে দেখিনি। আমরা ভেবেছি, নিমাইয়ের ভেতর মানুষের মন নেই। ও একটা পাথর। পাষাণ।

কিন্তু ক'দিন চলবে ঘুরে বেড়িয়ে? রাত পোহালেই পয়সার প্রয়োজন। সে পয়সাটা আসবে কোত্থেকে? নিমাইকে তাই আবার টোলে বসতে হয়। ছাত্রপড়াতে হয়। ডুব দিতে হয় বিদ্যার অগাধ সমুদ্রে।

টোলে বসলেই সে আলাদা মানুষ। কোথায় তার সে চাঞ্চল্য! কোথায় সে বাচালতা। সব যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। পণ্ডিত নিমাই গুরুর গাম্ভীর্য নিয়ে টোলের ছাত্রদের বিদ্যা বিতরণ করছে। ব্যাকরণের জটিল সূত্র, দর্শনের কঠিন সমস্যার সমাধান করছে। তখন তাকে দেখে কে বলবে, এই নিমাই-ই কিছুক্ষণ আগে হাসি-তামাসার চল নামিয়ে এসেছে? তার চাপল্যে অস্থির হয়ে নবদ্বীপের অনেক বিদ্যার্থিগৃহই এগলি-সেগলি দিয়ে কেটে পড়েছে?

আসলে টোলে বসলেই নিমাইয়ের সব চাপল্যের অবসান। সেখানে সে মহাসাধক। বিদ্যার সাধক। সেখানে তার রূপটি ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো। সেখানে সে এক প্রাণ। এক মন। অন্য দিকে তার কোন খেয়ালই নেই।

(ক্রমশঃ)

কর্তাভজা ধর্ম সম্প্রদায় ও আউলে ফকির

তৃপ্তি ব্রহ্ম

চৈতন্যদেবের তিরোধান (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে)-এর পরে বাংলাদেশে চৈতন্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ বেশ কিছু নবা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে; যা বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত ও আদি বৈষ্ণবধর্ম হলেও আসলে পৃথক পৃথক গুণ ও ধর্ম ক্রিয়া সম্বলীয় লৌকিক ধর্ম সম্প্রদায় নবাকারে দেখা দিয়েছিল এবং এরাই ভিন্নতর নতুন খাতে প্রবাহিত হয়ে জনমানসে একটী বিশেষ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হল; তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য আজকের জনপ্রিয় কর্তাভজা সম্প্রদায়'।

কর্তা শব্দের অর্থ স্রষ্টা অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরই এখানে কর্তা, কর্তাকে ভজনা করাই হল কর্তাভজা'। তবে, এই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদকে ভগবানের অবতার ঘোষণা করায় তিনিই কর্তা হয়েছেন। "কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার তুমি আমার তোমায় সুখে চলি ফিরি তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নাই, দোহাই মহাপ্রভু" (কর্তাভজাদের দীক্ষামন্ত্র)। পরবর্তীকালে রামশরণ পাল হন কর্তাবাবা। তারপর থেকে যাঁরা বংশপরম্পরায় দীক্ষা দিয়ে আসছেন তাঁরা মহাশয় এবং শিষ্যরা 'বয়াতি' নামে অভিহিত।

এই কর্তাভজা আরও উল্লেখযোগ্য হওয়ার কারণ হল চৈতন্য অনুরূপ কোন এক আউলচাঁদ বা আউলে মহাপ্রভুর নামে এই কর্তাভজাসম্প্রদায় যাঁর আবির্ভাব ১৬৯৯। চৈতন্য পরবর্তী যুগে এই আউলচাঁদের আবির্ভাব ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্র ধরেই। কারণ, চৈতন্যদেবের ধর্মে শুধুমাত্র ভগবান আর ভক্ত এবং গোপী ভাব ও মঞ্জরী ভাব বা মধুর ভাবের সাধনায় গুরুর কোন স্থান ছিল না। চৈতন্যোত্তর কালে বাংলাদেশে দু'টি প্রধান গুরুগোষ্ঠী বিশেষ হয়ে ওঠে—একটি শান্তিপুরে অপরটি খড়দহে। প্রসঙ্গত বীরভদ্র উল্লেখযোগ্য, ইনি বরং এক ভিন্নতর সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। অপরদিকে, রূপ জীব প্রভৃতির হাতে বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি উচ্চকোটীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে থাকে। যেমন—ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি বৈষ্ণব নাট্যকাব্যসমূহ। ফলে চৈতন্যদেবের 'আচণ্ডালে ধরি দেই কোল', তৃণাদপি সুনীচেন বা চণ্ডীদাসের সবার উপরে মানুষ সত্য' আর খুব বেশি জনমনে দাগ কাটতে পারল না; ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই এবং ইতিহাসের বিবর্তনধারার সূত্র ধরেই সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর হাতে এক-এক সময় এক এক ধর্ম মত ও ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ঠিক এই পথেই কোন এক আউলচাঁদ যে আবির্ভূত হয়ে মানুষ সত্য এর স্থলে 'গুরু সত্য' বলাবেন এতে অসুবিধা কোথায়? তাই সহজিয়া, ধর্মচিন্তা ভগবান ও ভক্ত যা ছিল, তার মধ্যে অতি সহজেই এক মধ্যবর্তী প্রধান হয়ে উঠবে গুরু এটাই স্বাভাবিক। কারণ, ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা এবং ধর্মাশ্রয়ে থাকার মধ্যে সেতু এই গুরু। তাই,—আর ভগবান নয়, গুরু সত্য; গুরুই সব। সেই গুরুই হলেন কর্তা বা আদি কারণ। তখন, গুরুই ঈশ্বর, এ রকম ধারণা মনে গেঁথে নেওয়া ভক্তের পক্ষেও আর অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং একদা উদিত সূর্য্যস্বরূপ আউলচাঁদ বা আউলে ফকিরকে(*) কেন্দ্র করে কর্তা সত্য, গুরু সত্য করে তাতে ভগবানের সমস্ত গুণাদি মিশিয়ে এক বিশেষ লোকধর্ম স্বীকৃত সত্যের মত ঘোষপাড়া নিবাসী সদ্গোপ কুলোদ্ভব রামশরণ পাল'-এর হাত দিয়ে প্রচারিত ধর্মমত, কর্তাভজা সম্প্রদায় নামে গড়ে উঠবে; তা খুবই স্বাভাবিক। এবারে কেমন করে সূত্র অনুসৃত হল তা দেখানো যেতে পারে—

কৃষ্ণচন্দ্র < গৌরচন্দ্র ∠ আউলেচন্দ্র।

কৃষ্ণভগবান ∠ গৌরভগবান ∠ আউলেকর্তা বা আউলে-ভগবান।

কৃষ্ণ অবতার ∠ গৌর অবতার ∠ আউলে অবতার।

—তাছাড়া কৃষ্ণের যেমন অষ্টোত্তর শতনাম আছে, গৌরের যেমন চৈতন্য চরিতামৃত আছে, তেমনই আউলের অনেক নাম—আউলেচাঁদ আউলে মহাপ্রভু, আউলে ব্রহ্মচারী, আউলে ফকির, সিদ্ধ পুরুষ, সাঁই গোঁসাই, ফকির ঠাকুর প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্যের কাছে অদ্বৈত আচার্য এক বার্তায় জানিয়ে ছিলেন—"বাউলকে কহিও লোক হইল আউল"। অতএব, চৈতন্যদেবের জীবিত কালেই যে 'আউল' শব্দটি চালু হয়েছিল তা প্রমাণিত হচ্ছে। আউল অর্থ সংসারত্যাগী বৈরাগী। এমনই একজন ফকির আউলচাঁদ গৌরচন্দ্র যারহৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবতার হবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

এই অবতার পদ্ধতি দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এই নব্য লৌকিকধর্ম বহিরঙ্গ বিচারে ভারতীয় সনাতন ধর্ম বজায় রাখতে পেরেছে এবং তাকে গুরু দ্বারা গুণান্বিত করে তাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে নরূপী নারায়ণে উন্নীত করতে পেরেছে। তাই, আউলে উদাসীন-ই কর্তা বা ঈশ্বর। এখন আর মানুষ সত্য নয়, ঈশ্বর সত্যও নয়; কর্তা সত্য। এভাবে কর্তা সত্য, গুরু সত্য, আর সব মিথ্যা এই লোকধর্মের নাম হল সত্যধর্ম আর সেই কর্তাভজা

অন্যত্র গাই, সেই অর্থে 'অয় কর্তা'। আউলেচাঁদের এই 'কর্তাসব' নীতি খৃষ্টানদের যীশুকর্তার মতই দেখায়। প্রভু যীশু ছাড়া যেমন খৃষ্টান ভক্ত কিছু জানে না, তেমনই কর্তাভজাগণ কর্তা বই আর কিছু জানে না। তবে, সম্প্রদায় প্রবর্তকের সম্ভবতঃ এই ইচ্ছাই ছিল একটা বিশেষ লোকধর্মের গড়ে তোলার আড়ালে,—

(১) ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ব্যাভিচার রোধ দমন;
(২) সত্য ও ন্যায় পথে পরিচালিত করা;
(৩) সাম্য অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা
(৪) এক প্রেমসূত্রে সবাইকে গাঁথা।

—নাহলে, নিষেধাজ্ঞা গুলি এরূপ হত না,—

(১) সত্য বই মিথ্যা বলিব না
(২) পরদ্রব্যে লোভ করিব না,
(৩) পরস্ত্রী গমন করিব না।
(৪) জাতির বালাই থাকিবে না—প্রভৃতি।

এই রামশরণ পাল এর স্ত্রী সরস্বতী দেবীকে কর্তা মা করে নিয়ে এবং শিবদ্বারা সতীর গুণ আরোপিত করে 'সতীমা'-এ পরিণত করে অলৌকিক মহিমা দেওয়া হয়েছে ভক্তের গানে এই সতীমার স্তুতি,—

লালশশী কয় কিছুই না জানি
ভক্তদে মা গুরুরূপীণ্ড নারায়ণী।

---

(১) অক্ষয় কুমার দত্ত: ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়; প্রথম ভাগ—১৮৭০ খৃঃ

(২) 'কর্তাভজা'—এই সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন (অক্ষয় দত্তের আগে) হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০) তাঁর 'Sketches of the Religious Sects of the Hindus' নিবন্ধে।

(৩) পারসিক ভাষায় আউলিয়া শব্দের অর্থ বুজর্গ; অর্থাৎ যার মধ্যে দৈবীশক্তি আছে। তাই এঁর পূর্ব নাম পূর্বচন্দ্র হলেও আউলে নামেই ইনি বেশী পরিচিত হন।

(৪) আউলেচাঁদের বাইশ জন শিষ্য ছিল। রামশরণ পাল তাঁদের অন্যতম।

(৫) 'সতীমার নামে আজও প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমাতে মেলা হয়। বেশ বড় জাতের মেলা। লোক-বিশ্বাস যে সতীমার স্বয়ম্ভূ পোতা মেলাতলার তালিমগাছে 'ঢিল' বাঁধলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং সতীমার ক্ষীর পুকুরের জলে ডুব দিলে রোগের কথা ফোটে ও অন্ধ দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়……ইত্যাদি।

পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

১৯১৬

সকালে প্রার্থনার পর 'প্রলয়পয়োধিজলে', 'ক্ষিতিরতি বিপুলতরে', 'বসতিদশন শিখরে' শ্লোকত্রয় ব্যাখ্যা করি। শ্রীনিত্যগোপাল প্রলয়পয়োধি জলে নিমগ্ন বিশ্বের জন্য বেদ ও চরিত্র নিয়া আসিয়াছেন। তিনিই কূর্মরূপে ধরণীকে ধারণ করিবেন, তিনিই শূকররূপে বিশ্বকে প্রকাশ করিবেন। সৃষ্টির এক অর্ধেক ভগবান। অপর অর্ধেক ভক্ত। কালী বিশ্বমাতা, মুক্তকেশী আমার ব্যক্তিগত মাতা। সব সৃষ্টিতেই ইহা সত্য। নরনারায়ণে আশ্রম যুগের বেদ ও চরিত্র লইয়া চলিবে, বিশ্বকে ধারণ করিবে ও উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবে। তাহার সাধনা জয়যুক্ত হউক। রেণু ২টার একটু পূর্বে কলিকাতা যায়—স্বর্গেন ঘোষের ওখানে। গাঙ্গুলীর সহিত দেখা হয় নাই।…টিউবওয়েল তাহাদের দ্বারকৃত হইবে কি না বুঝিতেছি না। ফেরে ৬৷৷০ টায়। আজ হইতে এখানে আনন্দবাজার পত্রিকা পাইতে থাকি।…আরতির পর শ্রীনিত্যগোপালই যে দশাবতার—মীন কূর্ম বরাহ নৃসিংহ তাহা ব্যাখ্যা করি। সকালে প্রার্থনার পরও করি। আজ নৃসিংহ তত্ত্ব—নৃত্ব ও পশুত্বের সমন্বয়, আদর্শ বাস্তবের সমন্বয়, বিশ্ব-নাগরিকত্বের তত্ত্ব, প্রহ্লাদে দেবধারা-অসুরধারা সমন্বয়ের কথা আলোচিত হয়। নৃসিংহতত্ত্বই বর্তমান যুগতত্ত্ব। হরি-রাম-কৃষ্ণ এই তিন রূপের ভজন চলিবে। নৃসিংহদেব আমার সামনে পিছনে বামে ডাইনে উর্ধ্বে অধঃতে। তিনি আমাকে সকল অশুচি সকল বিচ্ছিন্নতা সকল সাম্প্রদায়িকতা হইতে রক্ষা করিতেছেন। শ্রীনিত্যগোপালই নৃসিংহ। তিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। আমার সব জীবনে তিনি জয়যুক্ত হউন। টালির ঘরটায় উই ধরিয়াছে। আলকাতরা দিতে হইতেছে। জলের মত টাকা খরচ হইতেছে। ঠাকুর, তোমার আশ্রমের ভার তুমি লও। আমি ধনহীন, জনহীন। প্রতিভা এই নূতন গড়িবার মুখে বাঁশবেড়িয়া গেল। সব এখানে বিশৃঙ্খল। ২৭শে এপ্রিল।

'তোমারেই প্রাণের আশা কহিব'—গানটী গাই। কেন আমাকে এ সংসারে তুমি পাঠাইয়াছিলে, তুমি জান। আমি কি সে প্রয়োজন একটুকুও পূরণ করিতে পারিতেছি? নবদ্বীপে তুমি বলিয়াছিলে, 'পরং, সংসারে যাও, সংসারে তোমার কাজ আছে'। বৃন্দাবন হইতে আদেশ দিলে 'বাঙ্গলায় যাও, কাজ আছে'। কী সে কাজ? যে তথাগত তুমি যে-পথে বিচরণ করিতে তাহাই আমার পথ। আমি 'নিশ্চল অনবলোকন', কোনও দিকে না চাহিয়া তোমার শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া চলিব। ইহাই আমার ব্রহ্মচর্য। তোমার পথই সুপথ, ব্রহ্মপথ। সারা জীবন সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছি। কত মানুষ আসিয়াছে, কত মানুষ গিয়াছে—আমি চলিয়াছি, চলিব তোমাকে বুকে লইয়া। তোমার আদর্শ আমার চউক, তোমার চরিত্র আমার হউক। আমি তোমাময় হই। প্রার্থনার পর স্টেশনের দিকে একটু বেড়াইতে যাই। রেণু ১১টার পর অনাদি প্রেস, শ্যামবাজার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক শাখা, প্রিন্টিংহার, জগদীশ প্রেস, শ্যামবাজারে বাজার করিয়া ফেরে আরতির মধ্যে প্রায় ৭টায়। ৪৷৷০টার পর সন্তোষ আসে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিভার বোন শঙ্করী, আরেকটী মহিলা ও গোবিন্দ আসে।…বর্ণাশ্রম ও ভাগবত ধর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে সন্তোষের সঙ্গে আলোচনা হয়। বর্ণাশ্রমের ইষ্ট static ব্রহ্ম। তাই সে সাধনায় গুণ সমূহের মধ্যে অধিকতর স্থিতিধর্মী সত্ত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। রজোগুণকে বর্জন করার দিকেই ইহার দৃষ্টি। এইভাবে একটী Ladder system প্রবর্তিত হয়। ইহার ফলে গুণসমূহের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি হয়, সংসার মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। সত্ত্বগুণ সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপ বলিয়া সত্ত্বকর্মও কুলীন হইয়া পড়িল। এই ভাবে কর্মে কর্মেও সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি হইল। বর্ণাশ্রমের সাধনা না-পাওয়া হইতে পাওয়ার সমাপ্তি। ভাগবত ধর্মে ইষ্ট static-dynamic সমন্বিত পুরুষোত্তম। এখানে গুণ-কৌলীণ্য কর্ম-কৌলীণ্য নাই। আছে গুণ-সমন্বয়, কর্মসমন্বয়। এখানে পাওয়ার আরম্ভ না-পাওয়ার রাজ্যের বুক চিরিয়া পাওয়া লইয়া যাত্রা। আরতির সাধনার দুই দিক। প্রথমে ভাবাবিষ্ট হওয়া। পরে

ভাবভাবিত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দদ্বারা তাহাকে প্রকাশিত করা। ২৮শে এপ্রিল

নিত্যগোপাল, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা'। দেখা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো আকুল নয়নে চালো তোমার করুণাধারা। তোমার মুখ, তোমার স্নেহ, তোমার আদর, আকুল নাড়িয়া নাড়িয়া কথা বলা সবই মনে পড়িতেছে, আর বেদনায় বুক ভরিয়া উঠিতেছে। তুমি আদর করিয়াছ, আদর পাও নাই। তোমার দিকে চাহিয়া চলিব এই অকূল সমুদ্রে।···জলধরবাবু (চট্টোপাধ্যায়) আগেই আসেন। ৫৫ টার পর আলোচনা আরম্ভ হয়। · রাধাকৃষ্ণনের আজিকার আনন্দবাজার বক্তৃতা 'একটী নূতন বিশ্ব জন্মগ্রহণ করিতেছে'—'বৈজ্ঞানিক প্রগতির সঙ্গে নৈতিক অবোগতির সঙ্গে অশুভ মিলন হইলে অন্ধকার'—এইজন্য চাই 'মানসিক উদারতা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন নূতন ধরণের মানুষ'—ইহা ভিত্তি করিয়া আলোচনা করি। শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে আদি নূতন বিশ্ব জন্মগ্রহণের ছবি দেখিতেছি, সর্ব সমন্বয়ের মত মানসিক উদারতা তাহাতে ছিল। তিনি ছিলেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন নূতন ধরণের মানুষ। তাঁহাকে বুকে লইয়া সমস্ত বাঙ্গলাদেশ ঘুরিয়া এই ক্ষুদ্র পল্লীতে আসিয়াছি। আমরা কোনও বিশেষ দলের নই। আমি সর্ব দলের। রিফিউজীদের কথা বলি। এখানে বরিশাল-খুলনা-যশোহর ফরিদপুর সমান হইয়া Greater East Bengal গড়িয়া তুলুক। স্থানীয় লোকদের সঙ্গেও সমন্বয় করিতে হইবে। ঘটি বাঙ্গাল মনোভাব চলিবেনা। আলোচনার পর ভূপতিবাবু জিতেনবাবু ও হাজারী মিত্র আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শঙ্করাচার্যের ভারত কি করিয়া বুদ্ধদেবকে পরিপাক করিবে নিত্য-গোপালের আরক রস ব্যতীত? ভূপতিবাবু কয়েকটী লিচু শশা ও কমলা আনেন। ২৯শে এপ্রিল

আজ সকালে 'রাধেকৃষ্ণ' ও 'প্রলয়পয়োধি জলে স্তোত্র' পাঠ করি। সকল কর্ম যদি ভজনে পরিণত হয় তবে কর্মীতে কর্মীতে বিরোধ হয় না। মুখের সঙ্গে হাতে পায়ের বিরোধ কোথায়? বাবু মুখ দিয়ে কথা বলিয়া সমগ্র জীবনের সেবা করে আর হাত পা মুখ বুজিয়া সেবা করে। কর্ম কৌলীণ্য সেবায় নাই। মহোৎসবে কীর্তন ও বা রান্নাও তাহাই। নরনারায়ণ আশ্রম চায় সামগ্রিক দৃষ্টিদ্বারা সমস্ত কর্ম জ্ঞান ও ভক্তিকে বিচার করিতে। তখন সবই পুরুষোত্তম সেবা। কর্মীও সেবক জ্ঞানীও সেবক, ভক্তও সেবক। সঙ্ঘ গড়িবার জন্য সারা জীবন প্রাণপাত করিলাম। নরনারায়ণ আশ্রম আজও ক্ষুদ্র তবুও ইহা যেন প্রাণবান হয়। প্রতি মানুষের জীবনে 'নরসিংহ' সুপ্ত আছেন। তাঁহাকে জাগ্রত করিতে পারিলে তাঁহার গর্জনে সমস্ত বিভেদ অনৈক্য অজ্ঞান তিরোহিত হইবে। নরসিংহ নিত্যগোপাল জন্মযুক্ত হউন। ৭টার পর ঊষারাণী স্নেহসহ ৮এ রাসবিহারীতে চলিয়া যায়। কবে আসিবে জানি না। আমি একাই পড়িয়া থাকিব। স্নেহ ওখানে খাইয়া P.M.G. গাঙ্গুলী প্রভৃতি স্থান হইয়া ৩টায় ফেরে। দেশবন্ধুনগরে উদ্বোধন পোষ্ট করিবার হুকুম হইয়াছে তাহারা বলিল। গাঙ্গুলী ৫০ টাকার চেক দিয়াছে। বাসন্তী বাইণ্ডিং এও যায়। গীতার রিপ্রিণ্ট কিছু দিয়া আসে। স্টাণ্ডার্ড ফটোতে ঠাকুরের দাঁড়ানো ছবির ব্লক ঠিক আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য ছবি তুলিয়া আনে। ব্লক ঠিক আছে। কালীপদ ইহাদের সঙ্গে টিনে আলকাতরা দিতেছে। আরতির পর আলোচনা হয়, ভগবানে প্রেম তখনই বাস্তব, যখন তাঁহার জাতেও প্রেম থাকে। ভগবানকে ধরিয়া বিশ্ব, বিশ্বকে ধরিয়া ভগবান —এই দুইভাবে ভালবাসিতে হইবে—deductively ও inductively। 'তোমাতে যখন মজে আমার মন তখনি ভুবন হয় মধুময়'—ইহা এক দিক। অপর দিক হইতেছে যে জনা মানুষ ভালবাসে 'সেই জন দেখিছে ঈশ্বর'।···বারান্দার মাটি ফেলিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। ৩০শে এপ্রিল

দূরের আকাশ

অনিলরঞ্জন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সৈকতও ভীষণভাবে চাইছিল বৈশাখীকে।

ভরা যৌবন যখন শুকনো খটখটে রোদ্দুরের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে মাঝে মাঝে অন্য কোনও দিকে ঝাঁক নিতে চায় তখন এই ভেবে সৈকত নিজেকে শক্ত করে যে এমন একটা সময়ে ওরা জন্মেছে যখন যৌবন তার স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বীকার করবে, প্রৌঢ় হবে বৃদ্ধ আর বৃদ্ধ হবে জরাগ্রস্ত একটা প্রাণী মাত্র যাদের দিকে নজর কেউ দেবেনা। দেবে শুধু প্রতারনার পর প্রতারনা যাতে সকলে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে অনেক দূরের বাসিন্দা হয়ে থাকবে আর যারা পৃথিবীকে নিজের পার্সোনাল প্রপার্টি হিসাবে ভোগ করতে এসেছে তারা বিনা বাধায় জীবন ভাসিয়ে দেবে অনায়াসলভ্য প্রাচুর্যের মধ্যে।

তাই আজ সেখানেই যাও না কেন দেখবে যা হওয়া উচিত তা হচ্ছেনা। খেলার মাঠে, স্কুলে, কলেজে, হাসপাতালে, অফিস, এমন কী স্কুল কলেজে—নেই কোন শৃংখলা কিংবা নিয়ম কানুন, বলা হারা হয়ে সকলেই নিজের নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ।

এটা সমাজ জীবন নয়। এ জীবন অরণ্য জীবনও নয়। এ জীবন একটা স্বতন্ত্র জীবন, শুধু নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চলার জীবন।

সৈকতও তাই আশা করেনা স্বাভাবিক জীবনের ধার ওর কাছে উন্মুক্ত।

বৈশাখীকে তাই চায় না জীবন সঙ্গিনী করতে, চায় শুধু কাছে বসে কিছু আলোচনা করতে। বলতে পারছেনা এই প্রতি যোগিতার যুগে কী ভাবে নিজের স্থানটুকু করে নেবে।

বৈশাখী মেয়ে।

মেয়েরা অনেক সময় অনেক কিছু স্বচ্ছ চোখে দেখতে পায়।

ছেলেদের চেয়ে বেশী প্রখর ওদের দৃষ্টি। ভবিষ্যত ভবিষ্যত ওরা যাচাই করে নিতে পারে বর্তমানের আলোকে।

একটি যুবক ও একটি যুবতী তাই মিলতে চাইছে ঘর বাধতে নয় ঘর বাধার মালমশলা জোগাড় করার উপায় উদ্ভাবনের আশায়।

সৈকত সত্যি সত্যিই পানের দোকান থেকে বিড়ি কিনছিল সেদিন বিকেলে।

পাশে মৃদু একটা ছোঁয়া অনুভব করল সৈকত।

দেখল, বৈশাখী নতুন সাজে উপস্থিত। ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে। এভাবে আশা করেনি ওকে।

কিছুটা আশ্চর্য হ'ল। চোখে চোখ রাখল। ইঙ্গিতে জানাল অপেক্ষা করতে। বিড়ির পয়সাটা তাড়তাড়ি দিয়ে ওর পিছু হাটতে শুরু করল।

ওরা এসে বসল একটা বেঞ্চিতে। পার্কে লোক জন থাকলেও সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে একটু নিরিবিলিতে বসল।

সৈকত আচমকা বলেই ফেলল, একটা কাজ করতে পারবে আমার জন্যে ?

—কী—

কাজটা খুব সামান্য হলেও বিপদ আছে—

রাজী—

সত্যি সত্যিই—

বলছি তো রাজী।

বিপদ জেনেও—

হ্যাঁ—

—অতটা বিশ্বাস করা ভাল নয়—

—তোমাকে চিনি—

—কতটুকু—সৈকত বড় বড় চোখ করে বলে।

—যতটুকু দরকার—

—এরই মধ্যে চিনে ফেললে আমাকে। বাইরে বাইরেই তো থাকি। ক'দিনই বা দেখেছ?

—বেশীদিন দেখতে হবেনা—বৈশাখীর ছোট্ট উত্তর।

—তাই নাকি?

- হ্যাঁ মশাই—

—আর ও অবাক সৈকত। মেয়েটা কি বলছে?

—অমন করে তাকিয়ে আছো কেন? বৈশাখী জানায়।

—তোমাকে অবাক লাগছে—সৈকতের চটপট উত্তর।

—এত তাড়াতাড়ি

—হুঁ—

আর কথা না বাড়িয়ে সোজাসুজি সৈকত বলে,

—আমার জন্যে একটু নীচে নামতে পারবে?

—পারবো—

সৈকত ভাবলো মেয়েদের অভিজ্ঞতা কম বলেই হয়তো অমন ভাবে রাজী হচ্ছে, এবার খোলসা করে বল, "আমি বিজনবাবুর কাছ থেকে কথা পেয়েছি ওর একজন বন্ধুর কাছে আমাকে পাঠাবে। সে ব্যাঙ্কে আছে। লোন দেবে। এবার সাহস করে নেমেই পড়বো দেখছি। এত লোকে যখন পারছে আমিই বা কেন পারবোনা। যত বাধাই থাক এবার শুরু করে দেখতে চাই দাঁড়াতে পারি কিনা। শুধু কিছু টাকার জোগাড় করা দরকার। ইনসেনটিভ দিলে টাকা পাওয়া সম্ভব হতে পারে। কিছু না দিলে পাওয়া অসম্ভব। আমার অন্য কোনও মূলধন কোথায় যা ওর সামনে তুলে ধরতে পারি?"

—তাই বুঝি আমাকে কাজে লাগাতে চাও?

—একজ্যাক্টলি—রাজী—

—আগেই তো বললাম, তবে ফিফটি ফিফটি মেয়েরা ও আজকাল পিছিয়ে নেই। সংসারে দাঁড়াতে হোলে যা করা দরকার তার মোকাবিলা করার মতো সংসাহস আমার আছে—

—কিন্তু সেই সাহস শেষ পর্যন্ত থাকবে তো—

—পরীক্ষা করে দেখো—

—বেশতো যদি উৎরাতে পারো দু'জনে মিলে একটা হোটেল করব ডায়মণ্ডহারবার কিংবা দীঘায়—আমি বাজার থেকে ভাল ভাল জিনিষ আনবো, তুমি তদারক করবে রান্না বান্নার—যারা থাকবে তাদের ফ্যামিলি কমফোর্ট দেবে—

অসভ্য কোথাকার?

—অমনি অসভ্য হয়ে গেলাম। কাজের কথা বলছি—শোন সেই হোটেল হবে আশ্চর্য্য এক জায়গা যেখানে এলে লোকে ভুলে যাবে দূরে আসার ক্লান্তি—আপন জনের মতোই তুমি আর আমি তুলে ধরব তাদের কাছে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ—

—আর দু'পয়সা লুটে নিবি সংসারে চুব দেওয়া যাবে অনায়াসে—

—তুমি থাকলে দেখবে কেমন ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে হোটেল চালাই

—নাম কী দেবে?

—সে পরে ঠিক হবে—তাহলে দিন ঠিক কর কবে যাবে?

—কোথায়?

—কেন বললাম যে—

—তুমিই ঠিক করো—আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি—দেখি দু'পায়ে হাঁটা সম্ভব কী না?

—আজই হঠাৎ অতটা অস্তরঙ্গ হবে ওরা আগে ভাবেনি। বোধহয় প্রয়োজনই ওদের অত কাছাকাছি নিয়ে এল।

কিন্তু প্রয়োজন ফুরলেও কী অত কাছাকাছি ওরা থাকবে?

(শেষাংশ ৭২ পাতায়)

মার্কিনীরা কী শুধুই জড়বাদী ?

শরদিন্দু সাহা

এদেশের কোন সুধী ব্যক্তি তিনি সাধু হোন বা পণ্ডিত হোন মার্কিন মুল্লুকে গল্প বেয়াদী চক্কর দিতে গিয়ে ওদেশের কর্মব্যস্ত জীবন ধারা দেখে তড়িঘড়ি ধারণা করে বসেন তামাম আমেরিকার লোক নিছক জড়বাদের উপাসক। ঘর লোকের বৈষয়িক সমৃদ্ধি আর উদ্দাম ভোগ বিলাসের মোহে ওরা এমন আচ্ছন্ন যে অমর লোকের অন্তহীন প্রতিশ্রুতির আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিয়ে ওদের মোটেই মাথা ব্যথা নেই। তা ছাড়া এদেশের পথে ঘাটে যখন দেখতে পাই সংসার বিরাগী রুক্ষ প্রেমী মার্কিন বোষ্টমদের জটলা তখন আমাদের মনে হয় মার্কিন মুল্লুকে হয়তো খৃষ্ট ধর্মে অরুচি ধরায় ওদেশের লোক কৃষ্ণ তত্ত্বের ভাবরসে হাবু ডুবু খেতে সুরু করেছে। অনুরূপ ধারনার জাল বুনে আমাদের মানসিকতায় বেশ কিছুটা গর্বের সুড় সুড়ী লাগে তাতে ভুল নেই। তবে বাস্তব ঘটনায় ঐ সব ধারণার পক্ষে সমর্থন মোটেই মেলে না।

মার্কিনীদের কর্মব্যস্ত জীবন ধারায় অবসরের প্রাচুর্য না থাকায় ওরা হয়তো আমাদের মতো কল্পনা বিলাসী হয়ে পরকাল এর পরিণতি নিয়ে মাতামাতি করার ফুরসৎ পায় না। তা বলে খৃষ্টতত্ত্বে রুচি হারিয়ে সেই ধর্ম ওরা বাতিল করতে বসেছে এমন ধারণা মোটেই সত্য নির্ভর নয়।

আজকের দিনে সভ্য সমাজে কোন শ্রেণীর চলচ্চিত্র আর পুস্তক সব চেয়ে বেশী জনপ্রিয় তা থেকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই সমাজের রুচির বিচার করে থাকেন। চলচ্চিত্র দুনিয়ার মক্কা আমেরিকার হলিউড। সেখানে আজ পর্যন্ত যত ছায়াছবি পয়দা হয়েছে তার মধ্যে মার্কিন মুল্লুকে যে চিত্রটি জনপ্রিয়তার সবার ওপর স্থান পেয়েছে তার নাম—Jessus (যীশু খৃষ্টের চিত্রায়িত জীবনী)। এই চিত্রটি দেখতে মার্কিনীরা যে দর্শনী দিয়েছে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় ১০০ কোটি টাকার ওপর। অনুরূপ আর্থিক সাফল্য বিশ্বের চলচ্চিত্র ইতিহাসে সর্বকালের রেকর্ড। আমেরিকার খৃষ্ট জীবনী চিত্রের এই জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই খৃষ্ট ধর্মে মার্কিনীদের অরুচির পরিচয় বহন করে না।

এবার দেখা যাক আমেরিকায় কোন শ্রেণীর বই এর কাটতি সব চেয়ে বেশী। কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার খৃষ্টীয় পুঁথি বিপণন সমিতি (Cristian Books' Seller Association) তাদের বার্ষিক বিবরণীতে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন সেটা দেখলে এদেশে অনেকেরই চোখ কপালে উঠবে। এতে জানা যায় ১৯৭৪ সনে সারা আমেরিকায় খৃষ্টীয় ধর্ম তত্ত্বের পুঁথি বিক্রয়ের পরিমান দাঁড়িয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় ২১০ কোটি টাকার ওপর। এর মধ্যে ৫০ টি বই এর প্রতিটি ১০ লক্ষ খণ্ডের বেশী বিক্রি হয়েছে। ঐ বছর রিভেল টণ্ডারভ্যান (Revel Tondervan) নামে পুস্তক ব্যবসায়ী শুধু খৃষ্ট তত্ত্ব নিয়ে রচিত যে সব পুস্তক বিক্রয় করেছেন ভারতীয় মুদ্রায় তার মূল্য দাঁড়িয়েছে ২৫ কোটি টাকার ওপর। ক্রম বর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত সমিতির দৃঢ় বিশ্বাস পরের বছর ওদের খৃষ্টীয় পুঁথির বিক্রয় দাঁড়াবে ৩০০ কোটি টাকার বেশী।

এখানে উল্লেখ্য গত চার দশকে ছয় জন মার্কিনী সাহিত্যিক বিশ্বের প্রথম সারির সাহিত্য স্রষ্টা রূপে নোবেল পুরস্কার অর্জন করায় ঐ দেশটি বর্তমানে একটি সাহিত্য তীর্থের মর্যাদা লাভ করেছে। এরূপ দেশে সাহিত্যানুরাগী পাঠকের সংখ্যা কিছু কম থাকার কথা নয়। তবু ভাবতে অবাক লাগে ঐ বছর মার্কিন মুল্লুকে যত গল্প উপন্যাস ও কাব্য সাহিত্যের পুঁথি বিক্রি হয়েছে তার মোট পরিমাণ খৃষ্টীয় ধর্ম গ্রন্থের তুলনায় নগণ্য।

প্রশ্ন থেকে যায় আমেরিকায় অনুরূপ বিপুল সংখ্যায় খৃষ্ট তত্ত্বের পুঁথির ধারা পাঠক তারা কি জীবনের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে পরপারের খেয়া ঘাটে অপেক্ষমান প্রৌঢ় বা থুবির বৃন্দের দল ? না, মোটেই তা নয়। সেদেশে খৃষ্ট তত্ত্বের অনুরাগী পাঠকদের বারো আনাই মার্কিনী তরুণ তরুণীরা।

এখানে জানতে কৌতূহল জাগে ২০ কোটি জড়বাদী মার্কিনী যেখানে প্রতি বছর ২৫০/ ৩০০ কোটি টাকা

মূলোর খৃষ্টীয় তত্ত্বের বই কেনে সেখানে ৬০ কোটি অধ্যাত্মবাদী ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী কী পরিমাণ দামীয় পুস্তকের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে? শুধু দারিদ্রের দোহাই দিয়ে এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাওয়া মোটেই সহজ নয়। কেন না এদেশে চটুল গল্প উপন্যাসের বাজার যেমন রমরমা ধর্ম গ্রন্থের কাটতি সে তুলনায় মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। নগণ্য যা কিছু ধর্ম পুস্তক এদেশে প্রকাশিত হয় তারও একটা মোটা অংশ ক্রেতার অভাবে হয়তো নির্দিষ্ট মূলোর চেয়ে কমে অথবা ওজন দরে বিক্রি করতে হয়।

অনুরূপ বাস্তব সত্যের মোকাবিলায় স্বদেশের নিষ্প্রভ শ্রীহীন দেহের ওপর অবাস্তব ভাবনার ঘোমটা চাপিয়ে বিদেশের ভাবমূর্তীকে খাটো করে প্রচার করার প্রবণতায় দেশপ্রেমের গিল্টি থাকলেও সত্যের অবমাননার কলঙ্ক থেকেই যায় সেটা অস্বীকার করা চলে কী?

পরিশেষে মার্কিনীদের সম্পর্কে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী রবীন্দ্রনাথ কিরূপ ধারণা পোষণ করতেন তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। এখানে স্মরণীয় তিনি কটিতি সফরে আমেরিকায় যান নি। ১৯১২ সন থেকে ১৯৩০ সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি মোট পাঁচবার সেদেশে গিয়েছেন। আমেরিকার পনেরোটি রাজ্যের ৪০টি শহরে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেছেন। তিনি বলেছেন –

"আমরা যখন বলি যে, আমেরিকা জড়বাদী তখন স্পষ্টত বোঝা যায় কথাটা ষোল আনা সত্য নয়।... আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের এক প্রবল প্রবাহ মার্কিন মানসের মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিলা নদীর মত বয়ে যাচ্ছে।"

—Atlantic Monthly Magazine June 1927

"জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকটা আমেরিকায় অনুসরণ করা হয় বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে। আধুনিক পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না।"

ভাষণ—শান্তিনিকেতন, এপ্রিল ১৯৩১।

"এই যুক্তরাষ্ট্রকে আমি আধ্যাত্মিকতাবাদী মানুষের শেষ আশ্রয় বলে মনে করি।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে প্রেরিত তারবার্তা—১৯৩০ সন।

———

দূরের আকাশ

(৭০ পাতার পর)

সে কথা ভবিষ্যত বলবে। আগে থেকে অতটা ভেবে আজকের বিকেলের প্রোগ্রামটায় চির ধরাতে ওরা চায়না।

জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে ওরা দেখতে চায় এর শেষ কোথায়?

যেখানেই ওদের পরিণতি নিয়ে চলুক ওরা চলবে, দেখবে যাচাই করবে কতটা মজবুত ওদের চলার গতির বেগ।

এই বেগই তো জীবন। জীবনের ডাক যখন এসেছে ওরাও পিছিয়ে থাকবেনা।

আজ পার্কের লোকজনগুলো বড় ভাল লাগছে ওদের। এবার নিরিবিলি জায়গা ছেড়ে ওরা অন্য একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

পকেটে হাত দিল সৈকত, পাশেই বরফওয়ালা। দুটো বরফ নিল।

একটা বৈশাখীর হাতে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, প্রথম ঘুষ।

হাসি মুখে বরফটা হাতে নিয়ে বলল বৈশাখী—আগে কামড়টা হোক তারপরে দরাজ হাতে এগিয়ে এসো—

আগে থেকেই একটু প্র্যাকটিস করি—

কলকাতার আকাশের রংটা এরই মধ্যে পালটে গেল। ওদের জীবন আকাশেও কী কোন ও কিছুর ছোঁয়া এসে লাগলো?

(ক্রমশঃ)

শিশুজগৎ

টক্কা-টরে-টক্কা

ভবানী প্রসাদ মজুমদার

টক্কা-টরে-টক্কা !
ছুটুন সবাই মক্কা !!
মক্কা থেকে 'তার' এসেছে
টক্কা-টরে টক্কা !!

টক্কা-টরে-টক্কা !
একা-গাড়ী চড়তে গিয়ে
কত্তনু-মিঞা অক্কা !!
টক্কা-টরে-টক্কা !!

টক্কা-টরে-টক্কা !
বেদীর বলে প্যারী-সোবাদ
মারলো ঘোরে ছক্কা !!
টক্কা-টরে-টক্কা !!

টক্কা-টরে-টক্কা !
গড়ের মাঠে পায়রা ওড়ে
মুক্কি-লোটন-লক্কা !!
টক্কা-টরে-টক্কা !!

টক্কা-টরে-টক্কা !
আগাগোড়াই ফক্কা !!

পোকা আর বোকা

সুব্রত দাস

এক ছিল পোকা আর বোকা নামে দুটি অনাথ ছেলে। জন্ম থেকেই তাদের মধ্যে বেশ ভাব। খেলাধুলা গল্প গুজব করা সব কিছুই দুজনের মধ্যে চলে। এই ভাবে দিন যায়। ওরাও শিশুর গণ্ডী পার হয়ে কিশোরে পরিণত হয়। গল্প গুজবের মধ্য দিয়েই একদিন পোকা বোকাকে ডেকে বললো—দেখ বোকা! আমরা এভাবে আর কতদিন বসে থাকবো। চল না আমরা দুজনে একটা কাজ ঠিক করি।' বোকা পোকার কোন কথাতেই বাধা দেয় নি কোনদিন, আজও দিল না।—বেশ ভাল কথা। তবে এমন কাজ ঠিক করবি যেন দুজনেই করতে পারি। বোকার সরল কথাটা পোকার মনে বেশ ভাল লাগলো। বহু চিন্তা ভাবনার পর পোকা ঠিক করলো—দেখ আমাদের বাড়ীর কাছে যে মাঠটা খালি আছে সেখানে যদি আমরা দুজনে চাষ করি তাহলে কাজও করতে পারবো আবার দুজনে একসঙ্গে গল্প গুজবও করতে পারবো।

বোকা বললো—তা নয় হলো। চাষ করতে গেলে কিছু যন্ত্রপাতির দরকার। সেগুলি দেবে কে? আর

এত টাকাই বা কোথায় পাব? পোকা মনে মনে ভেবে দেখল এত সহজ সুন্দর কাজের প্রস্তাবটা তার মাটি হয়ে যাবে। না! খানিকক্ষণ গুম হ'য়ে বসে চিন্তা করে নিল। তারপর আনন্দে বোকাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো জমির খানিকটা কাছে, আঙুল তুলে জমির সবুজ ঘাস গুলিকে দেখিয়ে বললো—'ঐ জমির ঘাসগুলিই আমাদের প্রয়োজনীয় কিনবার পয়সা দেবে।'—কি করে?—ঐ জমির ঘাসগুলি তুলে হাটে বিক্রী করে পয়সা আনবো। তারপর যন্ত্রপাতি কিনে চাষ করবো। জমিতে যা ফসল হবে তা বিক্রী করলে টাকা পাবো।

পোকার কথা শেষ না হতেই বোকা আনন্দে হাত তালি দিয়ে মাটিতে তিনবার ডিগবাজি খেয়ে নিল। প্রতিবার ডিগবাজি দিয়ে বন্ধুর বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলো। তা হলে চলো বন্ধু আজ থেকেই কাজে লেগে যাই। সারাক্ষণ চড়া রোদ্দুরে বসে সেই দিনই পোকা আর বোকা মাঠের অর্ধেক ঘাস তুলে ফেললো। এদিকে পোকা বোকার এমন অদ্ভুত কাণ্ড দেখে গ্রামবাসীরা তাজ্জব হয়ে গেল। হনুমানের মত ঘাস তোলা দেখে সকলে মুখ টিপে হাসতে লাগলো। আবার ওদের অমানুষিক পরিশ্রম দেখে অনেকে মনে মনে খুব কষ্টও পেলো।

সন্ধ্যা হলো। বোকা আর পোকা ঘাসগুলি বেশ ভাল করে বাঁধলো। তারপর মাথায় করে হাটের দিকে রওনা হলো। খানিক বাদে তারা যখন হাটে এলো তখন বেশ ভোর কদমে বেচা কেনা হচ্ছে। বোকা আর পোকা ঘাস নিয়ে হাটের একদিকে বিক্রী করতে বসলো। অনেকে ঘোড়ার খাবার জন্য কচি কচি ঘাস অল্প পয়সায় বিনিময়ে কিনলো। কেউ আবার নাড়াচাড়া করে চলেও গেলো। হাট তখনও শেষ হয় নি। এরই মধ্যে পোকা পয়সাগুলো গুণে বোকার হাতে দিয়ে বললো 'এখুনি হাটের বেচা কেনা বন্ধ হয়ে যাবে। এই পয়সা কটা দিয়ে একটা কাস্তে নিয়ে আয়। আমি বাকী ঘাসগুলো বিক্রীর অপেক্ষায় বসে রইলাম।

কথামত বোকা দোকান থেকে কাস্তে কিনতে চললো। দোকানে গিয়ে পয়সাগুলি দোকানীর হাতে দিয়ে কাস্তে চাইলো। মুচকি হেসে দোকানী বললো—এই পয়সাতে কাস্তে হবে না। কি বোকা তুমি পয়সা না গুণে দর না জিজ্ঞাসা করে কাস্তে কিনতে চাইছ। আর যাও কোথা। দোকানীর অন্য কথা বার দিয়ে দোকানীর মুখে নিজের নাম শুনে আনন্দে গদ্‌গদ। তাই বেশ সাহস ভরে কাকুতি মিনতি করে দোকানীকে কাস্তে দেবার কথা বলতে লাগলো।—বড্ড দেরী হচ্ছে যে। আমার দেরী হলে পোকা আমার জন্য ভাববে। বোকার মুখে পোকার নাম শুনে তো দোকানী হতবাক্।—পোকার কথা ভাবছেন। পোকা আমার বন্ধু। কিন্তু ঘাস ছিল বলেই তো ও আমার সঙ্গে আসতে পারে নি। না হলে আমরা দুজন একসঙ্গে··· ঐ তো পোকা আসছে দেখুন। দোকানী সচকিত হয়ে বোকার কথামত বোকার বয়সের একটি ছেলেকে দৌড়ে আসতে দেখলেন। আমি আপনাকে মিথ্যা বলি নি, দেখছেন তো, বোকা একদমে বলতে লাগলো। দোকানী অবাক হয়ে কি ঘটে দেখতে লাগলেন। পোকা পোকা,—এই পোকা করে ডাকতেই পোকার সহিৎ ফিরে এলো। চারদিক তাকিয়ে পোকা ব্যস্ত হয়ে বোকাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সব ঘটনা বলতে লাগলো।

বোকা চলে আসার পর পোকার কাছ হতে ঘাস কিনতে এসেছিল একজন। ঘাসে পোকা টোকা নেই জিজ্ঞাসায় এই মার পিটের ঘটনা ঘটে যায়। পোকা তাকে সহজ ভাব উত্তর দিয়েছিল—কি যে বলেন, এ ঘাসে পোকা? তাছাড়া পোকাকে তো চেনেন? বৃদ্ধ এ উত্তর শুনে রেগে লাল। এতটুকু ছেলে, এই বয়সেই তোমার কাছ হতে আমাকে পোকা চিনতে হবে। আমার নাম চিনুলাল। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি বলে হৈ চৈ শুরু করে দুজনার কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। নিজের রাগ সামলাতে না পেরে ছাতার বাট দিয়ে দু'এক ঘা বসিয়ে আমার দলে ছুটতে লাগলেন। সব মাটি করে দিল রে বোকা।

পোকার কাছে এই কথা শুনে দোকানীর খুব মায়া হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন। এদিকে পোকা বলতে লাগলো—না ভাই চল, আমাদের আর কাজ করার দরকার নেই। চল এখান থেকে আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। এ রকম কথা শুনে দোকানী হরিহরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, না তোমাদের কোথাও যেতে হবে না। আজ থেকে তোমরা দুজন আমার কাছে থাকবে।

———

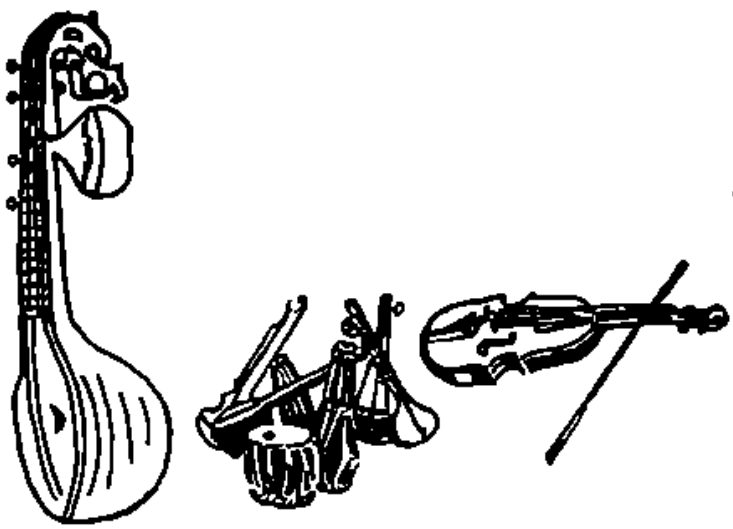

সঙ্গীত জগৎ

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী

(১৮৩৪ ? ১৯৩৫ ?)

আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়

এই উনিশশো উনআশী খৃষ্টাব্দ থেকে হিসাব করলে দেখা যাবে মাত্র একশো চুয়াল্লিশ বছর আগে যিনি জন্মেছিলেন, যাঁর দেহত্যাগ হয়েছিল মাত্র চৌষট্টি কি পঁয়ষট্টি বছর আগে এই বাংলার বুকে, সেই মহান সংগীতজ্ঞের আসল কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ গুণীজনেরা বলেন, শোনা যায় লক্ষ্মীনারায়ণের মত ওস্তাদ বাঙালীর ঘরে তো নয়ই কোন অবাঙালী ঘরাণা ঘরেও কেউ জন্মেছিলেন কিনা কেউ বলতে পারে না। অনুমান করে শুধু এইমাত্র জানতে পারা যায় যে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের কোন একমাসে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল এই পশ্চিমবাংলায়।

সংগীত-জগতের একটা কিছু শিখতে গেলেই একটা মানুষকে কত কষ্ট যে করতে হয় সে কথা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই জানে না। সেই সংগীত-জগতের কণ্ঠ-সংগীতে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী শিখেছিলেন ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা আর ঠুংরী। যন্ত্রসংগীতে তিনি শিখেছিলেন, বীণা, সেতার আর এসরাজ। সংগত যন্ত্রের মধ্যে শিখেছিলেন পাখোয়াজ আর তবলা। এতগুলো বিভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন দক্ষ শিল্পী।

এখন সহজেই অনুমান করতে পারা যায় যে, সংগীত-জগতের অতগুলো বিভাগের অতগুলো গুরুর কৃপা তিনি কেমন করে অর্জন করেছিলেন। যে যুগে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সে সময় ওস্তাদ সম্প্রদায় ছিলেন রীতিমত গোঁড়া আর রক্ষণশীল। শেখা তো দূরের কথা শেখবার কথা বলতে হলে, অনেক রকম কলাকৌশল অবলম্বন করে, অনেককে অনেক খোসামোদ করে, অনেক মিনতি করে তবে তাঁদের সামনে হাজির হয়ে নিজের আরজি পেশ করতে হত। তারপর তাঁদের মর্জিমত তাঁরা তাঁদের অভিমত প্রকাশ করতেন। এইসব কারণে অনেকেই সংগীত জগতে এসেও শেষ পর্যন্ত সরে গিয়েছেন বিরক্ত হয়ে, অনেক দুঃখে, অনেক অভিমানে। শুধু টাকা পয়সা খরচ ক'রে আজ কালকার মত তখন ওস্তাদ পাওয়া যেত না। ওস্তাদদের মন জয় করতে হলে এমন অনেক কিছু প্রয়োজন হত যা আজকের যুগের কোন শিক্ষার্থী কল্পনাও করতে পারবেন না। একমাত্র আলাউদ্দিন খাঁর জীবনী পড়লেই তার কিছুটা ইংগিত পাঠকরা পেতে পারবেন। এমন কঠিন হৃদয়ের ওস্তাদ সম্প্রদায়ের হৃদয় জয় করে লক্ষ্মীনারায়ণ

বাবাজী শিক্ষা করেছিলেন গান বাজনা।

তিনি যাঁদের কাছে গান শিখেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ। বেনারসের রামকুমার মিশ্র আর গোয়ালিয়রের হদ্দার খাঁর কাছে তিনি শিখেছিলেন ধ্রুপদ আর খেয়াল, কাশীতে তিনি শিখেছিলেন বীণা সেতার আর এসরাজ; কিন্তু যাঁদের কাছে ঐসব যন্ত্র বাজাতে তিনি শিখেছিলেন তাঁদের নাম আজ আর জানা যায় না। ঠুংরী অঙ্গের গান শিখেছিলেন সে যুগের স্বনামধন্যা শ্রীজান বাঈয়ের কাছে আর টপ্পা অঙ্গের শিখেছিলেন রমজান খাঁ এর কাছে। তবলা শিখেছিলেন তিনি লখ্‌নৌএর বহু বিখ্যাত ওস্তাদ বাক্কু খাঁর কাছে। পাখোয়াজ শিখেছিলেন ঠাড়িলাল জীর কাছে। এমনি ভাবে সংগীত বিভাগের ভারত বিখ্যাত অতোগুলের ওস্তাদদের মনোরঞ্জন করে সংগীত-জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী।

সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর কাছে ছোট বড় কোন ভেদাভেদ ছিল না। তিনি বলতেন সংগীত হচ্ছে অমূল্য রত্ন। যার কাছে যা পাবে প্রাণভরে নিয়ে নাও। ছোট বড়র কোন বিচার করো না। কার কাছে কোন সম্পদ লুকোনো আছে কেউ তা বলতে পারে না। সরস্বতী কাকে কতখানি দয়া করেছেন কেউ কি জানে?

কাজেই শুধু শিখে নাও। শেখার সুযোগ কোন রকমেই নষ্ট করো না।

যখন তিনি সারা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, তখন তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট এবং সে যুগে তাঁর চেয়ে কমখ্যাতিসম্পন্ন ওস্তাদ রমজান খাঁর কাছে তিনি ছাত্রের মত টপ্পা শিখেছিলেন। তাঁর প্রায় আশী বছর জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন শিক্ষা আর সাধনা করে।

সামাজিক জীবনে তিনি থাকতেন সন্ন্যাসীর মত। পোষাক পরিচ্ছদ ছিল তাঁর সাধুদের মত। তিনি ছিলেন আশুতোষ পরোপকারী নিরহংকারী সদালাপী। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন হিন্দু। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত ছিল তাঁর চালচলন। হিন্দুর ছেলের অহিন্দুর মত পোষাক পরা বা চালচলনে কথাবার্তায় অহিন্দুর মত কিছু দেখলেই তিনি বিরক্ত হতেন। শোনা যায় পরবর্তীকালের বিখ্যাত ওস্তাদ সংগীতাচার্য রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর কাছে শিখতে গিয়ে ঐ অহিন্দুর মত চালচলনের জন্য রীতিমত অপমানিত ও বিমুখ হয়েছিলেন। রামচরণ বাবুকে তিনি বলেছিলেন, তোমার মত চালচলনের মানুষ আমার কাছে কেন? চলে যাও মেটেবুরুজের নবাব দরবারে। সেখানে অনেক ওস্তাদ পাবে।

তাঁর ঐ ধরণের কথায় অনেক কেউ কেউ হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিজে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হন নি। তিনি বলতেন আমার মন প্রাণ যা চায়, সারা জীবন যা আমি বিশ্বাস করেছি, আমার সাধনার সঙ্গে যাকে আমি জড়িয়ে ফেলেছি আমার রক্তের মধ্যে, তাকে ত্যাগ করব কেমন করে। সংগীত আমার জীবন-সাধনা, আমার ধর্ম। মন্ত্র দিয়ে আমি পূজা করি প্রতিমা, সুরমিশ্রে পূজা করি রাগ রাগিনী। যারা হিন্দু নন এমন অনেক ওস্তাদকে তো রামনাম গাইতে শোনা গেছে। আমাদের ধ্রুপদ খামার তো ঠাকুর দেবতার নামে ভরা; সেই সব গান তো সবাই গেয়ে থাকেন। সেইজন্য সবাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কি?

এমনি ভাবে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী নিজের আদর্শকে সবার সামনে তুলে ধরতে কোনদিন লজ্জা করতেন না।

শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন উদার। ভেদাভেদ তাঁর মধ্যে ছিল না। উপযুক্ত ছাত্র পেলেই তিনি অকৃপণ-ভাবে শিক্ষা দান করতেন। শিক্ষা দিতেন কিন্তু পয়সা নিতেন না। তাঁর কাছে যাঁরা গান শিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে দক্ষিণ কোলকাতার নগেন ভট্টাচার্য, বরানগরের যোগেন্দ্র নাথ রায়, উত্তর কোলকাতার অন্ধগায়ক সাতকড়ি বাল্যকার, অন্ধগায়ক শরৎচন্দ্র মিত্র, গড়পাড়ার রাজেন ঘোষ সংগীত-জগতে পরবর্তীকালে স্বনামধন্য শিল্পী হয়েছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী সংগীত-জগতের অনেক কিছু জানা সত্ত্বেও আসরে গান গাইবার সময় গাইতেন ধ্রুপদ, বাজাতেন বীণা আর সংগত করতেন পাখোয়াজ।

(শেষাংশ ৮০ পাতায়)

নারী জগৎ

আমেরিকা ভ্রমণ

অনুপমা সেন

লেখিকার বর্তমান
লেখিকার আশি বছর
কাহিনী উজ্জ্বল ভায়েতে প্রকাশিত হইয়েছে।
বছর বয়সে তিনি একলাই আমেরিকায়
দিয়েছিলেন। তারই কাহিনী। যে দেশে
কুড়িতে বুড়ী হওয়ার অপবাদ প্রচলিত আছে
ও সেই সমাজের কাছে সমগ্র নারী জাতির পক্ষ
এ হয়তো একটা চ্যালেঞ্জ মঃ উঃ
১৯৭৪ সন, ২১শে নভেম্বর শুক্রবার। ৬ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৮১

আমরা শুক্রবার সকাল ৮ টায় প্লেনে আমেরিকা রওনা হইলাম। প্রীতি আমাদের এয়োড্রামে পৌঁছাইতে আসিল এয়োড্রামে আসিয়া শুনি ২ ঘণ্টা প্লেন লেট আছে।

প্লেনে উঠিয়া দেখি বিরাট ব্যাপার। অতবড় প্লেন আর দেখি নাই। প্রায় ৪০০ যাত্রী যাওয়ার সিট আছে স্বচ্ছন্দ স্থান, যারা ধূমপানে করে না তাদের জন্য আলাদা স্থান। সাইন বোর্ডে লেখা আছে। দরজা হইতে যাত্রীরা আসলে হইয়া যারা সিগারেট খায় না, আমরা সিট খালি নাই
কানেকশান চলার ভয়ে এদিকে অনেক লোক সিগারেট খাওয়া বন্ধ করিয়াছে সিগারেট নাকি কানসার রোগের সহায়ক।

প্লেন ছাড়ার পর যাত্রীদের সবাইকে
কোকোকোলা ইত্যাদি
বিস্কুট দিল।

বেলা বারটায় হেডেনে পৌঁছিলাম, আমাদের বন্ধুর পরিচিত একটি বাঙালী ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী এখানে নামিয়া গেলেন। আর অনেক যাত্রী নামিল ও উঠিল। প্লেন ছাড়িবার পর আবার সবাইকে খাবার দিল, আমাদের এদিকে ৪ জন প্লেন-সেবিকা ছিল, অল্প বয়সের মেয়ে কি তৎপর, কি তাড়াতাড়ি এতগুলি লোকের খাবার

বিতরণ করিল,—জল, চা, ড্রিঙ্ক যে যাহা চাহিল তাহা দিল, সকলে আবার ঘাসে বসে খায় না তাদের জন্য ডেডিটেবিল খানা আনিয়া দিল, এতবার দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, একটু ক্লান্তি নাই, একটু দুখ তার নয়। হাসি হাসি ভাব সব সময়। বেলা ১ টায় আমাদের প্লেন ছাড়িল।

প্লেন ছাড়িবার পর একটি প্লেন-সেবিকা হাতে ইশারা করিয়া সব বুঝাইয়া দিল, যদি প্লেনে দুর্ঘটনা হয় তবে কেমন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইবে। সকলের সিটের নিচে লাইফবেল্ট আছে, তাহা ব্যবহার করার নিয়ম ইত্যাদি, প্লেনে আগুন লাগিলে কি করিতে হইবে ইত্যাদি সব বুঝাইয়া দিল। সব ইশারাতে।

৮ টায় পৌঁছিল 'বেলুবন'। এখানে ১ ঘন্টা থামে। ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়া প্লেন যাইতেছে, প্লেন এত উঁচু দিয়া যাইতেছে মেঘ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। এত উঁচু দিয়া যাইতেছি, একটুও ভয়ের ভাব মনে আসিতেছে না। এত লোক, মনে হইতেছে একখানা গ্রাম।

আরবের মরুভূমি, "বাগদাদ", "বেলুবন" হইয়া "বেলুরকে" পৌঁছি। এত মেঘ চারিদিকে তবু বুঝা যাইতেছে রাতের অন্ধকার নামে নাই। এতক্ষণ একভাবে প্লেন যাইতেছিল। এখন নিচে নামিতেছে বুঝা যাইতে লাগিল। বেল্ট বাঁধিবার নির্দেশ পাইয়া সকল যাত্রী যার যার বেল্ট বাঁধিয়া নিল। কানে তালা লাগিয়াছে। বেশি উঁচুতে উঠিলেই ঐ প্রকার হয়। প্লেনে বেশ ঝাকানি লাগিল কিছুক্ষণ তারপর আবার শান্ত। নিচে আল্পস্ পাহাড়ের ৭ মাইল উপর দিয়া, অস্ট্রিয়ার উপর দিয়া, জার্মান সহরের উপর দিয়া, দিল্লির ঘড়ির রাত ৯ টায় জার্মানীর এরোড্রামে পৌঁছিলাম। দিল্লির ঘড়ির রাত ৯টা তখনকার ঘড়ির বেলা ৩টা, বেশ রোদ ছিল।

জার্মান সহরের উপর দিয়া আসিলাম সবই দেখিলাম। দালান-কোঠা।

আবার প্লেন ছাড়িল—"টেমস্" নদীর উপর দিয়া—সহরের মধ্য দিয়া দিল্লির ঘড়ির রাত ১১টায় লণ্ডনে পৌঁছিলাম। প্লেন হইতে সহরের কি আলোর শোভা, একদিকে লাল আলো, একদিকে নীল আলো তাহাও সাজান দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এরোড্রাম খুব বড়, আমরা প্লেন হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিলাম না—কি সুন্দর ও আশ্চর্য বন্দোবস্ত। এত শীত, একটুও অনুভব করিতে পারা গেল না।

এরোপ্লেন থামিল। একটা চোঙ, সরু নল মানুষ যাতায়াত করিতে পারে এই প্রকার উচ্চতা। চোঙটি এরোপ্লেনের দরজার মুখে লাগাইয়া দিল। চোঙের ভিতরে কারপেট পাতা, ইহাতে ২।৩ জন একসঙ্গে যাওয়া যায়, সোজা চলিয়া একেবারে এরোড্রামের বিরাট বারান্দায় আসিয়া পড়িলাম। সেখানে খানিক দূরে হাঁটিয়া চলন্ত রাস্তা ও চলন্ত সিঁড়িতে খানিকটা চলিলাম। তারপর নামিয়া ট্রলি পাইলাম, ছোট ছেলে ও বৃদ্ধ বৃদ্ধারা তাহাতে উঠে। এত দীর্ঘ বারান্দা পায় হওয়া কষ্টকর। সেই ট্রলি খানিক পৌঁছাইয়া দিল। তারপর খানিক হাঁটিয়া আমরা কাস্টমস্ অফিসে পৌঁছিলাম। অনেক যাত্রী, সকলেই যাইতেছে, কিন্তু টু শব্দটুকু নাই। মাল আনিবার জন্য কুলি পাওয়া যায়। অতি বেশী মাল থাকিলেই তাহাদের সাহায্য নিতে হয়। কুলি দেখিয়া চিনিবার যো নাই, সুন্দর দামী পোষাক পরা, দেখিতেও বেশ সুন্দর, কেবল গলায় লাল টাই জড়ান। এই হইল কুলির নির্দেশ। এত বড় এরোড্রাম হইতে বাহিরে আসিবার রাস্তা ফুরায় না। এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত। এমন সুন্দর বন্দোবস্ত, শীত একটুও বোঝা যায় না। কাস্টম অফিসে মানুষ কল্যাণে খুব খাতির পাইলাম। মানুষ নীল রংএর পাসপোর্ট দেখিয়াই আমাদের সকলের আগে যাইতে দিল। আমাকে লাইনের ভিতর হইতে ওদের লোক ডাকিয়া আনিল। আমাদের মাল ছুঁইলও না। প্রথমেই আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। কাস্টম অফিসার আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া হাসিয়া অনেক কিছু বলিলেন। মানু আমাকে বলিল "থ্যাঙ্ক ইউ" বলুন, "বাই বাই" বলুন। আমিও তাই বলিলাম। তার পর বাহিরে আসিলাম। এখানে খুব শীত। আমরা যে হোটেলে উঠিব সেই হোটেলের বাস প্রতি ১০ মিনিট

অন্তর আসে। আমরা কয়েক মিনিট বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাস আসিল, হোটেলে আসিলাম। বেশী দূর নয়। লণ্ডনের হোটেল আগেই মাধুর নামে ঠিক ছিল। একটি লোক চাবি দিয়া গেল। রাত ১টায় হোটেলে উঠিলাম। এখানে ঘাড় ঘড়ি ঠিক করিয়া নিল। ভারতীয় সময় এতক্ষণ বুঝিতেছিলাম।

হোটেলে উঠিলাম রাত ৮টায় (কলিকাতার রাত ১টা)। উঠিয়া অবাক হই, এ প্রকার হোটেল আগে দেখি নাই। বাবতীয় জিনিষ ঘরে আছে। প্রকাণ্ড খাট, সুন্দর বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ডানলপের গদি ইত্যাদি। ঘরে ফোন, কলিংবেল, টেলিভেসন, চিঠিপত্র লেখার কাগজ খাম। টেবিলে আছে একখানা বাইবেলও।

বাথরুমে সাবান তোয়ালে ইত্যাদি, তো খানিক।

ফোন করিয়া দেওয়া হইল। খানিক পরে সুন্দর খাবার সাজানো একটি ঢাকা দেওয়া টেবিল দিয়া গেল। টেবিলে সব সাজানো আছে, হাত পোছার তোয়ালে পর্যন্ত। খাওয়ার পর টেবিলটা ঘরের এক কোণে রাখা রহিল।

লণ্ডনে রাত তিনটার সময় গৌরীকে মাধু ফোন করিল আমরা লণ্ডনে পৌছিয়াছি সংবাদ দিয়া। গৌরী তখন সন্ধ্যার সময় রান্না করিতেছে বলিল। আমরা ভোরে উঠিয়া স্নান ও সকালের খাওয়া সারিয়া সকালবেলা আবার এরোড্রামে আসিলাম। বেলা ৯টায় প্লেন ছাড়িবে। আমরা বাসে করিয়া এরোড্রামে আসি, রাস্তায় একটিও লোক দেখিলাম না। আসিয়া আবার ট্রলি, চলন্ত রাস্তা, চলন্ত সিঁড়িতে ও চোঙাতে ঢুকিয়া একেবারে প্লেনে, একটুও শীত পাইলাম না। প্লেনের মেয়েরা (এয়ার হোস-টেস) কি তৎপর। ৪০০ লোকের খাবার, জল, ড্রিঙ্ক-যে যাহা চাহিতেছে দিতেছে। খাবার দেওয়া ও প্লেট উঠান মেসিনের মত হইয়া যাইতেছে। ক্ষিপ্রহস্ত কিপ্রকার দেখার মত। আমি ওদেরই চাহিয়া দেখিতাম। একটি মেয়ে বেশ সুন্দরী, অল্প বয়স, বলিল গত রাত্রে ওর বিবাহ হইয়াছে। মনে ধাক্কা লাগিল, আজই ভোরে ডিউটিতে আসিয়াছে!

যাত্রীদের দুপুরে সিনেমা দেখান হইল।

৪০০ লোকের বার বার খাবার কি সুশৃঙ্খল ভাবে আগে দেখিলে অবাক লাগে। যেখানে যেখানে প্লেন থামে সেইখান হইতে খাবার নেওয়া হয় আর পূর্বের উচ্ছিষ্ট প্লেট গ্লাস ফেলা যায়। দেখিলাম একটি লরি আসিয়া প্লেনের গায়ে লাগিল। প্লেন বেশ উঁচু, মাটি হইতে ২৫। ৩০ ফিটের মত উঁচু। যন্ত্রের সাহায্যে গাড়ীখানা উঁচু হইয়া একেবারে প্লেনের গা ঘেসিয়া উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্লেনের খাবার ঘরের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল, ঐ লরিতে ছোট ফিটসেফের মত বহু তাক দেওয়া আলমারী চাকা লাগানো আছে। ঐ সব আলমারীতে সমস্ত তাকে খাবার প্লেটে প্লেটে সাজানো থাকে। নতুন খাবার সাজানো আলমারীগুলি এ প্লেনের কেবিনে আনিয়া রাখা হয়, আর আগের পরিত্যক্ত ডিসগ্লাস সব ফিটসেফে সাজান অবস্থায় ঐ গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়। ৪।৬টি লোক এই সব ঠেলিয়া আনিতেছে ও ফিরাইয়া নিতেছে। সব হইয়া গেলে ঐ লরিখানা আবার নিচে নামিয়া স্বাভাবিক হইয়া চলিয়া গেল।

এইভাবে যাত্রীদের মালও প্লেনে উঠান দেখিলাম। বাসে করিয়া মাল আসিল, বাসটা ক্রেনের মত একটা যন্ত্রের সাহায্যে প্লেনের যেখানে মাল উঠান সেখানে উঠিয়া আসে। প্লেনের গর্ভের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। একটি লোক একে একে সব মাল দাঁড়াইয়া ছুড়িয়া ছুড়িয়া প্লেনে ফেলে। এত কঠিন কাজগুলি যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজভাবে হইয়া যায়।

প্লেন ৯টায় ছাড়িল, এত উপরে উঠিল মেঘ ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। শুনিলাম আটলানটিক মহা-সাগরের উপর দিয়া প্লেন যাইতেছে। সাগরের নীল জল দেখিতে পাইলাম না, কেবল মেঘ, বুনাট করা সাদা মেঘ।

বেলা ৩ টায় ওয়াশিংটন এরোড্রামে পৌছি, বাসায় আসিতে ৪টা বাজিয়া গেল। বাসায় আসিয়া সৌরী, শ্যামলী, দীপালীকে পাইলাম। বাড়ীখানা অতি সুন্দর, সুশোভন, সুন্দর সাজানো দেখিয়া বড় তৃপ্তি ও আনন্দ পাইলাম।

আমেরিকা স্বাধীন হওয়ার ২০০ বৎসর পূর্ণ হইল এ বৎসর, সেজন্য এখানে নানা উৎসব হইবে শুনিতেছি।

ওয়াশিংটন শহরের চারিদিকে একটি নদী বেষ্টন করিয়া আছে, সেই নদীর নাম হইল Potomac। এই রাস্তায় যাইতে ২টি বড় বড় পুল পার হইতে হয়, কি সুন্দর দৃশ্য। জল যেখানে কম সেখানে বরফ হইয়া আছে। রাস্তায় স্থানে স্থানে বরফ জমিয়াই আছে। বাহিরে ভীষণ শীত, কিন্তু শীত বোঝা যায় না, গাড়ীর ভিতর গরম। বাড়ীতেও তাই। সব ঘরেই হীটার দেওয়া।

এই রাস্তাটি শহর বেষ্টন করিয়া আছে বলিয়া এই রাস্তার নাম হইয়াছে "বেল্ট রোড", এই পটোম্যাক নদীর পাশে যে ছোট সহর তাহার নামও হইল পটোম্যাক। Potomac সহর ওয়াশিংটন হইতে ৬ মাইল দূরে। এখানে নভেম্বরের শেষে আসিলাম, তখন দেখা যায় সমস্ত রাস্তার গাছের পাতা নানা রঙে রঙীন হইয়া শোভা করিয়া আছে। কোন গাছের পাতা লাল টুকটুকে হয়, কোন গাছের হলদে, সব গাছের পাতা নানা রং হইয়া গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে। এ সুন্দর দৃশ্য দেখিবার জন্য লোকে বন জঙ্গলে বেড়াইতে যায়। আমরাও গিয়াছিলাম। শীতে প্রথমেই গাছের পাতা সব ঝরিয়া পড়ে। জানুয়ারীর প্রথমে কোন গাছে কোন পাতা নাই, কেবল গাছের শুকনা ডালগুলি দাঁড়াইয়া আছে। কেবল ইউক্যালিপ্টাস গাছ ঘন সবুজ রংএর পাতা বার মাস থাকে, বরফের সময়ও গাছ এক ভাবেই থাকে। তখন এই গাছগুলির ছড়ান পাতার উপর সাদা বরফ পড়িয়া আর এক শোভার সৃষ্টি হয়। ঘন সবুজ পাতার উপর শ্বেত শুভ্র বরফ, যেন গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুল ফুটিয়া আছে পাতায় পাতায়।

এখানে আমাদের দেশের কাউ গাছের মত সরু সরু পাতাওয়ালা গাছ বন জঙ্গল সবখানে। এ গাছের কাঠ নাকি ভাল হয়। এখানে দাঁড়কাক, ছাতারে পাখী, চড়াই জানুয়ারী অর্থাৎ শীতের কয় মাস দেখা যায়। ডিসেম্বরের একদিন দেখিলাম দলে দলে পাখি উড়িয়া যাইতেছে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে। শীত খুব বেশী। শীতের প্রথমে পাখিরা সব অন্য দেশে চলিয়া যায়, আবার মার্চ এপ্রিলে এ দেশে ফিরিয়া আসে। এখানে ওয়াশিংটনে বরফ কম পড়ে। বোষ্টন, সিকাগো, নিউইয়র্ক ইত্যাদি স্থানে বরফ খুব পড়ে। (ক্রমশঃ)

লক্ষীনারায়ণ বাবাজী

(৭৯ পাতার পর)

সে যুগে ঠাড়িদাস বাবাজী বলে একজন ওস্তাদ ছিলেন। তিনি যেমন সুন্দর ধ্রুপদ গাইতে পারতেন তেমনি পাখোয়াজে অপূর্ব সংগত করতে পারতেন। তাঁর সাজ পোষাকও ছিল সাধুদের মত। তাঁর সঙ্গে লক্ষীনারায়ণ বাবাজী ঘুরেছেন বহু স্থানে বহু আসর। সেই সঙ্গে তিনি ঠাড়িদাসজীর কাছে শিখেছেন কখনো পাখোয়াজ আবার প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে সংগতও করেছেন।

সে যুগের ভারতবিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক মুন্নাজান আলি খাঁর সঙ্গে অনেকেই সংগত করতে ভয় পেতেন। কিন্তু লক্ষী-নারায়ণ বাবাজী সেই অপরাজেয় দুর্ধর্ষ গায়কের সঙ্গে অক্লেশে পাখোয়াজ সংগত করে হাজার হাজার সুধীজনের কাছ থেকে সুখ্যাতি আদায় করে ছিলেন।

ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত সারা জীবন সুরের সাধনা করে সুরের মোলায় হাজার হাজার মানুষের মনকে জয় করে, অজস্র ছাত্রকে সংগীত বিদ্যাগের নানা বিষয়ে শিক্ষা দান করে অহংকারশূন্য সদাহাস্যময় বৈরাগী লক্ষীনারায়ণ বাবাজী ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন সুরলোকে অমরধামে। জীবনে তিনি কোনদিন আত্মপ্রচার চান নি। তাঁর কাছে প্রচারের চেয়ে বড় ছিল সাধনা, বড় ছিল সুরের পূজা, বড় ছিল তপস্যা। এই মহান তপস্বী যখন পৃথিবীর খেলা শেষ করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় আশী বছর। আনুমানিক জন্ম সাল ধরে হিসেব করলে মনে হয়, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষে না হয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে লক্ষীনারায়ণ বাবাজী পরলোক গমন করেন।

With best compliments of

UNIVERSAL MACHINE TOOLS MFG. CO.

Manufacturers Of

ABRASIVE CUT OFF MACHINE
AND
SPECIAL PURPOSE MACHINE

City Office

542, BLOCK 'N' (1st Floor) New Alipur, Calcutta-700 053 Phone 45-4654

BEHALA INDUSTRIAL ESTATE Shed No. D.2, Banamali Naskar Road, Calcutta-700 060
Phone 77-1033

With best compliments of :-

Telephones { Head Office : 66-4981 (3 Lines)
Scrap Yard 66-4514 (2 Lines)
City Office 23-6461 (2 Lines)
23-4643

GRAND SMITHY WORKS PRIVATE LTD.

Manufacturers, Importers & Exporters.

Regd. Office & Head Office :
1, GIRISH GHOSH ROAD,
P.O. Belurmath. Dt. Howrah. (India)

City Office :
11, GOVERNMENT PLACE EAST
CALCUTTA-700 069

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নবযুগপ্রেস, ৩৮ শ্রাম : বাগবাজার, পোঃ অশ্বিনী নগর, কলি-৭৭ (ফোন ৫৭-২৫৪০) হইতে প্রকাশিত এবং বিউটিফোর্ড, ১১২/১২ বেলেঘাটা মেইন রোড, কলি হইতে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণে : রেনবো আর্ট প্রিন্টার্স ১৭ এইচ নবিন সরকার স্ট্রীট।

উজ্জ্বল ভারত

বিপ্লবী দার্শনিক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

মূল্য—এক টাকা

যুগ্ম-সম্পাদক—গৌরচন্দ্র

With the best compliments of

35-3004

AMAR INDUSTRIES

Manufacturers of :

VENEER, COMMERCIAL PLYWOOD,
TEA CHEST &
ALL TYPES OF WOODEN PRODUCTS.

8/1/1, GURUDAS DUTTA GARDEN LANE
CALCUTTA-700 067

শিল্পের ভারত

৩য় বর্ষ
৫ম সংখ্যা
মাঘ ১৩৬৮

সূচীপত্র

ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন | পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৮৪

সমস্যার উপায় আকাশে | সম্পাদকীয় | ৮৬

পুরাতন বন্ধুদের শেষ হাত | সুধীর সুধাকর বসু | ৮৭

পত্র | গৌতম চক্র | ৮৭

বর্ষশেষের কবিতা—কুসুম ঘোষ রায় | ৮৭

আজব বর্ষেট | সত্যেন্দু সাহা | ৮৮

সেই রঙ্গুদের মধুর স্মৃতি | স্বপন বুড়ো | ৮৯

এক ঐতিহ্য নদী | নির্মাল্য প্রকাশ ভৌমিক | ৯০

সাহিত্যে স্বদেশ চিন্তা ও সমাজ সেবা | রমেন্দ্রনাথ মল্লিক | ৯৮

মিষ্টাই তার নাম | পরেশ সাহা | ১০২

পুরুষোত্তমানন্দের চিন্তাধারা | ১০৫

দূরের আকাশ | অখিল রঞ্জন রায় | ১০৭

বেশ পরিচয় | চন্দ্রা সাহা | ১১০

মহা বিপদ | বীণাঞ্জন বিশ্বাস | ১১০

আমেরিকা ভ্রমণ | অপরূপা সেন | ১১২

কবিরাজ গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় | আর্যাকুমার মুখোপাধ্যায় | ১১৭

সম্পাদিকা : বেবু মিত্র
যুগ্ম-সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা
মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক : ১২ টাকা (সডাক)

ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন

বড় বড় ছোট ছোট, বড়র উন্নয়নে ছোটর উন্নয়ন হয় না, ছোটর উন্নয়নেও বড়র উন্নয়ন হয় না; সমষ্টির উন্নয়নে ব্যষ্টির উন্নয়ন, ব্যষ্টির উন্নয়নেও সমষ্টির উন্নয়ন হয় না। বড় ও ছোট সমষ্টি ও ব্যষ্টি পরস্পর নিরপেক্ষ ও পরস্পরাপেক্ষ। জীবন যন্ত্রে অংশ অংশী সম্পর্কের পরিপূরক। বৃহদাকার শিল্পের উন্নয়নে যারা এতদিন ক্ষুদ্রকায় শিল্পগুলির ধ্বংস সাধনেই রইয়াছে। বড়র চাপে ছোট এতদিন মরিয়াছে। বৃহৎ যন্ত্র কোনও দিনই ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে নাই, যেমন বৃহৎ ঈশ্বর কোনও দিনই ক্ষুদ্র জীব জগতের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারেন নাই। বেশ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে হিংসা পরস্পর সাড়া ট্রাম, বাস, মোটরের প্রয়োজন বহিয়া গিয়াছে। এমন করিয়া বড় কোনও দিনই ছোটর প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে না, পারিতেছে না। কিন্তু বড়দের দাবী এই যে ও তারাই সমাজের সব কিছু কল্যাণ আনয়ন করিতে সমর্থ; তাই তাহারা ছোটদের পায়ের নীচেই ঘাবাইয়া রাখিয়াছে। ছোটর রক্ত শোষণ করিয়া সমাজের অকল্যাণই করিয়াছে। কাপড়ের কল ক্ষুদ্র তাঁত শিল্পকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে, ধান ভাঙ কল ঢেঁকির প্রয়োজন ফুরাইয়া দিয়াছে। মানুষ এই বড়র মোহে আচ্ছন্ন হইয়া নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারিয়াছে। ট্রাম-বাসের মোহে পায়ে হাঁটা ভুলিয়া গিয়াছে। ঐশ্বর্য চিত্ত মানুষ বড় হইতেই চায়, ছোটর জন্য তাহার কোন দরদ নাই। জীবন-যন্ত্র কিন্তু ছোট বড় সকলের স্বাতন্ত্র্য বিধান করিয়া পারস্পরিক মর্যাদাজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়া উঠিবার জন্যই ব্যস্ত। মৃত যন্ত্র (mechanism) বড়দের প্রয়োজন মিটাইলেই ছোটদের প্রয়োজন আপনা আপনিই মিটিয়া যায়। কিন্তু জীবন-যন্ত্রে (organism) তাহা হয় না। বড়দের পথ ও ছোটদের পথ সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে।.....

বৃহৎ শিল্প কখনও সমতা রক্ষা করিয়া উৎপাদন করিতে পারে না। ফল সে বেশী উৎপাদন করিবে, কম প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পের আত্মনিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা থাকিলেও তাহা নৈরাজ্য। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পরস্পর সংযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিলেই পরস্পর পরস্পরের ত্রুটি দূর করিতে পারে এবং তাহাতেই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ছোট যন্ত্রগুলি নিশ্চিহ্ন হইলে বৃহৎ যন্ত্র নিজের ভারে নিজে অচল হইবে এবং অচল যন্ত্রের চাপে দেশ পিষ্ট হইবে। সমাজক্ষেত্রে হাইড্রোজেন উইবে ছোটরাই বড়দের dynamic force যোগায়। ছোটদের আলিঙ্গন না পাইলে বড়রা আরিকে static করবে, জাতির অগ্রগতি বিরুদ্ধ হইবে।... ...বৃহৎ যন্ত্র মানুষের সহজ ধর্ম কাড়িয়া লয়, কলে পরিণত করে। ক্ষুদ্র যন্ত্র যদি বৃহৎ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে বড়র সেবা করিয়াও মানুষ মানুষ থাকিতে পারে, যন্ত্রে পরিণত হয় না। বৃহৎ যন্ত্রের আবেষ্টন কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বড় বড় কলগুলির মজুরদের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে।...চাই বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

সম্পাদকীয়—

সমন্বয়ের উদার আকাশে

আজ থেকে ১২৬ বৎসর আগে চৈত্র মাসের বাসন্তী অষ্টমীতে আবির্ভাব শ্রীশ্রীবিত্তাগোপালের। কী ছিল তাঁর কথা মানুষের জন্য ?

বর্তমান বিশ্ব জীবনের বিভিন্ন দিকে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে হাবু ডুবু খাচ্ছে। রাজা প্রজার দ্বন্দ্ব, ধনিক শ্রমিকের দ্বন্দ্ব নর-নারীর দ্বন্দ্ব উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণের দ্বন্দ্ব পিতা-মাতা সন্তানের দ্বন্দ্ব মালিক অধীনদের দ্বন্দ্ব, সহর গ্রামের দ্বন্দ্ব, দল মিলার দ্বন্দ্ব, সন্ন্যাস সংসারের দ্বন্দ্ব, আস্তিকতা নাস্তিকতার দ্বন্দ্ব ভক্ত ভাবার দ্বন্দ্ব আদর্শ বাস্তবের দ্বন্দ্ব, লোকোক্ত ইহলোকের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বাস্তবীয় বিপরীতধর্মী দুটি আদর্শের দ্বন্দ্ব নিয়ে আজকের মানুষ দ্বন্দ্বই পড়িছে। শ্রীশ্রীবিত্তাগোপাল এই বিপরীতের দ্বন্দ্বের মীমাংসাকর্তা, সন্ন্যাস এই দুটিকে পরিপাক করে তার বুকে সৎ চিৎ আনন্দের প্রবর্তক।

এতদিনের ব্যবস্থা ছিল এক তরফা—রাজার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রজার বিচার হতো, নরের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর, উঁচুর থেকে নীচুর, সহরের থেকে গ্রামের, সন্ন্যাসের দৃষ্টি-কোণ থেকে সংসারের, আদর্শের থেকে বাস্তবের। কিছুদিন থেকে এক তরফা বিচার ধারার, one way traffic-এর অবসান হতে চলেছে। অপর পক্ষ তার দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার দাবী করছে। দুই বিপরীত আওয়াজ ঘোষণা করে বসে আছে। সারা সমস্ত দ্বন্দ্ব এই দুই চাওয়ার মধ্যে। এরা মিলতে পারছে না। মেলবার জন্যে দুই-এর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে কেননা দুইয়ে মিলেই একটা সমগ্র বাস্তব বস্তু এবং দুইয়ে না মিললে কোন বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এতদিন এক একের মধ্যে আর একটিকে বিশ্লেষে মুছে একটৈক্রিক একটা সমাধান চলছিল। তাই রাজার অনুসরণ করত প্রজা, ধনিকের অনুসরণ করত নির্ধন, নরের অনুসরণ করত নারী, রাজার অনুসরণ করত রাজা। কিন্তু এটাকে উল্টে দিলেই তো আর সত্যিকারের সমাধান হল না। একের স্থানে অপরে বসেছে বটে কিন্তু তাতেও সকল মানুষের জীবনের বঞ্চনা বা নিপীড়ন বন্ধ হয় নি। অধিকার পেয়ে সে অপরের অধিকার ও মর্যাদায় হানি করতে উদ্যত। বিধাতা কিন্তু প্রত্যেককে স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্যাদার সৃষ্টি করেছেন, তাই দুইকে তার যথা স্থানে ও যথাস্থানে রেখেই বিপরীত দুই এর সংস্থানে এক সমগ্র বাস্তবিকতার সৃষ্টিই তাঁর বিধান। শ্রীশ্রীবিত্তাগোপাল স্বার্থকভাবে এটুকু প্রত্যাশা করতেই কসুর করেন, নিম্ন অধিকার সমন্বয় বা আত্মা অনাত্ম সমন্বয়। জ্ঞান অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সাকার সমন্বয়। জড় অজড় সমন্বয়। চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়।

এতদিনকার নিপীড়িত বঞ্চিতদের মর্যাদা তিনি শুধু কাগজে কলমে রেখে যান নি তাঁর সারা জীবনের আচরণে তা রেখেছেন। জীবনভর পতিত কুলীন ধনীর সংসর্গ এড়িয়ে সমাজে যারা পতিত নিম্নশ্রেণী ইতরাদি অখ্যাত আখ্যাত সেই সব একেবারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি জীবন কাটিয়েছেন তাদের এগোবার সবের করা যাবে চেষ্টা দিয়ে। একটা বিরাট সব আন্দোলনের বীজ তিনি রেখে গেছেন সেই সময়েই কিন্তু চেষ্টা একে অতিক্রম করে একের প্রতিষ্ঠা নয়।

শ্রীশ্রীবিত্তাগোপাল সব সাধারণের হয়ে সব মতবাদেরও। আমরা যার যার পছন্দমত একটা চিন্তাধারা আঁকড়ে ধরি, অন্যগুলিকে কেবল বাদই দেই না, অ-তাই বলিয়া তাই নিয়ে গুঁতোগুতিও করি। কিন্তু আমার অন্যের উপলব্ধি যদি সত্য হয়, আপনারটা সত্য হবে না কেন ? আপনার মত আপনার, আমার মত আমার—এই মত সাধুতাতে মিলন হয় না। শ্রীশ্রীবিত্তাগোপাল সকলের উপলব্ধি মিলতে পারে এমন একটা স্তরের সবর রেখেছেন। বিশেষ আমরা বলে কেউ বা কোন উপলব্ধি সর্ব দেশ কাল পাত্রে সত্য ও মূল্য বলে পরিগণিত হওয়ার বিশেষ ঐকান্তিকতা বিত্তাগোপাল স্বীকার করলেন না। সর্ব মতবাদের মধ্যে তিনি সর্ব সাধারণের।

বিশ্ব জোড়া আজ সংঘর্ষ—এই দিনে সত্যিকারের মিলন হতে পারে যে ব্যাপকতা ও গভীরতার মধ্যে শ্রীশ্রী-বিত্তাগোপালের কাছে তাই পেয়েই তাঁকে আজ তাঁর আবির্ভাব দিনে প্রণতি জানাই—মানুষের মধ্যে তাঁর ব্যাপকতা ও গভীরতা আরুক। যে সৌন্দর্য মানুষ হারিয়ে ফেলেছে বা খুঁজে খুলতে পারেনি তার ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের মধ্যে এই বিপরীত সমন্বয়ের উদার আকাশে তাই প্রকাশিত হোক।

কবিতা

পুরাতন বছরের শেষরাত

মহীন সুধার বসু

পুরাতন বছরের শেষ রাত আজ
আগামী দিনের-কত মাঙ্গলিক কাজ
প্রয়োজনের চিত্রে শুভ্রালোপাত
কতজন পরিচিত আত্মীয়
পরিচিত সাথে প্রীতি বিনিময়
প্রতিবেশীর কুশলালাপে কিছু কাল ক্ষয়
এমনও আয়োজন, প্রস্তুতির পর্বে
বিদায়ের রাত্রি যায় উৎসব আত্মীয়তা গর্বে।
আগামী কল্য নব বর্ষের মাঝে
জীবনের পরে কদলীর বড়া পরমাণে
বিরাট উল্লেখ আছে।
সেই নবীন বর্ষে শঙ্খ বাজে।
এ মুহূর্তে অ ধর্মিণী বধূরূপে যাঁর
নম্রনত ব্রীড়ামুখী প্রবেশ উদ্বার
আজ তিনি পুরাতনী
প্রবীণা গৃহিনী
আহার আসনখানি—মর্যাদায় উঁচু
বর্তমান নবীনে সমাদর তাঁর ;
হাসিমুখে আশীর্বাদে পুরাতন যায়
নূতনকে হাতে ধরে বরণ জানায়।

পত্র

গৌতম চক্র

মনের কোণে হঠাৎ আকুলতা
একটি প্রাণের হঠাৎ ব্যাকুলতা
হঠাৎ ভীষণ কষ্ট,
যখন কাউকে যায় না বলা
আশাকাশে একই সাথে চলা
তোমায় পড়ে মনে,
অশ্রু সজল নেত্রে
তোমার কাছে পাঠাই আমি
ছোট্ট একটি পত্র।
আশা! আছে বেঁচে, শুধু একটি উত্তর।
ওটাই তো ভাবো,
রাতে রাতে অপেক্ষা করা
বিষাদটুকু মনের কাছে
এক বিন্দু মরো।

বর্ষশেষের কবিতা

মুকুল রোজ রায়

অন্ধকারের বুকের ভেতর
উঠছে জেগে অতল আলো,
আগত ঐ নতুন ভোরে
ঘরে ঘরে মঙ্গল তোরণ।
পরাজয়ের পাল খাটিয়ে
আজ হে তারে মুক্ত ঢেউ—
অবহেলায় ডিঙিয়ে তোমায়
এমন সময় আসবে না কেউ!
আজ এবং সৃষ্টি নিয়ে
নতুন কিছু ভাবতে হবে,
দুঃখ প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে
ঝলমলে রোদ হাসবে তবে।

আজব ধর্মঘট

শরদিন্দু সাহা

কিছুদিন পূর্বে কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এর কর্মীরা তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য যে অভিনব কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন এদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সেটা অবিস্মরণীয় নজীর হয়ে থাকবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কর্মিরা হাতে কালো ব্যাজ এঁটে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের ওপর এক ঘন্টা বেশী কাজ করবেন। অথচ অতিরিক্ত বাড়তি কাজের জন্য বেতন দাবি করবেন না।

যে দেশে কাজ না করে অথবা মন্থর গতিতে নাম মাত্র কাজ করে পুরো বেতন আর উচ্চহারে বোনাসের দাবিতে ধর্মঘটের মাধ্যমে মালিক পক্ষকে সায়েস্তা করার হেডরাজ সেখানে ওপরে বর্ণিত নজিরটি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে বৈ কি। এটা কটু শ্রেণী সংঘাতের মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অহি-নকুলের সম্পর্ক কায়েম হওয়ার পথ নয়। বরং মালিকের চেতনায় বিবেক ও মানবিকতা বোধের উন্মেষ ঘটিয়ে দাবি পূরণের এমন একটা কৌশল যার মধ্যে প্রতিপক্ষের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষের স্থান নেই। আজকের দিনে এটা আজব মনে হলেও ভাবী কালের সভ্যতর সমাজ ব্যবস্থায় অহরহ ঘটানোই হয়তো বিরুদ্ধমান পক্ষের যুদ্ধের পরিবর্তে না ঘটিয়ে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মিলন ঘটানো সম্ভবপর হবে। এটা সংঘর্ষের পথ সংগ্রামের পথ নয়। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অহি-নকুলের সম্পর্ক বজায় রেখে যেটা হোরেই সম্ভব নয়। কেন না ঘৃণার বীজ বুনে শান্তির ফসল তোলা যায়না।

প্রসঙ্গত কয়েক বছর আগে একটি বিলাতি পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি আজব ধর্মঘটের নজির এখানে পরিবেশিত হোল।

ফ্রান্সে একটি পানশালায় বাড়তি মজুরীর দাবিতে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ধর্মঘটের ধোকা বিলায় নতি স্বীকার না করে চতুর মালিক পানশালার দরজা বন্ধ রেখে খিড়কির দরজা দিয়ে অল্পে অল্পে খদ্দেরদের নিজহাতে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। এভাবে পুরাপুরি আয়ের অভাব থাকলেও বেশাখোরদের কাছে লুকিয়ে বেশী করার একটা দুর্বার আকর্ষণ থাকে। এর ফলে এখানে মাতালদের ভীড় এমন ভাবে বেড়ে যায় যাতে শ্রমিক ধর্মঘট মালিকের পক্ষে লাভের বর হয়ে দাঁড়ায়। সেখান পথে ব্যবসা চালিয়ে মালিক প্রচুর মুনাফা করতে থাকেন। অপর দিকে কর্মীদের সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তারা ধর্মঘট তুলে নেয়। ফলে মালিক বেকায়দায় পড়ে কর্মীদের দাবি মেনে নিলেন একটা শর্তে। তা হোল পানশালার দরজা যেমন বন্ধ আছে সেভাবেই থাকবে। কর্মীদের ধর্মঘট যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে। কর্মীরা বাড়তি বেতনও পাবে। এটা যে আজব ধর্মঘট সেটা বলুন করতেই হয়।

ইতালীর একটা হোটেলে একবার প্রচুর লাভ হয়। মালিক স্বভাবে উদার ভাবে এক ঘোষণা। তিনি যেটা ভাল বুঝবেন তার ওপর কথা চলবে না। অভাবিত মুনাফা হওয়ায় খুশী মালিক কর্মীদের বেশ মোটা হারে মজুরী বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। না চাইতেই এ ভাবে বাড়তি বেতনের প্রস্তাবে তারাও মহা খুশী। কিন্তু পরে তারা ভেবে চিন্তে তাদের পক্ষে প্রস্তাবে জানায় মালিকের প্রস্তাবিত উচ্চহারে বেতন বৃদ্ধি না করে কর্মীদের অপেক্ষাকৃত কম হারে মজুরী বাড়ানো হোক। হোটেলের অভিত মুনাফা থেকে একটি বিশেষ তহবিল গড়া হোক যার সাহায্যে ভবিষ্যতে প্রতিযোগীতার মোকাবিলায় হোটেলটি টিকে থাকবে আর কর্মীদের চাকুরী বহাল রাখা সম্ভব হবে। কিন্তু মালিক তার প্রস্তাবে অনড় থাকায় কর্মীরা ধর্মঘট করে বসে। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখ নজির হয়েছে।

তৃতীয় আজব ধর্মঘটের যে কাহিনী বিদেশী পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছে সেটা আরেকটি ঘটনা। এদেশে বিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট কিছু বিরল ঘটনা নয়। কর্তৃপক্ষের আচরণে বিক্ষুব্ধ বিদ্যার্থীরা বিদ্যালয়ে গড় হাজির হয়ে প্রতিবাদ জানায়। যে বিদ্যালয় বর্জনের ভাগ্যে ছাত্ররা মাসের পর মাস নিজের পকেট থেকে নিয়মিত বেতনের মাসুল দিয়ে বিদ্যালয়ে পড়তে যায় সেখানে অংশ গ্রহণ থেকে তাদেরই জ্ঞান বর্জনে বাধ্য হয়। অথচ বিদ্যার্থীদের এরূপ আত্মঘাতি বিদ্যালয় বর্জনের ফলে শিক্ষকরা সবেতন ছুটি ভোগ করার সুযোগ পেয়ে যাবেন। কর্তৃপক্ষেরও কিছু মাথা কাটা যায় না। অমন ধর্মঘট আমরাও নিজের মাথা কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের মতোই উদ্ভট নয় কী? তবু হামেশাই এরূপ ধর্মঘট এদেশে হয়ে থাকে। কী বিচিত্র এই দেশ!

Wanted Graduates on Attractive commission and salary, who can collect advertisements for

Directory of Industries (yearly) Rs. 150/- each

2. Import Export (monthly)magazine Rs. 5/-

Annual Subscription Rs. 60/-

3. Indian Product (monthly) paper Rs. 5 - each

Three years subscription Rs. 125/-

CONTACT FOR PROSPEROUS FUTURE

WORLD DIRECTORY PUBLISHERS

D E L H I - 3 3

Gram DIRECTORY

Phones : 71-7080,
717274,
71-0012

The New **M.S.A.** BRITELITE

MINERS ELECTRIC CAP LAMP

Manufactured in India by **M.S.A.**
and designed specifically for
your Mining Operation.

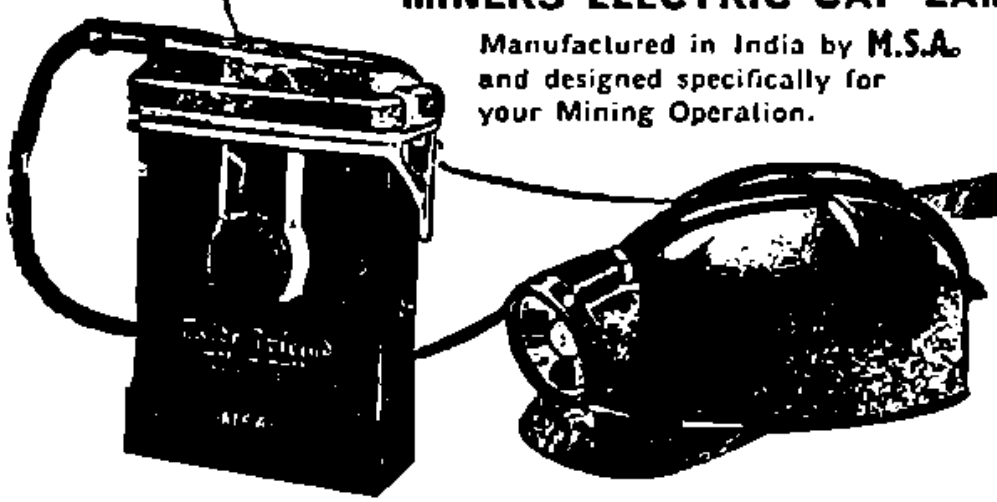

M.S.A.

Mine Safety Appliances Limited
240E, Acharyya Jagadish Bose Road, Calcutta-20

'মনে করো, জুতো হাঁটছে পা রয়েছে স্থির.....

সে বড়ো সুখের সময় নয়'

লেখক বলেন, আমরাও বলি! কারণ, জুতোর সঙ্গে পায়ের কোনরকম ঝগড়াই আমরা হতে দিতে পারিনা! সেজন্যই আপনার মনোমত, রুচিমাফিক, হালফ্যাশানের জুতোর জন্য সর্বদা বাটায় আসুন!

Bata

With best compliments from ;—

M/s. Popular Engineering Works

Automobile Engineers and Consultants

C/o BEAUTY SHOE STORE

1, M. B Road, Calcutta 700 056

Phone : 23-9282

LILY TRADING CO.

27 B, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA-700 013

Manufacurers of :

ALL TYPES OF WIRE NETTING,
CHAIN LINK FENCING,
GARDEN FENCING
AND
ALL TYPES OF WIRE PRODUCTS

With best compliments from :

Phone : 27-0070 (Office)
77-6411 (Works)
42-6648 (Residence)

Gram : TECHSERVE

NANDA MILLAR CO.

10, FHEARS LANE, CALCUTTA-700 012

Manufacturers of Minning Equipments and Civil Construction Equipments
including Scaffold Fitting, Double Coupler, Swivel Coupler
Expension Pin, Base Plate, Putlog Coupler etc.

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[বারো]

কলেজে ঢুকে ভেবেছিলাম—

জীবনটা একেবারে পালটে যাবে।

নতুন ধরণে চুল ছাঁটাই হবে—

নতুন কায়দায় জামা তৈরী হবে—

কলেজের নতুন ছেলেরা সিগারেট ধরানোর দীক্ষা নেবে! কিন্তু আসলে কিছুই হল না।

সেই ঘোর-বড়ি পাড়া, আর পাড়া-বড়ি-ঘোর! এর চাইতে ছটিশের ছেলেদের মধ্যে অনেক বেশী ফ্যাসন-দুরস্ত বাবু লোক ছাত্র ছিল।

সেখানে বড়লোক ছেলেদের আরো বেশী আনাগোনা। অবশ্য বড়্যা ক্যাপানের সার্ট অনেক পরে এসেছিল—কিন্তু বড়লোকের ছেলেরা অনেকেই ইস্কুল থেকে সিগারেট টানতে সুরু করেছিল।

কাজেই নতুন করে কলেজে গিয়ে রোমাঞ্চ বা চমক বিশেষ কিছু ছিল না। অন্ততঃ আমি পাই নি।

ছটিশে অনেক বড়লোকের ছেলে গাড়ীতে চেপে ইস্কুলে আসতো। দুপুরবেলা আবার গাড়ী আসতো— দুধ আর টিফিন নিয়ে। সঙ্গে কি বা চাকর।

আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলের দল অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতাম!

মাঝে মাঝে ঘাসোয়ালের চোখ এড়িয়ে ঝালছোলা কিম্বা "বুড়ীর মাথার পাকা চুল" কিনে খেতাম!

অবশ্য যদি দৈবাৎ পকেটে পয়সা থাকত।

কলেজে আবার বিধি-নিষেধের বালাই ছিল না। পকেটে পয়সা থাকলে—যা খুশী কিনে খাও—চা-টোষ্ট-ডিম থেকে সুরু করে সিগারেট অবধি।

আমাদের কিছুই খাওয়া হত না—রেস্তর অভাবে। অনেক নতুন বন্ধু এগিয়ে এসেছিল—সিগারেট ধরাবার জন্য।

কিন্তু ও-বলে বলিত গোবিন্দ দাস! সিগারেট কোনো কালেই খেতে পারি নি।

আজ প্রায় ৮০ বছরে পদার্পণ করে হিসেব মিলিয়ে দেখছি—জীবনে এই হিসেবে বহু টাকা বেঁচে গেছে! কোনো সিগারেট পোড়াই নি।

সিগারেট খাই নি বলে অপর কোনো বন্ধুকেও খাওয়াতে হয় নি।

কাজেই বেশ কিছু টাকা বেঁচে গেছে জীবনে। আজকাল শুনতে পাই—

কলেজের বন্ধুদের বদ্যালো পানীয় খাওয়াতে না পারলে নাকি ইজ্জৎ থাকে না!

শুধু বন্ধুদের নয়,—বান্ধবীদেরও।

আমাদের কালে এই কলকাতার বুকে বসেও এই সব কথা চিন্তা করাও অভাবনীয় ছিল। দল বেঁধে সিনেমায় যাওয়া, আর রেষ্টুরেন্টে যাওয়া? সেটাও প্রায় অসম্ভব ছিল।

পকেট যে একেবারে গড়ের মাঠ থাকতো। কোনো কোন দিন ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে "গুলিয়া" খেয়েছি বলে মনে পড়ে!

সেটাও ছিল পালা পার্বণের মতো ব্যাপার! তাছাড়া ছটিশ ইস্কুলের সঙ্গে যদি সিটি কলেজের তুলনা করা যায়—তা হলে ওই নামেই শুধু কলেজ।

আসলে ওটা ছিল হরি ঘোষের গোয়াল! বড় বড় কামরা অবশ্য ছিল—

নইলে রাশি রাশি ছাত্র ভর্তি করা চলে না! [illegible] বেঞ্চ গুলোর কোন বৈশ্য ছিল না!

যেন ঘটা করে ছেলেদের বসতে দিচ্ছে! তবে সিটি কলেজে এসে একটি লাভ হল—একটি মনের মতো বন্ধু জুটে গেল—যার মন দেশী-বিদেশী সাহিত্যে একেবারে চুট-টুম্বুর।

ওই বয়েসে অনেক রকম বই পড়ে ফেলেছে! পরবর্তী জীবনে যে 'কল্লোল' কার্যালয়ে একটি সুস্থ স্বরূপ ছিল—

আর বেতারে ছোটদের 'দাদুমণি' হয়ে শিশু-কিশোরের অন্তর জয় করে নিয়েছিল।

এই ছাত্রটির নাম নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নৃপেন এক একদিন এক এক রকম খবর নিয়ে এসে কলেজের পেছনের বেঞ্চে আসর জমাতো।

কোনো দিন বলত, এক নতুন কবির উদয় হচ্ছে। সেই উদীয়মান কবি বর্তমান সব কবিকে ছাড়িয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার কবিতা আবৃত্তি করে আমাদের শোনাতো।

আমরা নৃপেনকে ঘিরে এক সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে তুললাম।

প্রফেসর কি বলছেন, সে দিকে আমাদের কান কিম্বা দৃষ্টি থাকত না। আমরা নিজ-সাহিত্য নিয়ে মেতে উঠতাম।

একদিন নৃপেন বিদ্রোহী কবির 'বিদ্রোহী' কবিতা আমাদের আবৃত্তি করে শোনালো।

আমরা সেই কবিতা শুনে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।

এই নবীন কবি মুক্ত থেকে ফেরৎ এসেছেন। সেখানে হাবিলদার হয়েছিলেন।

এখন মুখে মুখে কবিতা রচনা করছেন। এই কবি নাকি গান রচনা করে তাতে নিজেই সুর বসাতে পারেন।

নৃপেনের মুখে এই সব মুখরোচক সাহিত্য-সন্দেশ অবগত হয়ে আমরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমাদের কলেজের পড়াশোনা শিকেয় তোলা রইল। প্রফেসর আসছেন—যাচ্ছেন—সেদিকে আমাদের বিন্দু মাত্র দৃষ্টি নেই। আমরা সাহিত্য ও কাব্যের অতল সাগরে সাঁতার কেটে বিমল আনন্দ লাভ করতে লাগলাম।

রবীন্দ্রনাথ "বৈকুণ্ঠের খাতা" নাটকে এক জায়গায় বলেছেন, "সাহিত্যের কামড় না, কঞ্জুষের কামড়। একবার ধরলে আর ছাড়ান নেই।"

আমাদেরও তখন সেই অবস্থা।

পড়াশোনা চুলোয় গেল—

পাঠ্যপুস্তক পড়ে রইল এক পাশে—

আমরা কয়েকটি বন্ধু এই সাহিত্য চর্চা নিয়ে মেতে রইলাম। ফলে কলেজের সিরিওডিক্যাল পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়তে লাগলাম।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় একেবারে বিফল মনোরথ হতে হল না!

২য় বিভাগে আই. এস. সি. পাশ করে গেলাম। বোটানি বিষয়টিও শেষ পর্যন্ত ছিল—হাতের পাঁচ হিসেবে।

এই ব্যাপারে আগ বিটিয়ে ছবিও এঁকেছিলাম।

কিছুদিন বাদে অপর একটি খবর পেয়ে রীতিমত হক্‌চকিয়ে গেলাম।

আমার মামার বাসায় থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ জানতে পারলাম, মামা কলকাতা ছেড়ে ঢাকা চলে যাবেন। কলকাতার খরচ নাকি খুব বেশী। তাই ঢাকা থেকে কব্‌রেজী চিকিৎসা করবেন।

এখন থেকে আমাকে মেসে কিম্বা হোষ্টেলে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

কোনদিন বাড়ী ছেড়ে থাকি নি। তাই খবরটা শুনে বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে পড়লাম।

তাই ত। কোথায় যাবো কোথায় থাকবো! অবশেষে বৈঠকখানা রোডের একটা মেসে স্থান সংগ্রহ করা গেল।

এইখানেই অস্থায়ীভাবে আশ্রয় লাভ করলাম। এই মেসেই আলাপ হল—তুলসীদাস [illegible]র সঙ্গে। এই সময় তিনি ল' কলেজের ছাত্র ছিলেন, এবং অবসর সময়ে এস্রাজ বাজিয়ে সকলকে আনন্দ পরিবেশন করতেন।

অবশ্য পরবর্তী জীবনে তিনি খ্যাতিমান কৌতুক অভিনেতা হয়েছিলেন এবং আরো পরে নাট্যকার হয়ে বহু

নাটক রচনা করে বহু বন্ধুকে নতুন ভাবধারার প্রবর্তন করেছিলেন।

পরবর্তী জীবনে তাঁর সঙ্গে সখ্যতা আমার আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আমি যখন কর্মক্ষেত্রে রূপবাণী সিনেমার প্রচার-সচিব, —সেই সময় তাঁর পরিচালিত "রিক্তা" ছবি আমার হাতে দিয়েই 'রূপবাণীতে' মুক্তিলাভ করেছিল।

অবশ্য এ ঘটনা বহু পরে ঘটেছিল।

বৈঠকখানার মেসে আমি বেশী কাল ছিলাম না।

ইতিমধ্যে আমি স্থির করে ফেলেছিলাম যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আর পড়াশোনা না চালিয়ে—আর্ট স্কুলে চৌরঙ্গীতে ভর্তি হবো এবং ছবি আঁকা শেখায় আত্মনিয়োগ করবো।

আর্ট স্কুলে ভর্তি হলাম, আর আর্ট স্কুলের ছাত্রাবাস —৩৪, কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে একটি সিট্ দখল করে সেইখানেই একেবারে কায়েম হয়ে বসলাম।

যাদুঘরের পাশে আর্ট স্কুলে সরকারী ছবি আঁকার বিদ্যালয়।

সেখানে পার্শী ব্রাউন অধ্যক্ষ।

আমরা যে সময় গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হলাম—সেই সময় যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় সহকারী অধ্যক্ষ। কপি ক্লাসের টীচার অবনীবাবু। তাঁর ক্লাসেই আমি প্রথম ভর্তি হলাম।

এই অবনীবাবু আমায় খুব স্নেহ করতেন এবং যত্ন করে ছবি আঁকা শেখাতেন।

তিনি শোভাবাজার রাজবাড়ীর ছেলে ছিলেন এবং দীর্ঘকাল আর্ট স্কুলে মাষ্টারী করেছিলেন।

অবনীবাবুর কাছে আমি ভালো করে ছবি কপি করা শিখতে লাগলাম।

আমাদের ছাত্রাবাস—তখনকার কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে ছিল একথা আগেই বলেছি। এখন নতুন নাম হয়েছে এস. এন. ব্যানার্জী রোড।

আমাদের এই ছাত্রাবাসটি ছিল যেন চিড়িয়াখানা। কাশ্মীর থেকে শুরু করে সুদূর আসাম থেকে পর্যন্ত ছাত্র আসতো ছবি আঁকা শিখতে।

এইখানে বহু বিচিত্র ধরণের ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাতে জীবনের চলার পথে বহু অভিজ্ঞতা আমার সঞ্চিত হয়েছিল।

এইখানেই আমি বন্ধুরূপে পেলাম শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তী, রবি দাসগুপ্ত, ফণী গুপ্ত, কিশোরী ব্যানার্জী, চারু সেন, উপেন ঘোষদস্তিদার, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে—

এই আর্ট স্কুল ছাত্রাবাসটি ছিল যেন একটি চিড়িয়াখানা একথা আগেই বলেছি।

ছাত্রাবাসে তখনো বিজলি বাতি আসে নি। কাজেই সন্ধ্যা হলেই এক একটি ঘর থেকে বিচিত্র ধরণের সব সুর-গুঞ্জন উঠত।

কোনো ঘরে বেহালা বেজে উঠত—

কোনো ঘর থেকে শোনা যেত এস্রাজের আওয়াজ—

কোনো কামরায় বাঁশের বাঁশী সুরের ঢেউ তুলতো! আবার আরো মজা আছে—

একটি ঘরে নাটকের রিহার্সেল বসে যেত। শিল্পী চারু সেনের এ ব্যাপারে ছিল দারুণ উৎসাহ। তাই অন্ধকারের মধ্যেই আমরা যে কত নাটকের মহলা দিয়েছি, সে কথা ভাবলে, আজ বুড়ো বয়সে হাসি সম্বরণ করা শক্ত হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত অভিনীত হল দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির নাটক— "বিরহ"।

তাতে সোলাপীর ভূমিকায় শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তী যেচে গেয়ে একেবারে মক্ষ 'মাৎ' করে দিল।

তার মুখের সেই মজাদার গানটির কথা আজও ভুলতে পারি নি!

"যা লে মেরা মিঠা মিলি—

মেরি সাথ্ বৈঠকে হিঁয়া নিরিবিলি॥"

এই গান শুনে রকমান ষ্ট্রীটের ওস্তাদরা মনে করলে, আমরা বাঈজী এনে নাচাচ্ছি। তাই ওরা ঢোকবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড!

আমাদের কটক ভেঙে কেলে আর কি !

আমাদের ছিল এক হিন্দুস্তানী পাচক ঠাকুর। অসীম তার গায়ের জোর।

সে একাই এক রকমান ষ্টীটের গুণ্ডাদের মহড়া নিলে।

কী দারুণ উত্তেজনা সে রাত্রে !

সেই রাত্রে আমরা কলকাতার বহু নামকরা শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

আমাদের অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন ত ছিলেনই ! তা ছাড়া আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভবানীচরণ লাহা, পি. ঘোষ, হেমেন্দ্র মজুমদার, যামিনী রায়, ডাক্তার পি. মল্লিক, পরেশ মজুমদার, সতীশ সিংহ প্রভৃতি।

যাই হোক্—কোনো রকমে ত' আমাদের ইজ্জত রেখে দেন !

এই রকম নাট্য-প্রচেষ্টা আমাদের প্রায়ই হোতো। আমাদের ছাত্রাবাস সংলগ্ন একটি ছোট মাঠ ছিল। সেইখানে ছাত্রেরা রোজ সকালে ব্যায়াম করত। আর নাটক অভিনয় করতে হলে—এইখানেই মঞ্চ বাঁধা হত।

বিশেষ করে ফোল্ডের সময় আমাদের নাটক মঞ্চস্থ হত। সে সব কী উত্তেজনার দিনই গেছে !

এই বিচিত্র চিড়িয়াখানায় আমরা কিন্তু মনের আনন্দে বসবাস করতাম। নানা ভাষার কিচির মিচিরের মধ্যে।

যেন এক বিরাট বটবৃক্ষে নানা জাতীয় পাখী এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সকাল হলেই তারা যে যার পথে উড়ে যাবে। এ শুধু রাত্রিবাসের আনন্দ !

কাশ্মীরের ছেলে ৩টি কম কথা বলত। তারা হয়ত নিজেদের ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের দেবতা বলে মনে করত। তাদের পোষাক-আষাকও ছিল অন্য রকম। আসামের প্রদীপ বড়ুয়া আমাদের সুন্দর বাঁশী বাজিয়ে শোনাতো। প্রদীপ বড়ুয়া আবার সুন্দর কটো তুলতে পারত। ছাত্রাবাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কটো তুলতো।

গোস্বামীবাবু বলে এক বয়স্ক শিল্পী ছিলেন খুব কাজের লোক। পরে তিনি রেঙ্গুনের ডুমিং টিচার হয়েছিলেন।

সরস্বতী পুজোর দারুণ ভোজে এই গোস্বামী ট্রেনে গোয়ালন্দ চলে যেতেন—পাকা রুই আহরণ করতে। দারুণ ভোজ হত আমাদের ছাত্রাবাসে। তাতে অনেক শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো হত। বিরাট ধুম ধাম ব্যাপার।

"সর্ব শুক্লা সরস্বতী" এই ছাত্রাবাস থেকেই রূপলাভ করেছিল। সে সব কাহিনী পরে বলব।

[চলবে]

নরনারায়ণ আশ্রম রচিত গ্রন্থাবলী ফোন : ৫৭-২৫৪০

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

ব্রহ্মসূত্র তিনখণ্ডে	২৬·০০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০
শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৪·০০
ঈশোপনিষদ্	৩·০০
কেনোপনিষদ্	২·০০
কঠোপনিষদ্	৫·০০
প্রশ্নোপনিষদ্	২·০০
ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	২·০০
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	৪·০০
তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৪·০০

৺প্রতিভা রায় রচিত

১। নারীপ্রগতির অন্তরায়

২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

রেণু মিত্র রচিত

১। সমন্বয় মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল

২। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

৩। রবীন্দ্র ছন্দ

৪। প্রাথমিক শিক্ষা

নরনারায়ণ আশ্রম

রাওইআটি / পোঃ- অশ্বিনীনগর / কলিকাতা-৫৯

প্রাপ্তিস্থান :- ইণ্ডিয়ান সাবসিডিয়ারী, ২৫/২৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

॥ ছোট গল্প ॥

এক ফোঁটা নদী

বিমলাপ্রসাদ ভৌমিক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু যাবেন বললেই কি আর যাওয়া যায়? গত ছয় বৎসরে চিন্তা ধারায় তিনি যে পুরণো পরিকল্পনা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। তখন লণ্ডন, পশ্চিম বার্লিনে যে বন্ধুদের উপর নির্ভর করে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তারা এখন কোথায় আছে কে জানে। আর টাকা? বেশ মোটা টাকা যৌতুকস্বরূপ দান করেছিলেন শ্বশুরমশাই উনি বিলেত যাবেন বলে, তা সে টাকার সামান্য অংশই অবশিষ্ট। তবে?

কিন্তু তখন তার ব্যগ্র তাড়িত অবস্থা—মরিয়া হয়ে অতীতের সব জায়গাগুলোতে অতি দ্রুত যোগাযোগ করলেন এবং আশ্চর্য্য, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উৎসাহ-ব্যঞ্জক সম্মতিসূচক জবাব পাঠাল, সংক্ষেপে, জীবন-নাট্যমঞ্চ যেন নূতন দৃশ্য উন্মোচনের অধীর আগ্রহে উদগ্রীব—শুধু যবনিকা উত্তোলনের প্রতীক্ষা। ঠিক ত্রিশ দিনের মাথায় সম্পূর্ণ কার্য্যসূচী ও যাত্রার দিনক্ষণ স্থির হল এবং অশোকের চেষ্টায় টাকারও।

অবশেষে তিনি কলকাতা থেকে বিদায় নিলেন। অরুণ চাটুয্যে নিয়ে কানপুরে—অলি মলিও বাইরে; কাকেও জানানো হলো না। তিনি চলে যাচ্ছেন—বিদায় নিচ্ছেন সম্ভবতঃ চিরদিনের জন্য।

কি সৌরভহীন, কি উৎসবহীন সে বিদায়। পুষ্পস্তবকে রচিত হল না কোন প্রীতির স্মৃতি, কোন আকুলিত, আয়ত আঁখি হতে উদ্গীত হল না বিদায় গীতি। মথিত, উদ্বেলিত কোন নীলকিনীর হৃদয় হতে উৎসারিত দীর্ঘশ্বাসে ভারী হল না আকাশ ও বাতাস। শুধু মা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন: যাবখানে থাকিস, ভালো থাকিস।

তীব্র গর্জ্জনে ফুলতে ফুলতে বিদেশী বিমান যখন মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠছে তখন বিমান-বন্দরের লাউঞ্জে একেলা দাঁড়িয়ে অশোক, ধীরে ধীরে সাদা রুমাল নাড়ছে। ওর চোখ কি বাষ্পাকুল হয়েছিল? কে জানে।

তারপর কত কাল কেটে গেল। কত দিন, কত মাস, কত বছর। প্রথমে কিছুদিন তাঁর জীবন থেমে থেকেছে। তারপর চিত্ত-বৈকল্য কেটে গেলে তিনি আকণ্ঠ ডুবে গেছেন কাজে ও পাঁড়িতে। অজানা কত জ্ঞান ভাণ্ডারের সিংহ-দরজা ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়েছে ওর দৃষ্টির সম্মুখে। ঘুরেছেন, কত দেশ কত জনপদ। কত বিদ্যা কুড়োলেন, কত সম্মান। কিন্তু শান্তি পেলেন কৈ? নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মাঝে মাঝে ভেবেছেন আমাদেরএই জীবনের মানে কি? একে প্রকৃতিতে কার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মনে হয়েছে জীবনের যেন কিছু মিল রয়েছে আঁকাবাঁকা প্রবহমান নদীর সঙ্গে। এর নিরবধি প্রবাহ, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণি, জোয়ার-ভাঁটা, সহসা দিক্-পরিবর্ত্তন এ সবই যেন জীবনের দ্যোতক। যদি তাই, তাহলে তাঁর জীবন-নদী এমন আকস্মিকভাবে মরুপথে ধারা হারালো কেন...? কিন্তু দূরে এগিয়ে চিন্তাধারা কেমন জট পাকিয়ে যায়..

ইতিমধ্যে প্রবাসে নয় বৎসর অতিক্রান্ত। জাতিপুঞ্জের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি থেকে তাঁর ডাক এল—পরামর্শদাতা হিসেবে বার্মাদেশ ঘুরে অবশেষে প্রায় এক বৎসর বাদে তিনি ইন্দোনেশিয়ার এক কর্মযজ্ঞে যোগ দিয়েছেন, সেখানে দেখা হয়ের সিঙ্গাপুর, প্যাটেল এণ্ড এসোসিয়েট্স-এর সিনিয়র পার্টনার, আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ডাঃ প্যাটেলের সঙ্গে। বৃদ্ধ ডাঃ প্যাটেল যখন গভীর আগ্রহে যাদু-সাহেবকে দেশে ফিরে ঐ কোম্পানীর পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন, তিনি সহসা কোন উত্তর দিতে পারেন না। কিছুদিনের সময় চাইলেন। এই সময়ে তিনি নিজেকে, নিজের চাওয়া-পাওয়াকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলেন। আর্থিক আর সম্মানের দিক বাদ দিলে এই দশবছর তিনি নিজের পথে সুখে ক্লান্ত। কোন কালেই তিনি আবেগ-প্রবণ নন—অতীন্দ্রিয় ব্যাপারেও তাঁর গভীর অনাস্থা, কিন্তু অহরহ যা দেখেছেন তাকে অস্বীকার করেন কি করে—দেশ ছাড়ার পর থেকে মনে হয়েছে একটি বিষয়, করুণ মুখের এক জোড়া, পদ্মার ঢেউ মাখানো বড় বড় চোখ, স্থির দৃষ্টিতে অপলকে তাঁর দিকে তাকিয়ে দিনে, রাত্রিতে, জাগরণে, স্বপনে এমনকি স্বপ্নেও

সঙ্গীস্থানে, সঙ্গীসময়ে। আর একটি ভিন্নমুখী চিন্তার স্রোতও তার মনে প্রবাহিত হলো, এত দীর্ঘ দিন পরে দেশে ফেরার এই আকস্মিক আহ্বানে দুনিরীক্ষ্য নিয়তির কোন স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে কি? অবশেষে তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ও দেশে ফিরে এলেন।

তা নূতন করে ঘর বাঁধার আশাও ত এখন বিলীন—এবারে কি করণীয়—কোন আকর্ষণে আর এ দেশে পড়ে থাকা শুধু স্মৃতির রংমহলে জর্জরিত হতে? তবে কি ফিরে যাবেন পূর্বপো কন্টিনেন্টে? তারপর মৃত্যু এসে একদিন সব জ্বালা, সব যন্ত্রণার উপর কালো যবনিকা টেনে দেবে, অপরিচিত অনাত্মীয় দেশে তাঁর দেহ সমাহিত হবে কোন হিউম্যানিটেরিয়ান অর্গানিজেসনের বদান্যতায়—আনওয়েপ্ট আনঅনার্ড এ্যান্ড আনসাংগ।

হঠাৎ তাঁর সঙ্গ শরীর কাঁপিয়ে দু'চোখ বেয়ে জল এল, আর তিনি পারেন না—এমন দুঃসহ তার সহ্য করার শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। হে ঈশ্বর, কি অন্যায় আমি করেছি। আমায় কেন এমন বার্থ করে দিলে। অনেকক্ষণ মনের জমাট বাধা যন্ত্রণা গলে গলে চোখ দিয়ে গাল বেয়ে নেমে গেল।

এক সময়ে মন শান্ত হল, শরীরও সুস্থির। তারপর কি হলো উনি জানেন না। উনি জানেন না কখন সঙ্গ পাশ তাঁর যন্ত্রণাহর নিদ্রা ওঁর ক্লান্ত দুচোখ জড়িয়ে ধরেছে—উনি গভীর, অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। বাইরে ঝিঁঝি আর ব্যাঙের ডাক, ভেতরে শুধু নিশ্বাস ওঠানামার শব্দ। সময় বয়ে চলল। কতক্ষণ এমনি কাটল কে জানে? হঠাৎ মনে হল বাবা আর মা খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাবার অনেকদিন আগেকার অবিকল সেই মূর্তি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের সুঠাম চেহারা, দীর্ঘ ঋজু দেহ, একমাথা ঘনসন্নিবিষ্ট কালো মিশমিশে চুল। বাবু, তোর হয়েছে, ওঠো। বড় ঘুমকাতুরে ছেলে তুমি। ওঠো ওঠো॥ বড় মিষ্টি আর ভালো লাগে বাবার মুখে ছেলেবেলাকার এই ডাক। বাবু হাতের মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। বাবা তাকছেন তার বাবু সেই ছোটটিই আছে। কিন্তু মেঘে মেঘে বেলা যে কত বেড়ে গেল ঠাহর নেই। তবু ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে কৈশোরে ফিরে যেতে। বাবা কিন্তু একটানা ডেকেই চলেছেন বাবু, বাবু।

একটা গোঙানির মত শব্দ করে পাশ ফিরতে গেয়ে বাদুসাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। কাল রাতে তাহলে টিজিচেয়ারেই ঘুমিয়েছেন। বিছানায় শোয়া আর হয় নি। চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে পাশে গরম বোধ হতে সেখানে তাকালেন। অনেকটা রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। জানালাটা সম্ভবতঃ পুবদিকে। রোদের রং থেকে মনে হল বেশ বেলা হয়েছে। বাইরে জানালার ধারে একটি ভৃত্য গোছের লোক অনবরত ডেকে চলেছে: বাবু। বাবু॥ অনেক বেলা হয়েছে। উঠুন। বাবু। বাবু।

তা হলে এতক্ষণ তিনি যা দেখছিলেন তা স্বপ্ন। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন সাড়ে আটটা। ধড়ফড় করে উঠতে গেয়ে বেয়াড়া লাগল। গায়ে, হাতে, পায়ে বেশ ব্যথা, মাথা ভারী, কপালের দুপাশের শিরা দপ্ দপ্ করছে। আরও একটু শুয়ে থাকলে ভাল হত। কিন্তু সময় কোথায়? ঘণ্টার বেয়ারীশ আদবে অর্থাৎ দেড় ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে, ব্রেক ফাষ্ট খেয়ে পোষাক পরে নিতে হবে। ভেতরের দিকের জানালায় বেয়ারীশের স্ত্রী কল্পনার মুখও উঁকি দিচ্ছে। দ্রুতহস্তে দরজা খুলে এক কাপ চা নেয়ে, তিনি বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

ঘণ্টার বেয়ারীশ যখন এল তখন তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। স্কুল, ওদের সেই হাউস থেকে অল্প দূরে, পি-ডাবলিউ-ডি রোডের উপরে। চারদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত কম্পাউণ্ডের প্রায় মাঝখানে স্কুল বিল্ডিং আনন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয়। অতি সাধারণ ইংরাজী ষ্টাইল E নম্বার বাড়ী। পাঁচিলের সমান্তরাল দেবদারু গাছের সারি—ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুলের বাগান—অভিনব ও নয়নাভিরাম—দশশ্রেণী অবধি অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুলটি সম্প্রতি এগার ও বার ক্লাশ খোলার অনুমতি পেয়েছে—পুরণো স্কুল বাড়ীটিকেই সংস্কার ও পরিবর্তন করে নূতন ক্লাশ খোলা সম্ভব, বাকি একটা নূতন বাড়ী তৈরী করা প্রয়োজন—এটাই এখন প্রশ্ন।

দেবাশীষের আন্তরিক ইচ্ছা অবশ্য এই সুযোগে, পিতাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পিতামহীর স্মৃতিপূত স্কুল-বাড়ীটির রূপ এমন করে পাল্টে দেয়া যেন পথচারী পথ চলতে চলতে থমকে যেয়ে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখে আর অপরকে এনে দেখায়—সে কারণেই শুধু পরামর্শ এবং নক্সা করার জন্য ওদের মোটা টাকার বাজেট এবং বম্বের সিম্পসন, প্যাটেল এণ্ড এসোসিয়েটসকে আমন্ত্রণ।

মিনিট পনের চারিদিক ঘুরে, বিভিন্ন কোণ থেকে স্কুল বিল্ডিংটি দেখে নিয়ে বাহুসাহেব কিছু নোটস্ নিলেন। কিছু ছবির খসড়া করলেন। তারপর দেবাশীষের ফাইল থেকে জমির ও স্কুল বাড়ীর নক্সা নিয়ে ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন—ঘড়ির কাটা এগারটা ছুঁয়ে—ছুটোর বাইটাইমে মিটিং। দেবাশীষ তা লক্ষ্য করে অনুনয়ের সুরে বলল: একটু সময় দেবেন?

বাহুসাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল: আবার কি?

আমাদের প্রধান-শিক্ষিকার কিছু বক্তব্য আছে—তিনি আপনার সঙ্গে একটু কথা কইতে চেয়েছেন। দশ বছর আগে এ স্কুল ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে—এ সামান্য সময়ে স্কুলের এই যে আশাতীত অগ্রগতি তা বলতে গেলে ওঁরই একক প্রচেষ্টায়—তাই ওঁর প্রতিটি কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, আমিও অগ্রাহ্য করতে চাই নে।

খুব দরকার আছে কি এই আলোচনার! বাহুসাহেবের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি। মহিলাদের সব ব্যাপারে নাক গলানোয় তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি। মনের ভাব চেপে তিনি অতঃপর বললেন: একটা Perspective view পাঠাবার পরই ত উনি ওঁর বক্তব্য জানাতে পারেন—আর সেটা করাই উচিত হবে:

: শুধু মাত্র পাঁচ মিনিট। উনি আমায় বার বার বলে দিয়েছেন "এই যে আমরা এসেও পড়েছি।

অপ্রসন্ন মুখে বাহুসাহেব দেবাশীষের পিছু পিছু অগ্রসর হয়ে, কয়েক পা এগিয়ে, E-shape বাড়ীটির মাঝের দাড়ির সম্মুখভাগে এসে পৌঁছলেন। ঐ চারটি সিঁড়ি উঠে বাঁ দিকে একটি ঘর—ঘরের প্রশস্ত দরজায় সুন্দর পরিচ্ছন্ন হাতা মেরুন রংয়ের পরদা—দেয়ালে একটি মেডেলের ফলকে বেশ লম্বা-চওড়া ভালো ইংরেজী হরফে লেখা—হেডমিস্ট্রেস।

আসুন। বাহু সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে দেবাশীষ প্রধান-শিক্ষিকার ঘরে প্রবেশ করলেন আর ঘরে ঢুকে বাহু-সাহেবের দু'চোখ বিস্ফারিত, পা জমে পাথর। তিনি কি আজ শুধু স্বপ্নই দেখছেন—তাঁর হল কি! কোন রকমে সম্মুখের চেয়ারের পেছনে ঝুকে টাল সামলে, দু'চোখ ভাল করে মুছে, আবার তাকালেন। না, কোন সন্দেহ নেই। অনেক চেষ্টায়, অনেক শক্তি একত্র করে, প্রায় ফিসফিসিয়ে কোনমতে উচ্চারণ করলেন: দী—পা!!

হ্যাঁ, আমি। এক মুখ হেসে দীপার সাদর অভ্যর্থনা: এসো।

দীপার হাসি ও কথার ভঙ্গীতে দেবাশীষ বিস্মিত: আপনি বাহুসাহেবকে চেনেন?

: চিনব মানে? দীপার কণ্ঠে কৌতুকের ঝিলিক: একেবারে আপাদমস্তক। আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলো আর আমি ওঁকে চিনব না।

মুহূর্তের মধ্যে অনেক চিন্তার লহরী দেবাশীষের বুকে ছায়া ফেলে দ্রুত ধাবমান হলো। সিম্পসন, প্যাটেল এণ্ড এসোসিয়েটসের ব্যাপারে দীপার ক্রমবর্দ্ধমান ভেদের রহস্য এবার স্পষ্ট প্রতীয়মান এবং সাথে সাথে জিভ কেটে দেবাশীষের নিমেষে অন্তর্ধান। ইতিমধ্যে বাহুসাহেব একটি চেয়ার টেনে এনে বসেছেন আর নির্নিমেষে দীপার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাকিয়েই আছেন।

এক সময়ে থাপছাড়া আর্দ্র কণ্ঠে তিনি থেমে থেমে কোনক্রমে বলতে পারেন: তুমি এখানে! আর আমি তোমার খোঁজে অন্তবিহীন পথ পরিক্রমা করছি। জানো আমার কি কষ্ট, আমি কি ছন্নছাড়া।

: বোকা মেয়েটার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তা হলে হলো! দীপার হাসি ইতিমধ্যে অন্তর্হিত: যাক তবু ভালো। সত্যি ভাগ্য একখানা করে এসেছিলে বটে!

: ভাগ্য! আমি!!

নয়? দীপার কণ্ঠ অভিমানে গাঢ়: রাগ করে বাপের বাড়ী চলে এলাম। কেউ একবার বললেও না

কি হল, কেন এলি। উল্টে সবার মুখে এক কথা—এমন বর যখন ভালো হইল না, অবশ্যই দুঃখ আছে। মা মুখ ফিরিয়ে রইলেন। বাবা বেঁচে থাকলে কি যে হত! উনি ও তোমায় প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। ছাব্বিশ বছরের বোকা মেয়েটা যে ঘর ছেড়ে আসে নি, বর নিতে এলেই হাসি মুখে চলে যাবে একথা কেউ বিশ্বাস করলে না। জানো, ওদের কথাই কিন্তু সত্যি হলো, বর শেষ পর্যন্ত ওকে আর নিতে এল না।

: আসবে কি করে?—রাহুলসাহেব হাসলেন—সে যেন কান্নারই রূপান্তর: সহজে পেয়ে পেয়ে যেটাকার মূল্যবোধই যে ছিল না। কিছু পেতে হলে কিছু যে দিতে হয় জীবনের এ বিশ্লেষ ইকোয়েশনটাও ছেলেটা জানত না: মেয়েটিকে বোকা বলছ, ছেলেটার আকাশ-পাতাল বোকামির কোনো তুলনা হয়?

রাহুলসাহেবের কথা বোধ হয় দীপার কর্ণগোচর হয় না। অতীতের অস্পষ্ট ধূসরাক্ষের বীথিপথ বেয়ে ওর কণ্ঠ যেন বহু-দূর থেকে ভেসে আসে: তিন মাস···চার মাস গেল, মেয়েটার বর আর নিতে এল না। সে এবার ভয় পেয়ে বরের অফিসে টেলিফোন করল। মরীয়া হয়ে যেতেই বস্তুর বাড়ী গেল। নেই···কেউ নেই সব উধাও। মেয়েটা অকূল সমুদ্রে ভাসল—আর ঠিক সে সময়ে দেবাশীষের বাবা ফরপায়রূপে ওর জীবনে আবির্ভূত হলেন—তিনি ওর পায়ের নীচে মাটি ফিরিয়ে দিলেন।

এবার অরবিন্দের চোখে চোখ রেখে দীপা বলে: তোমায় একটা প্রশ্ন করি। ছাব্বিশ বছরের মেয়েটা ও সব উজাড় করে তোমায় ভালবেসেছিলো। তাই ভেবে-ছিল তার মান ভাঙাতে তুমি নিশ্চয়ই আসবে। তা ঐ বোকা মেয়েটা কি বড় বেশী আশা করেছিল?

প্রশ্নটি তীরের মত এসে রাহুলসাহেবের বুকে বিদ্ধ হল আর বলাই রাহুলসাহেব, যিনি এতকাল এফিকস্ আর এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে গর্ববোধ করেছেন তিনি থর থর করে কেঁপে উঠলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রথাত মাও এই একই কথা বলেছিলেন। বস্তুত: যার কথাগুলোই যেন ভিজে সপসপে, ভিজে স্বরে উচ্চারিত হলো গলার কাছে ঠেলার মত কি একটা আটকে থাকে যেন। ওদিকে দীপা উত্তরের প্রতীক্ষায় স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে।

স্বাভাবিকভাবে তিনি কেটে কেটে, যেন প্রত্যেকটি শব্দ ওজন করে, উত্তর দেন: বত্রিশ বছর বয়সের সে দিনের সেই বোকা ছেলেটা, আজ চুয়াল্লিশ বছর বয়সেও সকলের অলক্ষ্যে সেই মারাত্মক ভুলের মাশুল, কি মর্মান্তিকভাবে, কি করুণভাবে গুণে চলেছে।

না গো, আমার মনে কোন খেদ নেই। তুমিও খেদ না। অতীতের জের টেনে বর্তমানের এই আপাতীত প্রাপ্তিকে আর কোন কারণেই হারাতে প্রস্তুত নয় দীপা: প্রকৃতিতে বুঝি তাই নিয়ম। জঠরের রস নিংড়ে মাটি গাছে প্রাণ সঞ্চার করে, তারপর সেই গাছ একদিন পাখায়-প্রশাখায় পাতায়-ফুলে-ফলে সেজে, অহংকারে হেলেদুলে আকাশে যখন আস্ফালন করে, তার কি মাটির কথা মনে পড়ে?

পড়ে। বহু নিদ্রাহীন রাত আর বহুতর ভারী মুহূর্তে লঘু যন্ত্রণায় ও অভিজ্ঞতায় অরবিন্দ একেবারে সুস্থির: দেনা-পাওনা না মিটিয়ে যাবে কোথায়? গাছের কথাই বলি। একদিন শিকড় ছিঁড়ে সেই গাছ যখন মাটির উপর আছড়ে পড়ে, তখন তার নিঃশব্দ, মর্মভেদী আকুল কান্না শুনেছ?

: শুনি নি আবার! দীপার মুখে প্রখর সূর্যের দীপ্তি: সেই ত আমার গর্ব আর সে গর্বেই ত আমি গর্বিনী। আমার চোখকে ফাঁকি দেবে সাধ্য কি? তুমি বড় হবে এ তোমার অনেক দিনের সাধ তাই পেছন থেকে তোমায় ডাকি নি। কিন্তু তুমি যেখানেই গেছ আমি ছায়ার মত সঙ্গে রয়েছি। উৎসবে, বাসনে, ব্যাধি বিপ্লবে···

: কি বললে? রাহুলসাহেব শুষ্ক ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে কোনক্রমে উচ্চারণ করলেন আর ইতিমধ্যে তাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, প্রায় বরফের মত ঠাণ্ডা, রক্তের স্রোত শিরশিরিয়ে, পিঠের স্নায়ুপেশীগুলোকে সঙ্কুচিত করে,

হুড় করে নীচে নেমে গেছে। কিন্তু ভাববার সময় কোথায়? বাঘের কবলের উন্মুক্ত। তত, নীর্ণ নদীতে নেমেছে যে প্রবল জোয়ার। দুরবনস্থের মত বাসুসাহেবের দিকে তাকিয়ে দীপা ওদিকে আপন মনেই বলে চলেছে:

: তখন তুমি থানায়—সাংঘাতিক বিদেশী-বিভাড়নের দাদা—যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন—আমার, যাকে বলে একেবারে, সঙ্গেমিরা অবস্থা। দিনও কাটে না, রাতও কাটে না। কি করি, কোথা যাই। তখন জ্যাঠামশাই, দেবাশীষের বাবা, বেঁচে। আমি "প্রাচীন ইতিহাসে" আবার এম্-এ পরীক্ষা দিচ্ছি। দুটি পেপার কোনক্রমে দিয়েছি, তোমার পাল্লায় পড়ে বাকী পেপারগুলো আর দেয়াই হলো না।

বাসুসাহেব এতক্ষণ স্থির চোখে দীপার দিকে তাকিয়ে, এবারে প্রশ্ন করলেন: আমার সব ঠিকানা, আমার যন্ত্রণা, আমার কষ্ট, সব যদি জানো, আমায় তবু ডাক নি?

: ডাকি নি? ভ্রূতে ত্রিশূল এঁকে তৎক্ষণাৎ দীপার পাল্টা প্রশ্ন: তুমি এখানে এলে কি করে? সিম্পসন, প্যাটেল এণ্ড এসোসিয়েটসের চিলেমি আর দীর্ঘসূত্রতায় বিরক্ত হয়ে আমাদের সলিসিটর যদি যখন সিদ্ধান্ত নিলেন এদের বাতিল করো, তখন তাকে রুখছে কে? কত সাধ্য-সাধনা করে তবে তোমায় আনা, তোমার মান যে কত উঁচু সে আমাদের জানা। দীপার ঠোঁটে হাসির আভাষ।

হঠাৎ চং করে ঘড়ির শব্দ। ঘরের ডান দিকের দেওয়াল-ঘড়িটায় এতক্ষণ নজর পড়ে নি। সাড়ে এগারটা!! সময় কি দ্রুত বয়ে চলেছে। বাসুসাহেব চঞ্চল হলেন। কণ্ঠস্বরে ত্বিধা তবু বলতে বাধ্য হলেন: ঘুটোয় বাইটার্সে মিটিং—একটু দেখা করেই চলে আসছি কেমন?

খিল খিল করে হেসে দীপা একেবারে ঘর মোর ভাসিয়ে দিলে। হাসি ত নয় জিউসের বজ্রমন্ত্রীত যেন। বাসুসাহেব অপ্রস্তুত—তিনি কি অত্যন্ত বেফাঁস, সাংঘাতিক হাসির কিছু বলে ফেলেছেন?

: আচ্ছা তুমি কি? তুমি একটা কি! আনন্দময়ী গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস দীপা হাসি মুখে, বিসিজয়ী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্ট বাসুসাহেবকে একেবারে নস্যাৎ করে দিল। এমন দেবনিন্দিত ভোঁদা (মাঠ ছুঁয়ে বলছি) তার কি হাল করেছে? লাল টকটকে চোখ, শনের মত রুক্ষ চুল, মুখে খড়ি উড়ছে আর উনি যাচ্ছেন মিটিং-এ। থামো!

বাসুসাহেব সচকিতে, সভয়ে তাকালেন। এখন স্কুল পূর্ণ-উদ্যমে চলছে। শিক্ষিকা এবং ছাত্রীরা করিডরে অনবরত যাতায়াত করছে। সৌভাগ্যবশতঃ, তাঁর প্রবেশের পর থেকে আর কারও অনুপ্রবেশ ঘটে নি। কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রধান-শিক্ষিকার এবম্বিধ বাক্যাক্ষটা যদি তাদের কর্ণগোচর হয় তবে··· ? দীপা কি স্থান-কাল-পাত্রও বিস্মৃত হল।

খুব আস্তে অরবিন্দ আবার বলার চেষ্টা করেন: আজ রাত্রির ফ্লাইটে দিল্লী যে যেতেই হবে। সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে আছে। কাল যোজনা ভবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রয়েছে।

: আহা! সে ত আমিও যাব। আর তোমায় একলা ছেড়ে দিই। হঠাৎ দীপা চাবি দিয়ে টেবিলের ড্রয়ার বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়: আমার কাজ দেখ। তোমার শরীর ঠিক নেই। কাল রাত্রিতে ভালো করে ঘুমোও নি আজ রাত্রির ফ্লাইটে আবার দিল্লী যাচ্ছ। আর আমি সেই তখন থেকে বক্ বক্ করে যাচ্ছি। Just পাঁচ মিনিট, অরুণাকে একটা কথা বলে আর ঘরের চাবি দিয়ে আসছি। যাব আর আসব কেমন। পরম প্রীতিতে চেয়ারের হাতলে রাখা বাসুসাহেবের হাতের উপর ঠকিতে নিজের হাত বুলিয়ে চকল পদে, প্রায় হাওয়ায় ভেসে নৃত্যপরায়ণা দীপার দ্রুত প্রস্থান—আর তার অপসয়মান লঘু শরীরের দিকে তাকিয়ে, দীপা অদৃশ্য হলে, তিনি চক্ষু ঘুরিয়ে নিলেন। প্রায় এক যুগের ব্যবধান—কিন্তু আশ্চর্য! সময় দীপাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নি—পূর্ণা, স্থির যৌবনা যেন—অল্প বয়সের সেই জেদী, সেই অসহিষ্ণু মেয়েটি এখনও পুরোপো বিন্দুতে দাঁড়িয়ে।

তিনি ভেবেছিলেন তাঁর সব কিছু বুঝি হারিয়ে গেছে। এখন দেখছেন হারায়নি কিছু বরং প্রাপ্য থেকে বোধ হয় অধিক, আশাতিরিক্ত ফেরৎ পেয়েছেন। ভেবেছিলেন জীবন-নদী বুঝি মরুপথে ধারা হারিয়েছে—এখন প্রতীয়মান হলো অন্তঃসলিলা হয়েছিল মাত্র, আবার ঠিক সময়ে নির্ঝারিত স্থানে দৃশ্যমান হয়েছে। আসলে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই হারায় না।

শেষাংশ ১০৬ পৃষ্ঠায়

সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা ও সমাজসেবা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

নিছক ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার প্রাবল্যে আধুনিক জনমানসে সমাজসেবার অসহায়ী অবস্থিতি। কারণ হৃদয়রাজ্যের যে ভূমাবোধ, যে বৃহৎ বোধিজ্ঞান সমাজসেবার আঙিনায় আমাদের উপনীত করবে তার অনুরোদ্গম কোথায়? বিকশিত রূপ লাভ করার পক্ষে ক্ষেত্রের প্রস্তুতিই বা কোথায়?

নেই অনুকূল মাটির সরসতা—যার গভীর গহনের অন্তঃপ্রেরণায় সেবাপরায়ণ মানসিকতাকে প্রবলভাবে সেবাব্রতী করবে। তাই সমাজাগ্রত যুবশক্তি একটি অবক্ষয়ের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়ে বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী হয়ে উঠেছে—এ কথা বলার মধ্যে কোনো অত্যুক্তি নেই বলেই বিশ্বাস করি। হয়তো এর পশ্চাতে অভিভাবক শ্রেণীর অক্ষমতা ও পারিবারিক শিথিলতা অনেক অংশেই দায়ী হতে পারে তবু যুগের প্রভাবে, কালের প্রগতির স্রোতে, আধুনিক যন্ত্রনা-জটিল সভ্যতার চক্রচক্রের দ্রুত অগ্রগমনে বা অতিদ্রুত পরিবর্তনশীলতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন সমাজ ও ঐতিহ্যের প্রতি বিরূপতায় উদ্যত হয়ে ওঠে, যেখানে তাদের আত্মাহীন মন ও মনন, ভাঙনমুখী ক্রিয়াকর্মে অনুপ্রেরিত করে কিন্তু সংগঠনে নয়, সংস্কারে নয়। গভীর মমত্ব বোধের ক্রিয়াকর্মে একটি নিশ্চিন্ত উদাসীনতা বা অবহেলার অবজ্ঞাই প্রকাশিত করে। তাদের মানস গঠনের এই মৌল ভিত্তিই দুর্বে রাখে সেবাব্রতী চৈতন্যের উদ্বর্তমার্গ থেকে।

এই বোধ ও বোধির পশ্চাতে যে অনুশীলন ও অনুভূতি, যে অনুপ্রেরণা ও আকুতি থাকলে সহজেই এই প্রয়োজনীয় মনুষ্যত্বটি যুবশক্তির মধ্যে বিকশিত হয় তার ওপর সমকালীন বৈজ্ঞানিক মহতী অবদানও অনেকাংশে ক্রিয়াশীল। আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের মন সহজ লভ্য ভোগের উপকরণে মাত্রি কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে! আপন মৌলিনী আরামে অবসাদ লভ্য পণ্যশ্রী নিয়ে জীবনযাত্রাকে আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগকেন্দ্রিক চিন্তাসূত্রে বিধৃত করেছে। আজ আমাদের একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে রাত্রির অন্ধকারকে দূর করতে হয় না—বিদ্যুৎ শক্তির কৃপায় সুইচের নীরবিদ্যুতে অঙ্গুলি স্পর্শেই মুহূর্ত মধ্যে আলোকিত হই। আজ আর টানা পাখার আদরে গ্রীষ্মের দহন জ্বালা থেকে রেহাই পেতে হয় না, সহজ লভ্য বিদ্যুৎ চালিত পাখার নিচেই শুধু কেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষেও অবস্থিতির অবকাশ এসে গিয়েছে। আজ বিদ্যাসাগরের কালের মতো মায়ের কথায় গ্রামের বাড়িতে ছুটতে হয় না পত্রাঘাতে, আমরা দ্রুত থেকে অতি দ্রুতযানের যুগে এসে গিয়েছি। বিশ্ব আজ ঘরের পাশে বিজ্ঞানের কল্যাণে—এ সবই সত্য।

তবু মানসিক প্রস্তুতির জন্যে যে অনালোকিত দিকটি থেকে যাচ্ছে তার বিকাশ সাধন করবে সাহিত্য।

একজন সমাজসেবী শুধু গ্রামের কোনো জলাশয় বা পথঘাট পরিষ্কার করে বা দাতব্যচিকিৎসালয় পরিচালন করাকেই সমাজসেবার একমাত্র মাধ্যম বলেই যদি ভেবে থাকেন তা হলে বোধহয় ভীষণ ভুল করা হবে। দেশ ও জাতির যে দ্রুত অবক্ষয় তাকে রোধ করার জন্য মানস-সেবারও যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—তা সাহিত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। এ শুধুই সাহিত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। উপন্যাসিত হবে চলচ্চিত্রে অভিনয়ে বা বেতার টেলিভিসনেও। একদিন আমাদের পরাধীন দেশের রাজশক্তি প্রবল আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং রেখেছিল শোষণের শাসনে, কারণ তাঁরা বিদেশী।

সেই বিদেশী রাজশক্তির প্রতাপে আমাদের সমাজ-জীবনে ও গ্রামজীবনে কোনো সংস্কার বা উন্নয়ন স্থানীয় জমিদার শ্রেণীর দায়িত্বে ও কিছু ধনী মানুষের সহায়তায় হয়েছে—তাঁরা জলাশয় নির্মাণ করিয়েছেন, পুষ্করিণী খনন করিয়েছেন, পথঘাট প্রস্তুত করিয়েছেন, মন্দিরাদি সংস্কার করিয়েছেন, পাঠশালা বসিয়েছেন, চণ্ডীমণ্ডপের চালাও চত্বর রচনা করিয়েছেন। উৎসব উপলক্ষে সময়-অসময়ে কথকতার আসর বসিয়েছেন, যাত্রা ও পালাগান করিয়ে

অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের মনে কিছু জ্ঞানালোকের দীপ-কণিকা প্রজ্বলিত করেছেন পরোক্ষে।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই ঐশ্বর্যময় শতাব্দীর বুকে বসে আমরা চলচ্চিত্রে এবং বেতার বা টেলিভিশনে জ্ঞানের অভাবনীয় রসসম্পদ সহজেই পেয়ে যাচ্ছি। হাতে লেখা পুঁথির একটি পাণ্ডুলিপির ভরসায় না থেকে আজ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে ঘরে ঘরে নিজস্ব একতিয়ারে রাখতে পারছি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্ময়কর ও বহু বিস্তৃত ঐশ্বর্যকে। জ্ঞানার দিগন্ত আজ বহুভাবে তাই সমৃদ্ধ। বহু ভাব ও ভাষার আমরা উত্তরাধিকারী। তাই সমাজের মানস গঠনের ক্ষেত্রে সাহিত্য একটি মহত্তী মাধ্যম রূপেই গ্রহণীয়, বরণীয় এবং অবশ্যই স্মরণীয়।

স্বদেশীয় যুগের বাঙালীর বিপ্লবীরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে যে মহৎ প্রেরণা পেলেন, তাতেই ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠলেন 'বন্দেমাতরম্' সংগীত, রাজশক্তির পুলিসী জুলুমের প্রবল আঘাত পেয়েও স্বদেশ কর্মী উচ্চারণ করেছেন 'বন্দেমাতরম্'। আমাদের কর্মের একটি বীজমন্ত্র যেন সব সময়ই অন্তরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত থাকতে থাকতে যথাকালে অনুপ্রেরণার কারণ হয়ে ওঠে। সেই অনুপ্রেরণা, সেই বীজমন্ত্র কর্মে ও সাধনায় বহু বাধা বিপত্তির মুখে যুগিয়ে দেয় অপরিসীম মনোবল ও অপ্রতিহত প্রতিরোধ ক্ষমতা,—যার আশ্রয়ে অসহযোগ আন্দোলন ও অহিংসা সংগ্রামে অনন্ত রসদ সংগ্রহ করে থাকে। একজন সমাজ-সেবীর জীবনসাধনায় এমনি অনুপ্রেরণার ভূমিপ্রস্তুতির জন্যে প্রয়োজন সাহিত্যের রাজদরবার থেকে প্রেরণার প্রদীপ শিখাটিকে অনর্গল অনির্বাণ রাখা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একজন যে উপকরণ নিয়ে সুস্বাদু রচনা করে ভোক্তার রসনাকে তৃপ্তি দিতে পারলো না অথচ সেই একই উপকরণে সুগৃহিণী তাঁর হাতের গুণে সুখাদ্য করে তুললে সুস্বাদু করে। লোক মুখে দিয়ে বলে উঠলো অমৃত। সাহিত্যেও ঠিক তেমনি পরিবেশনের গুণে পাঠক চিত্ত জয় করা যায়। অনেক রসাল কাহিনী আমাদের আপাতঃ চিত্তাকে অনুরঞ্জিত করে কিন্তু তাঁর মধ্যে যে গভীর জীবনবোধ রয়েছে, যে কেন্দ্রীভূত চিন্তার চৈতন্যলোকও রয়েছে—তাকে বুঝতে গিয়ে দেখা যাবে, জানা যাবে বর্তমান অবক্ষয়ের সমাজচিত্র। সেই অবক্ষয়িত চিত্রের চিত্রায়নে একজন সাংবাদিক বর্ণনা দেবেন সংবাদপত্রে তাতে সুনীতিবাবুর ব্যাকরণের কোন ত্রুটিই পাওয়া যাবে না, কিন্তু তা সাহিত্য কি? তবে তা থেকে বিষয়ের জ্ঞান হবে ঠিকই যদিও রসের ভিয়েনে নয় সাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে। তথ্য থাকবে তত্ত্ব নয়। সমাজ সেবীর গ্রহণীয় শুধু তার মধ্যে যে সমাজ চিন্তার রসদ পাওয়া গেল তাই।

একজন সমাজসেবী তাঁর সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব প্রেরণা যেমন লাভ করছেন বা একজন সাহিত্য রচনা করে সমাজ জীবনের অবক্ষয়িত দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহত্তর সমাজকল্যাণেরই কাজ যেমন করেছেন তেমনি সংস্কার সাধনের ইঙ্গিতও তাঁর সাহিত্যে রেখে যেতে পারেন। কারণ একজন সমাজসেবী তিনটি মৌল বস্তুর বনিয়াদ নিয়ে সেবার কাজে নিযুক্ত হবেন। সেই তিনটি কি?

(১) তিনি যে সমাজের কল্যাণকর্মে নিযুক্ত হতে চলেছেন তার যথাযথ ঐতিহ্যের পরিচয় জানবেন। (২) বর্তমান সেই সমাজ জীবনের চিত্ত, চরিত্র ও চিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবেন। এবং (৩) নতুন সমাজ গঠনের কোনো স্বপ্ন বা আদর্শ তাঁর চোখের সামনে রেখে তিনি সমাজসেবার বনিয়াদ রচনায় আত্মনিয়োগ করবেন। এই তিনটিরই পাঠ গ্রহণ ও রসদ সংগ্রহ তাঁকে যথার্থ সাহিত্যপাঠেই গ্রহণ করতে হবে এবং সাহিত্যিককেও সেই পাঠ রচনা করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের কল্যাণ-দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য-রচনার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যিক আপন চৈতন্যের আলোকে যে বিশ্লেষণ লাভ করছেন তাই সকলের মধ্যে পরিবেশন করেন। অর্থাৎ ব্যক্তির রসবোধ সমষ্টির দরবারে উপনীত হচ্ছে সাহিত্যে। এক অন্তরের প্রজ্বলিত প্রদীপ্ত শিখাটি বহু জনের অন্তরের আঙিনায় দীপাবলী রচনা করবে। সেই দীপালোকেই জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই উন্মেষ। দেবার জগতে যদি একজন নৈশ বিভালয় খুলে অনেকজন বয়স্ক নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষর

করার কর্ম গ্রহণ করেন আর অপর জন সাহিত্য রচনা করে অবদমিত, অবহেলিত, অসংস্কৃত সমাজচৈতন্যের নবজাগৃতি দান করেন—তবে এই উভয় জনই তুলামূল্য। কারণ কল্যাণ-দৃষ্টি নিয়েই সাহিত্যিকের ভাবানুভূতি। চণ্ডীদাস বা প্রাচীন বাউল গানে আধ্যাত্মিকতা রসের দিক না ধরেও সাদা-মাটা দিক দিয়ে দেখলে, দেখা যায় সমাজের অতি গূঢ় কথা সহজভাবে বলা হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমের যে মহতী স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়েছে তা লৌকিক থেকে অলৌকিক রসাবেদনে যেমন তেমনি বর্ণাশ্রমশাসনের যুগে সমপ্রীতিসমন্বয়তার মহতী ঘোষণাও। সাক্ত পদাবলী শাক্তসাধনের পথ ছেড়ে সহজিয়া সাধনের ইঙ্গিত দিয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলো এক এক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে তৎকালীন সমাজজীবনের কথাও সোজাসুজি বর্ণনা করেছে। আমাদের পুরাণ বা রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা একজন সমাজকর্মীর যেমন প্রয়োজন তেমনি আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের উপন্যাস, প্রবন্ধ বা কবিতাও তেমনি রসপ্রবাহের আকরভূমি। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি নিয়ে রচিত কথাকারো ব্যক্তিত্বের বৃহৎ অভিনয় উত্তরণ আনবে কারণ পাঠক তো সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুটিকে আবিষ্কার করেন।

এই কেন্দ্রবিন্দুটি কি?

না, যখন কোনো সাহিত্যিক তাঁর রসপরিবেশনায় মত্ত হচ্ছেন তাঁর সেই কর্মের সৃষ্টিমূল একটি অনুভূতি।

সেই অনুভূতিটি কি?

না, তিনি সমাজজীবনের একটি বিশেষ অবস্থার স্বরূপ লক্ষণটি অনুভব করে ব্যক্তি-অনুভূতিটিকে সমষ্টির জন্য পরিবেশন করলেন। কিন্তু তাই বলে যে তাঁর পরিবেশনায় কোথাও ঠিক বলা থাকতেই হবে সেই কেন্দ্রবিন্দুটির অনুভব এমন নাও হতে পারে। যেমন একজন আধুনিক লেখক সমাজের অবক্ষয় যুব শক্তির উদ্যম অপহিতুতা এবং দ্রুত-সমাজজীবনের মূল্যমানের অবনতির বেদনাকে তাঁর কাহিনীর বিষয়বস্তু করলেন। এখন কাহিনীর মধ্যে থাকলো বলিষ্ঠ যুবকদলের অবর্ণনীয় ও আক্ষেপজনক দ্বন্দ্ব সংঘাত ও অকাল বিনষ্টি। এখন এই কাহিনীর চিত্ররূপ বা গ্রন্থ পাঠে যদি আমাদের এই শিক্ষাই হয় যে তাদের বলিষ্ঠ শারীরিক শক্তির বিকাশটিই গ্রহণীয় এবং সেই বিকাশপ্রাপ্ত বলিষ্ঠতায় যে বাস্তবের সঙ্গে সংঘাত সেটি পৌরুষবাচক তা হলে কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু ধরা হল না। সমাজের ক্ষয়িষ্ণু স্বরূপটিকে বোধ করে যে বেদনা সেটিই কেন্দ্রবিন্দু সাহিত্য-সৃষ্টির এবং সেটিই গ্রহণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে ঐতিহাসিকতা ও আভিজাত্য তা তৎকালীন সমাজ মানসের ও পরিবেশের কথা জানায়। রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ অনুভূতির রাজা মহতী রসাসনের আস্বাদ দেয় আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে পল্লীসমাজের জটিল ও জটিল সমস্যাগুলির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়ে থাকে। শরৎচন্দ্রের একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলছে ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের চেহারা আর একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলছে নবাশিক্ষিত যুবশক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা। এদের মধ্যে যে সংঘাত রচনা হল তা থেকেই সমস্ত সমাজবোধের পাঠগ্রহণ করায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে যেমন স্বদেশ ভাবনা জাগায় তেমনি আমাদের কাব্যের জগতেও বিচরণ করলে দেশের প্রতি প্রীতিপ্রসূত মানসিকতার প্রস্তুতি হয়। অতুলপ্রসাদ বা মুকুন্দদাসের গান চারণসংগীত হয়েছে। তাই সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা আর সমাজসেবা বহুমুখী এবং বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত।

তবে নিছক সমাজসেবীর সাহিত্যপাঠ থেকে তিনটি মৌল বিষয় গ্রহণীয়—অতীত সমাজ, বর্তমান সমাজ ও ভবিষ্যৎ সমাজ। কারণ একজন সমাজব্রতীর জানা প্রয়োজন কোন সমাজের ঐতিহ্যভূমিতে কর্মসূচিত, কোন সমাজের প্রেক্ষিতক্ষেত্রে বিচরণ করছি এবং কোন সুদূর চিত্র নিকট কালের সাধনার কর্মে ব্রতী করেছে এবং কিসের আদর্শে এই ব্রত গ্রহণ।

সমাজের অবক্ষয় নানা ভাবে সুসংস্কৃত সুশিক্ষিত ও ও পরিশীলিত মানসিকতাকে পীড়িত করেছে। একটি সূক্ষ্ম সুন্দর সহজ নির্মল জীবনযাত্রাকে জটিল জিজ্ঞাসায় অস্থির করে তোলে। তখন সমাজের ঘৃণিত চেহারা আমাদের মনকে নাড়া দেয়, আমাদের অবদমিত শুভবুদ্ধিকে প্রকাশের

পথ আবিষ্কার করতে সুযোগ দেয়। তার জন্য একটি প্রেরণার রসায়ন থাকাও প্রয়োজন তা সাহিত্যের আঙিনায় থাকে। যেমন একজন সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টির সম্ভারে তুলে ধরলেন জীবননাট্যের এক কদর্য চিত্র, যা বাস্তবে হয় তো ঘটছে বা ঘটতে পারে, কিন্তু আমরা সেই অপালীন অসামাজিক কর্মের জীবন্ত বর্ণনা থেকে নিজেরা সমাজের সেই দুষিত ক্ষত যেন পুনরায় আমাদের সামনে না ঘটে তার জন্য সচেতন থাকবো—এই থেকেই সেই কাহিনী পাঠের কেন্দ্রীভূত যে শিক্ষা তা সমাজসেবার মহৎ সম্পদ। সাহিত্যে রাম ও রহিমের দ্বন্দ্ব বা রামায়ণের মনঃসমীক্ষা যেমন থাকবে তেমনি একজন কবি তাঁর চোদ্দ অক্ষরের পয়ারের যে অক্ষরের সেতুবন্ধ দান করলেন বা একজন প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে যে গভীর জ্ঞানের কথা বললেন তাও কল্যাণকর। আমাদের দেশের ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ তো বটেই এমন কি সুভাষচন্দ্র বসুর 'তরুণের স্বপ্ন' বা 'নূতনের সন্ধান' প্রবন্ধাবলীতে বা বিপিনচন্দ্র পালের প্রবন্ধাবলীতে যে স্বদেশ ভাবনার কথা রয়েছে তা বিদেশী মনীষীদের সমাজ কথা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালেই পাঠ করার।

মন আমাদের অভ্যাসের দাস—এ কথাটা শোনা থাকলেও আজ যখন কাজের কথায় আমরা অনুপ্রবেশ করি তখন দেখি যে অভ্যাস করে কিছু একটা রপ্ত করার সময় সব ক্ষেত্রে জোটে না। যেমন উত্তর বঙ্গের প্রচণ্ড বন্যায় স্বরাজ সাধনার কাজ আপাতত একটু চিমে তালে রেখে বন্যাত্রাণেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র প্রমুখ স্বদেশ হিতৈষী যুবকেরা। অভ্যাস নেই বলে সে কাজ ফেলে রাখা যায় নি। প্রয়োজনের তাগিদটাই বড় জিনিস। আর্তের সেবা, কষ্টকে লাঘব করার মানসিকতাটাই তো সাহিত্যপাঠের শিক্ষা, যাকে বলা যায় বিবেকবান ও শুভ-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার শিক্ষাই।

বিবেকানন্দের সমাজ সেবায়—শিব জ্ঞানে জীব সেবায় —বাণী ও বিভূতি অনুপ্রেরণার যথার্থই অন্তর্গত।

আজ আমরা যে জীবন ও জগতের মধ্য দিয়ে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছি সেখানে সেবার ব্রত গ্রহণ ঠিক আগের ছকে হবে না। সমাজসেবা ও সাহিত্যসেবা স্বদেশসেবারই বহির্মুখী বিস্তার রূপে গ্রহণীয় হয়েছে এতদিন সর্বদেশেই। আজ জীবনজটিলতা ও যানবাহনের বিচিত্র গতির ফলে একত্রে বাস একত্রে মিলে বড় কাজ করা প্রয়োজন কিন্তু হচ্ছে কমই। তবুও তো করার অনুপ্রেরণাটা চাই। প্রচেষ্টায় প্রাবল্য চাই।

তা আসবে কোথা থেকে?

আসবে না-কি সাহিত্যেরই শুভ কর্মফলে পরিচালনের উৎকীর্তি থেকে? আসবে না-কি সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধির কল্যাণদীপ্তি থেকে? যেখানের আলোকে আলোকিত হবে সমাজ, স্বদেশ ও সভ্যতা। যেখানের পরিবেশ উদারতায় বিশুদ্ধতায় সমাজজীবনকে সামাজিকবোধ ও বুদ্ধি দান করবে, সংস্কৃতিসেবী ও সমাজসেবীরূপেই অগ্রবর্তী করবে।

সাহিত্যিক যদি একটি কাহিনীর মধ্যে সমাজসেবার বর্ণনা দেন তা হলেই তা সমাজ কল্যাণমূলক হল কিন্তু তাতে সমাজসেবা বলতে যে সুদূর প্রসারী সুফল তা নাও হতে পারে। অর্থাৎ তা বিশুদ্ধ প্রচার সাহিত্যই হয়ে যাবে। সৎসাহিত্য যদি সমাজের অন্যায় আর অসংগতির কথা পরোক্ষে প্রকাশ করে এবং তা মানুষের মনে অন্তত চিত্তে শুভবোধ যে কি তা জাগায় তা হলে তারই মর্যাদা অনেক। কিন্তু সংবাদপত্রের সংবাদ আর প্রচারমূলক সাহিত্য অনেকটা সাময়িকীর পর্যায়েই এসে যায়।

তবে সাহিত্য চিরকালের একটা অভাবনীয় আস্বাদের মধ্যেই ভাবনার বিস্তৃততর ব্যঞ্জনা নিয়ে আত্মপ্রকাশিত।

অভাবনীয় আস্বাদনের জন্যেই সাহিত্যের আকর্ষণ। এবং এখানেই হয় তো সহিত বা সদ্ভাবোধের উপলব্ধিও।

নিমাই তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তেইশ

পূর্ববঙ্গ থেকে ঘুরে আসায় নিমাইয়ের আরও নাম ডাক হয়েছে। গুণগ্রাহীরা বলে, নিমাই পূর্ববঙ্গ জয় ক'রে এসেছে। তাই সেখান থেকে তার সঙ্গে এসেছে বেশ ক'জন পড়ুয়া। নিমাইয়ের টোলে ভর্তি হয়ে তারা বিদ্যা-ভ্যাস করতে চায়।

শুধু পূর্ববঙ্গ থেকেই নয়, নবদ্বীপ থেকেও এসেছে অনেক নতুন ছাত্র। অনেকের টোলেই তাই তালন পরেছে। নিমাইয়ের টোল জমজমাট। অনেক পণ্ডিতের ট্যাকে টান পড়লেও, নিমাইয়ের আয় কোন পয়সার অভাব নেই। পড়ুয়ারা তাকে যা দক্ষিণা দিচ্ছে, সংসার চালানোর পক্ষে সেইটেই তার যথেষ্ট।

এইভাবেই দিন যায়। মাস যায়। প্রকৃতিতে কত বদল হয়। কখনও শীত। কখনও বসন্ত। কিন্তু নিমাইয়ের জীবনে কোন পরিবর্তন নেই। জীবনটা তার একটি ছকেই বাঁধা পড়েছে। সেই ছকের বাইরে তার আর কিছু নেই।

সেদিন নিমাই খেতে বসেছিল।

শচীদেবী আস্তে আস্তে বললেন, 'নিমু, একটা কথা বলবো বাবা ?'

নিমাই থালার উপর থেকে মুখ তুলে মায়ের দিকে চাইল। বলল, 'কি বলবে বলো না।'

'বয়েস তো আর আমার কম হল না। আর যে আমি পারি নে বাবা। সংসারের ধকল কি আর কম ? এ দেহে আর কত সয় ?'

'বেশ তো। এবার না হয়, আমিও তোমার কাজে কিছু কিছু সাহায্য করব।' —নিমাই আবার খেতে আরম্ভ করল।

মা বললেন, 'না-রে। সে কথা বলছি নে। বৌমা চলে যাবার পর ঘর আমার একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে নিমাই, আমার বড় ইচ্ছে, সেই ফাঁকা ঘরকে আবার ভরে তুলি।'

নিমাই আবার থামলো। মায়ের মুখের দিকে চাইলো। বলল, 'তুমি কি আবার বিয়ের কথা বলছো মা ?'

শচীদেবী উৎসাহিত হলেন। বললেন, 'হ্যাঁরে হ্যাঁ। যে গেছে, সে তো চিরদিনের জন্যেই গেছে। কোন দিনই তো আর সে ফিরে আসবে না। তাই আমার বড় সাধ, মনের মতো বউ এনে, আমার শূন্য ঘরকে আবার পূর্ণ করি।'

'না।' —জ্যা মুক্ত তীরের মতো এই না কথাটি হঠাৎ যেন নিমাইয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

শচীদেবী চমকে উঠলেন।

নিমাই নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে বলল, 'নতুন ঘড়ি-ঘড়ায় আর আমায় বাঁধতে যেয়ো না মা। ঈশ্বরেরও বুঝি সেই ইচ্ছে। তাই না তিনি অল্পবয়সে লক্ষ্মীকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন।'

নিমাইয়ের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেল।

শচীদেবী বললেন, 'কথাটা যদি অন্য রকম ক'রে বলি নিমু।'

নিমাইয়ের দৃষ্টি ছিল বাইরে। বাড়ির একটি সজনে গাছে যে হলুদ পাখিটা নাচছে, সেই দিকে। মায়ের কথায় সে দৃষ্টি ফেরালো।

বলল, 'কি ?'

'যদি বলি, লক্ষ্মীর দিন হয়েছিল, ঈশ্বর তাই তাকে কাছে টেনে নিলেন; তাই বলে কি বাকী জীবনটা তুই

সন্ন্যাসী হয়ে থাকবি নিমু? তা থাকার জন্যে কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে?'

'দিয়েছে। দিয়েছে আমার মন। আর কেউ নয়।'

'কিন্তু তাই বলে আমার দিকে একবার চাইবি নে বাবা? আমার বয়েস হয় নি? দেহে কি আগের মত জোর আছে? আর কত দিন আমি সংসারের বোঝা বয়ে চলবো?' —বলতে বলতে শচীদেবীর দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

ভিজে গেল নিমাইয়ের মন।

বলল, 'আমি পুনরায় বিয়ে করলে তুমি সুখী হও মা?

'তা আর বলতে? তোদের সুখের সংসার দেখে আমি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো, তার চেয়ে বড় সুখ কি আমার আছে বাবা? ওরে নিমু, জীবনটা তো আমার দুঃখেই গেল, তুই আর আমায় দুঃখ দিস নে। আমি তা সইতে পারবো না।' —বলতে বলতে শচীদেবীর চোখ থেকে আবার জল নেমে এলো।

নিমাই বলল, 'তুমি যদি চাও, তা হ'লে আমি না করবো না মা। যাও, মেয়ে দেখো। আমি রাজি।'

শচীদেবীর চোখে জল। মুখে হাসি। যেন রোদ্দুরের খেলা।

বললেন, 'আমি জানতাম, আমার সাধ তুই কোনদিনই অপূর্ণ রাখবি নে নিমু। ওরে, আমি যে তোকে চিনি।'

শচীদেবী মনের আবেগ চেপে রাখতে না পেরে বারবার ছেলের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

মেয়ে প্রায় ঠিকই ছিল।

প্রতিদিন গঙ্গা স্নানে আসতো একটি মেয়ে। পরমাসুন্দরী। ধীর-স্থির। দু'টি চোখ টানা টানা। গভীর।

শচীদেবীর সঙ্গে দেখা হলেই সে তাঁকে প্রণাম করতো।

একদিন তিনি মেয়েটিকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কাদের মেয়ে গা'?

'আমি বিষ্ণুপ্রিয়া, সনাতন রাজপণ্ডিতের মেয়ে।'

'রাজ পণ্ডিতের মেয়ে তুমি? বেশ, বেশ। বেঁচে থাকো মা। ভাল ঘরে, ভাল বরে তোমার বে' হোক।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলো। মাথাটা একটু নামিয়ে নিল সে। পায়ের আঙুলে মাটি খুঁড়তে লাগলো।

শচীদেবী বললেন, 'একদিন এসো না মা, আমাদের বাড়িতে। ঐ তো কাছেই আমাদের বাড়ি। নিমাই আমার ছেলের নাম।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়েস কম। তবুও নিমাই পণ্ডিতের কথা ইতিমধ্যেই তার কানে গেছে। অত বড় পণ্ডিত নাকি নাকি নবদ্বীপে নেই। সেই পণ্ডিতের মা তার সামনে দাঁড়িয়ে, তার সঙ্গে কথা বলছেন?

গর্বে আনন্দে বিষ্ণুপ্রিয়ার মন ভরে উঠলো।

'আমি তো কোথাও যাই না মা।'

'জানি, সে আমি জানি। রাজ পণ্ডিতকে আমার কথা বলো, নিশ্চয়ই তিনি আসতে বারণ করবেন না।'

দেখা অবধিই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বধূ হিসাবে বরণ করেছিলেন শচীদেবী। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবতেন, আহা, এমন মেয়েকে যদি বৌ করে আমার ঘরে নিতে পারতাম! আমার ঘর আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠতো।

নিমাই বিয়ে করতে রাজি হওয়ায় প্রথমে সেই বিষ্ণুপ্রিয়ার নামই মনে পড়লো শচীদেবীর।

বাড়ির কাছেই কাশীর বাস। কাশী মানে কাশীনাথ পণ্ডিত। বে'র ঘটকালি করা তার পেশা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা মনে হতেই কাশীনাথকে তিনি নিজের বাড়িতে ডেকে আনলেন।

বললেন, 'বাবা কাশী, তোমাকে যে একটি কাজ করতে হবে বাবা!'

'একটা?' হাসল কাশী।

বলল, 'আপনি বললে, অমন হাজারটা কাজ কাশী সফল করে আনবে।'

হাসতে হাসতেই কাশী শচীদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

শচীদেবী বললেন, কাশী, নিমুকে আবার বে' দিতে চাই।

'ঘটেই তো, নিশ্চয়ই। অমন কাঁচা ছেলেকে আবার বিয়ে দেবে না তো, করবেন কি? নইলে যে ছেলে আপনার বিবাগী হয়ে যাবে। একটি তো বছর আগেই উড়াল দিয়েছে, এটি ধরা দিয়েও আবার ছুটে পালাবে।' —বলে কাশী একটি উড়ন্ত পাখির দিকে চোখ ফেললো।

শচীদেবী বললেন, 'কিন্তু মেয়ে—'

কথা শেষ হ'ল না। মাঝখানেই কাশী কথা ধরলো। বলল, 'মেয়ের জন্ত ভাববেন না মা, নিমাইকে জামাই করার জন্ত নবদ্বীপের অমন অনেক বাপ পথ চেয়ে বসে আছে। হোক না বোজবর। কিন্তু এমন বর পাবে কোথায়? এই বয়সেই তার কত খ্যাতি!'

কথা আরম্ভ করলে কাশী যেন আর থামতে চায় না। ঝড়ের মত কটমট করে কথার পর সে কথা বলে যায়। শচীদেবী তা জানেন। আর তা জানেন বলেই কাশীকে তিনি থামালেন।

বললেন, 'কাশী, মেয়ের জন্ত তোমাকে আর এ-দিক সে-দিক ছুটোছুটি করতে হবে না। মেয়ে প্রায় আমি ঠিক করেই ফেলেছি।'

'ঠিক করে ফেলেছেন? কে, কে সে ভাগ্যবতী মা?'

'বিষ্ণুপ্রিয়া। সনাতন রাজ পণ্ডিতের মেয়ে গো। দেখতে-শুনতে ভাল। তার চেয়েও বড় গুণ সে ভক্তিমতী। বুদ্ধিমতী। ও মেয়েকে ঘরে আনতে পারলে আমার ঘর আনন্দে ভরে উঠবে।'

একটি থেকে, একটু ভেবে শচীদেবী আবার বললেন, 'যাও না বাবা, একবার রাজ পণ্ডিতের ঘরে। তার যদি অমত না থাকে, তা হ'লে শিগগিরই একটা শুভ দিন দেখে ওদের দু' জনের হাতে হাত মিলিয়ে দেবো। যাবে তুমি একবার?'

'কী বললেন? অমত করবে রাজ পণ্ডিত? নিমুকে জামাই করলে, সে-ই তো বর্তে যাবে। তার থাকবে আবার অমত? আপনি কিছু ভাববেন না মা, আমি এক্ষুণি রাজ-পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে তার সম্মতি নিয়ে আসছি।' বলে কাশীনাথ শচীদেবীর চোখের অন্তরাল হয়ে গেল। শচীদেবী খানিকক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে থেকে কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম জানালেন।

[চলবে]

FOR STEEL FABRICATIONS OF :

- CHIMNEYS
- DUCTINGS
- PIPE LINES
- TANKS
- FLANGES
- STRUCTURALS
- FLOORGRATINGS

Contact
STEEL FRAME
30A SHIBKRISHNA
DAW LANE
CALCUTTA 700054
PHONE : 35 7183

শ্রীমৎ
পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঠাকুর, যার যেন মোর সকল ভালবাসা তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে ইত্যাদি। সকল নদী যেমন সাগরে ধাবিত হয়, আমার চতুর্দিকে ছড়ানো ভালবাসা তোমাতে সংহত হউক। সকল ভালবাসা দিয়া তোমাকেই জড়াইয়া ধরিব। তুমি আমার কাম্যনীয়, লোভনীয়। আমার কাম ক্রোধাদির বিষয় তুমি হও। বাহির হইতে ভিক্ষার অবয়বের মধ্য দিয়া যাহা পাইয়াছি, সব নিঃশেষ কর, উজাড় কর। পূর্ণ তোমার পূর্ণ সন্ধানপূর্ণ প্রাণে আমার হৃদয় পূর্ণ কর। তোমার বংশীর গানে আমার সকল দেহমন, সকল বৃত্তি বাজিয়া উঠুক। আমি তোমার গানে গান মিলিয়া যাইব। আমার সব কিছু তোমার প্রকাশ-যন্ত্র রূপে গড়িয়া উঠুক। তোমার ডাকে পথে বাহির হইয়াছি, আমার সব যেন তোমার ডাকে সাড়া দেয়। আমি তোমারই, তুমি আমারই। ··· রেঙ্গু ১টার পর গিয়া নীরোদবাবুর বাসা হইতে জগদীশ প্রেসে ফোন করিয়া শ্যামবাজার U. B. I. হইয়া রেঙ্গু ৪টার পর। রাজেন ১॥ টার পর জগদীশ প্রেসে চলিয়া যায়। রেঙ্গু আরতির সময়। আরতির পরে বলি—লোভী মহাজন যখন অতি চড়াদরে লোভে জিনিষের মূল্য চড়াইয়া দেয়, তখন জনসাধারণ বিশেষ কষ্ট ভোগ করে, দুর্ভিক্ষ হয়। তখন সদাকার সস্তা দামের সস্তা প্রেমের দোকান খোলেন। ঠিক তেমনি ধর্মের মহাজনগণ—ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী প্রভৃতি—যখন ধর্মের মূল্য চড়াইয়া দেন, ধর্ম দুর্মূল্য হয়, অতি অল্প লোকের তাহা ভোগ্য হয়, তখন ভগবান সস্তা দামে ধর্ম দেন, অল্প মূল্য পাইলে ইহাই বেচিব —এই নীতি ঘোষণা করেন। তখন স্বতুরাচারও অল্পমূল্যে ধর্ম পায়। ইহাই ভাগবত ধর্ম। যখন মহাজনগণ নিলোভ হন, তখনই ভাগবত ধর্মের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়। বর্ণাশ্রম ব্যভিচার হইতেও ভগবান সহজ ধারার শাসন হস্ত গ্রহণ করেন। যখন মহাজনগণ বিদ্যমান, তখন সহজ ধারার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। ...১লা মে

ঠাকুর, তুমিই আমার 'গতি'; তুমিই আমার 'স্থান' (স্থিতি)। গতি পথ বিপ্লবের পথ; তুমি সেই পথে আমার ভর্তা। তোমার জীবনের প্রভাব আমার উপর বর্ষিত হউক। তুমি আমার প্রভু। আমার সব করা ও না-করার সাক্ষী তুমি। ··· তুমিই বিশ্বের অব্যয় বীজ। তোমার দেশে সব কিছু ব্যক্তিত হইয়াও অব্যয়। বীজ অনন্ত, অনন্ত ফল, অনন্ত ফুল। বীজ অনন্ত বলিয়াই তাহার মধ্যে অনন্ত ফলের সম্ভাবনা লুকাইয়া রহিয়াছে। একটি বীজে একটি গাছ বটে, কিন্তু গাছে কত ফল হয়। সেই ফলে আবার কত গাছ, কত ফল, কত বৃক্ষ! ধন্য তোমার অনন্ত রূপের লীলা। রাজেন প্রার্থনায় বসার পূর্বে বাগের বাজার যায়···কাঠের দুটি (২ টাকা প্রতিটি) আনে। রেঙ্গু ১॥ টার পর হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্সে যায়। বিজ্ঞাপন আনে। আরতির পর প্রার্থনা করি। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী তুমি; আমি যতদূর পারিয়াছি আমার দায়িত্ব বহন করিয়াছি, অদ্ভুত হইবার সাধনা করিয়াছি। মানুষ তাহার দায়িত্ব পালন করে নাই। ভগবান তো সে জন্য নিজের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হন না। অসুর যখন বিশ্বের জ্বালা উৎপাদন করে, তখন-ই শুধু ভগবান অসুর বধ করেন, নিজের উপর আচরিত অপরাধের জন্য কখনও শাস্তি দেন না। আমার জীবনও তো তাই। কী না লাঞ্ছনা মানুষ আমার উপর করিয়াছে। আমি তাহার উহার বেশী কিছু করি নাই। তাহাদের জন্য করণীয় যাহা, তাহা করিয়াছি। ···সত্যানন্দ রায় বলিয়া একটি উদ্বাস্তু ছেলে আসে···। নিত্যেনবাবু ২টি কলার গাছ পাঠাইয়া দেন।···। রেঙ্গু যে

প্রার্থনা হয়। আমার মস্তক তোমার চরণে পড়িয়া থাকুক। তোমার পাদ-দুই আমার মস্তকের শোভা। আমি তোমার কিঙ্কর, দাসী—ইহাই আমার সত্য পরিচয়। তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। প্রথমে তোমাকে বুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছি, পরে তোমাকে বুকে লইয়া প্রতি হৃদয়ে স্থাপন করিতে চাহিয়াছি। তোমার সঙ্ঘ-রূপের সেবাই সারাজীবন করিলাম। আগে দেহ সঙ্ঘবদ্ধ হউক, পরে পরিবার সমাজ। সর্বোপরি যদি এক সুস্থ

না যাবে, দেহ কি থাকে? পরিবারে সমাজে যদি একই সুর ধ্বনিত না হয়, সে আবার কিসের পরিবার, কিসের সমাজ? সন্ধ্যা গড়িয়া যাইব—ইহাই ছিল আমার সঙ্কল্প। ঠাকুর, আমার মনস্কামনা কি পূর্ণ হইবে না? সন্ধ্যা গড়িয়া না উঠিলে তোমার জীবন ও দর্শন প্রচারিত হইবে কি করিয়া? বেদ বাহির হয় না।··· খুব সকালে জিতেনবাবু আসেন। আরতিতে কালী ও সত্যানন্দ উপস্থিত ছিল। আরতির শেষে বলি—এত দিন ব্রহ্মত্ব ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্র হইতে আস্বাদিত হইত অরণ্যে রোদিয়া। কিন্তু পুরুষোত্তম-দৃষ্ট ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বের ক্ষেত্র হইতেও আস্বাদনের কথা বলে। প্রতি মানুষ যে নিতাই-গোপালের মতো সবর্ণী। শ্রীকৃষ্ণ সবর্ণী। ব্রাহ্মণত্ব-ক্ষত্রিয়ত্ব-বৈশ্যত্ব-শূদ্রত্বের সমন্বয় এত দিন অসম্ভব ছিল। নরনারায়ণ আজও ঐ সঙ্গবর্ণীর আদর্শই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। এই আদর্শই গীতার আদর্শ। কর্মক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের আস্বাদন করিতে চাহিলে 'শরণাগতি' ছাড়া উপায় নাই। ব্রাহ্মণত্ব-ক্ষত্রিয়ত্ব-বৈশ্যত্ব যে পরস্পর বিরোধী। জীবের আমি সমন্বয় সাধন করিতে পারে না। 'শিবোঽহম্' পারেন। ওরা যে

তোমার 'প্রত্যক্ষ' সঙ্গে স্নেহ আদর পাইয়াছি বলিয়াই আজও এত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়া চলিতে পারিতেছি। আমি তোমার হাতে আমাকে পাইব। সন্তান আগে মায়ের পেটে একাত্ম হইয়া থাকে, পরে মাটি স্পর্শ করে, অন্ন জলের সংস্পর্শ পায়। মানুষ হৃদয়ে থাকে, মাটিতে থাকে না। আগে স্বামীর হৃদয়ে, পরে স্বামীর সংসারে স্থান হয়। আগে ভগবানের হৃদয়ে, পরে ভগবানের সংসারে। মায়ের মাতৃত্বকে পুষ্ট সন্তানই মাটির বুকে পুষ্ট হইবার অধিকারী। আগে ব্রহ্মময় হওয়া, পরে ব্রহ্মের সংসার করা। কর্মক্ষেত্রে এই স্থিতি লাভের জন্য; তাই প্রত্যক্ষ গুরুর শরণাগতি। আধ্যাত্মিক জগতে 'আমি' কাটে না। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। 'তোমার কাছে যে হার মানি সেই তো আমার জয়'। আজ আইন-মন্ত্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসুর মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু উপলক্ষে অফিস আদালত ছুটি। বেদের তাই বাহির হওয়া হয় নাই। বারান্দায় মাটি ফেলা শেষ হইয়াছে।··· আরতির পর আলোচনা করি। বৈকালে শ্রীরোদববাবু ও শান্তিবাবুর দাদার সঙ্গে আলোচনা হয়। গ্রাহক হন। গ্রামে আসার ফলে যুবকদের সঙ্গে মেশা হইতেছে। যাহা শহরে যোগাযোগ সম্ভব হইত না। ···কালীপদ এখন আর কোথাও যায় না, এখানে আসে। ঠাকুর, তুমি ইহাদের কবে জ্ঞানে ভক্তিতে পরিপূর্ণ কর। খুনা ফেরে না যেন। ওঁ তৎ সৎ

এক ফোঁটা নদী

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)

জীপার চেয়ারের পেছনে মস্ত একটা জানালার কাছে পিঠে সম্ভবতঃ একটি কাঠালিচাঁপার গাছ রয়েছে। তার উগ্র মিষ্টি গন্ধে ঘরের বাতাস ভুর ভুর। সুলভ বাতাসের অনেকটা নিঃশ্বাসে টেনে নিয়ে, তিনি জানালা দিয়ে বাইরের রৌদ্রস্নাবিত কলকত্তাকে আকাশের পানে তাকালেন।

আঃ বাতাসটা কি সুইট! আর আকাশটা কি ব্রাইট!

অকস্মাৎ বাসুদাহেবের দেহ প্রবলভাবে রোমাঞ্চিত হ'ল —মনে হ'ল হাতদুটো যেন অল্প অল্প কাঁপছে—স্খলিত, স্বেদসিক্ত দুই হাত প্রার্থনার ভঙ্গীতে একত্র করে প্রায় স্বগতোক্তির মত অস্পষ্ট স্বরে তিনি উচ্চারণ করলেন: হে ঈশ্বর, তোমায় প্রণাম করি। আজ, এই মুহূর্তে, এই ঘরে, আমার দেহের বিন্দুতে, সিন্ধুতে তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করছি। সকলে বলে তোমার করুণাময়, বলে বিপদভঞ্জন। তুমি যদি করুণাময়, যদি বিপদভঞ্জন তবে আর কি···তবে আরো কি!···

দূরের আকাশ

অনিলরঞ্জন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আগামী দিনগুলো সংকটের ছিল, না উত্তরণের দিন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না বৈশাখী।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে শুতে গেল কিন্তু রাতে চিন্তার পাহাড় যেন ওর সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করলো।

জীবনে ভুয়া খেলে নি। খেলে নি এমন কি তাস পাশা কিংবা সাধারণ অন্য কোনো খেলা।

কাজেই এ ধরণের নতুন একটা খেলায় কী করে সে নিজেকে আটকে ফেলল বুঝতে পারছিল না।

কথাটা যখন একবার পাকা করে ফেলেছে তখন এ খেলায় ও নামবেই।

আর বৈশাখীই বা কী ধরণের মেয়েরে বাবা!

একটুও ভয় ওর নেই। ওর এ কথায় রাজী হয়ে গেল।

চিন্তাই করলো না একবার!

এমন কিছু একটা হয়তো ওরও হোয়েছে নিশ্চয়ই যার জন্যে এমন একটা জীবন নিয়ে খেলায় মেতে উঠতে চাইছে ঐ নিটোল যুবতী মেয়েটা।

এখন যৌবন যতটা তাড়াতাড়ি আসে ততটা তাড়াতাড়িই ওরা বোধ হয় এমন ভুয়া খেলায় নেমে যা কিছু করণীয় করে ফেলতে চায়। কারণ হাতে সময় সীমিত।

মেয়েরাও বুঝে ফেলেছে পুরুষদের দিয়ে কাজ করাতে হোলে একটু বাঁশি দিলে ভাল হয়।

ঠিক আগের যুগের মতো অত সহজভাবে কিছুই আজকাল আর পাওয়া যাচ্ছে না।

সংসারের চোরাবালিকে ওকে বুকে রাখতে ওরা ওদের ভূমিকাটুকু নিতে চাইছে অতি সহজ ভাবেই।

অবশ্য নিজের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বেশে পুরোমাত্রায়।

সুতরাং ওদের ভুলকাটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল হয়ে উঠছে। এ সময় সহজ সরলভাবে যখন কিছু হাতে আসছে না তখন জটিল থেকে জটিলতর পথেই যে ওদের চলতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন নিজের শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা।

এ সচেতনতার একটু বেরফের হোলেই জীবনের আঙিনায় নেমে আসতে পারে বিষম সংকট।

তাই এ বিষয়ে আরও একটু আলাপ আলোচনা করে বৈশাখীকে সজাগ রাখা দরকার।

নিজের দরকারে ওকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে চাওয়ার পর থেকেই সৈকতের চিন্তাধারায় এমন একটা ভাবনা বড়ই ওকে বিব্রত করে তুলছিল।

অবশ্য নিজের সম্বন্ধে এইটুকু ভেবেছে যে এ ছাড়া অন্য কোনও পথ থাকলে ও নিজেই ঝুঁকি নিতো কিন্তু সে পথে গেলে তো আর কাজটুকু সহজ করা সম্ভব হবে না।

তাই বৈশাখীই ওর হাতিয়ার। ওর উত্তরণের মধ্যম।

বাঁচিয়ে তোলার সময়।

একজন যুবক যখন একজন যুবতী মেয়েকে অমন একটা বিপদের মধ্য দিয়ে পথ করে আস্তে আস্তে চলতে বলছে তখন তার পৌরুষে কি বাধছে না?

না—

কারণ এখন ও সমস্ত অত ভাবলে আর কিছুই হোচ্ছে না।

কোনও কিছু পেতে হোলে তাই সকলেই সর্টকাট রাস্তায় নামছে কিংবা দূর পথে গিয়ে যেন তেন প্রকারেন পৌঁছাতে চাইছে নিজ গন্তব্যস্থলে।

সেদিন দোকান থেকে পান কিনতে গিয়ে অবাক হোয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে

সৈকত। সচরাচর এ ধরণের ছবি চোখে পড়ে না। একজন অন্তর্মুখী যুবক যার চেহারার মধ্যে রয়েছে অপূর্ব এক মাধুর্যতা তার দিকে সকলে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে বার বার তাকাচ্ছিল। যুবকটির মাথাভর্তি একরাশ চুল। সুন্দর ভাবে ঘাড়ে পিঠে ছড়িয়ে আছে। কোকরানো চুলের সঙ্গে মানানসই চোখ ঢুলুঢুলু মোটা গোপ। সুপুরুষ বুক। কিন্তু সারা গা খালি। এমন কী একটা সাদারঙ গেঞ্জিও ছিল না গায়ে, শুধু একটা জাজিম গায়ে রয়ে আছে বিছানায়।

টানা রিক্সায় অমন অবস্থায় ক' করে যে যুবকটি অনবরত কলকাতার রাস্তা দিয়ে অজানা বয়সে চলছে তাবলে অবাক না হোয়ে উপায় নেই।

তাই সৈকতও স্বাভাবিক ভাবেই কৌতূহলী হোয়ে উঠে ছল ঐ অনতার সঙ্গে।

অবশ্য কিছু ধন বাবে ও জানতে পেরেছিল যে ঐ যুবকটি একটি রেডিওর দোকানে কাজ করতো। যা মাইনে পেতো তা থেকে টাকা জমানো যেত না। অথচ কিছু টাকার ওর অত্যন্ত দরকার। খুলতে চায় ঐ মালিকের মতো একটা দোকান কারও সঙ্গে পার্টনার হোয়ে।

সুযোগ খুঁজছিল। সুযোগও এলো। মালিক ওকে ব্যাংক থেকে কিছু টাকা তুলতে পাঠায়। ওর চোখ ঝলসে উঠে। বুকের আশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। টাকা তুলে অফিস না গিয়ে নিজের ডেরায় গিয়ে উঠে।

কিন্তু মালিকেরা এখন বড় চতুর। তারা বাংলা করতে গেয়ে কর্মচারীদের উপর কড়া নজর রাখার জন্যে মস্তানদের মাঝে মাঝে কিছু ছুড়ে দেয় এই সময় বাড়তি আয়োজনে সাহায্য করার জন্যে।

সুতরাং যথাসময়ে যুবকটি ধরা পড়ে। মালিক বুঝতে পারে সটকাটে কাজ হাসিল করতে চেয়ে ছল যুবকটি। সুতরাং পুলিশের হাতে ওকে না দিয়ে এমন এক নতুন ধরণের শাস্তি ওকে দেবে যাতে জীবনে এদিকে না এগোয়।

ঘরের মধ্যে একটা গুমট গরম। বিছানায় শুয়ে এ পাশ ও পাশ করছিল সৈকত। ভবিষ্যতের এ এবড়ো খেবড়ো পথের শেষ কোথায়?

হঠাৎ সেই যুবকটির অদ্ভুত ধরণের যুবটা ওর মনের আয়নায় ভেসে উঠলো।

কিন্তু কী আশ্চর্য!

আজ আর ওর উপর রাগ হোল না। বরংচ একটু মমতাভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে দেখলো ওকে।

ও ভুল করছে না তো? সৈকত আবার ভাবলো, কারও সঙ্গে দেখা করে একটু 'ইন্টিমেট' হোলে মহাভারত অশুদ্ধ হোলো অতটা সেকেলে ভাব থাকা উচিত না এখন।

ছোট্ট ছিমছাম একটি সেজ পেয়ে গেছে সৈকতরা। বৈশাখী কোমড় বেঁধে কাজে লেগে গেছে। যেমন বিয়ে বাড়ীতে হাক ডাক হৈ চৈ আর আপ্যায়ন, নতুন যুবের চোখ ঝলসানো পোষাক আশাকে আজিনা ভরে ওঠে তেমনি একটা খুশী খুশী ভাব নিয়ে সকলে এগিয়ে আসছে। আজ উদ্বোধন।

একটা রবীন্দ্র সংগীত দিয়েই সকলকে আহ্বান করা হবে। যারা ওদের এই কর্ম উদ্যমে সহায়ক হোয়েছে সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, যাতে কেউ ভাবতে না পারে সৈকতরা অকৃতজ্ঞ।

কারণ অনেক সময় দেখা যায় কেউ কেউ নিজের পাওনাটুকু মিলে গেলে অন্য পথ ধরে চলা ফেরা করে চিনতেই পারে না তাদের কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল। এ রকম অকৃতজ্ঞ ওরা হতে চায় না।

একটা ইণ্ডাষ্ট্রিকে দাঁড় করানোর পেছনে অনেক লোকের অনলস পরিশ্রম ও সহযোগিতা থাকে। ওদের ক্ষেত্রেও ছিল।

বিশেষ করে পারিজাত ঘোষ, যে ভদ্রলোকই আসল যুক্তি দাতা।

যুক্তিদাতা রূপেই ওরা দেখে মিঃ ঘোষকে।

ওরা পথে পথে যুক্তিল একটা ব্যবসা করবে বলে। আজ ওরা একটা ইণ্ডাষ্ট্রির মালিক হোতে চলেছে।

নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে জগতের দিকে তাকানোর সুযোগ আজ ওদের হাতে উপস্থিত। স্বাদত আনানোর আনন্দকে সকলের সঙ্গে মিলে উপভোগ করতে চায় ওরা।

সুন্দর সাজানো গোছানো পরিবেশটার দিকে তাকিয়ে

সৈকতের বুকটা আনন্দে টগবগ করছে। কত বিনিদ্র রাত্রি ও কাটিয়েছে। কত লোকের সামনে নিজেকে তুলে ধরেছে। কত ব্যর্থতাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। কত দুঃখ-কষ্ট পরিস্থিতিতে নিজের ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে। অনেক-গুলো না এর পরে আজ হাঁ ওর জীবনে আসন পাতছে। অনেকগুলো হাত তাকে বিকেলকে পিছনে ফেলে যৌতোজ্জ্বল একটি বিকেলের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে।

বুকের মধ্যে জমানো বাষ্পের টুকরোগুলো আলোর সন্ধান পেয়ে সৈকতকে বলছে, দেখছ ত চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।

অনেক পথিপথ উতরিয়ে রাজপথে পৌঁছেছ ত?

নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। পেছনে ফেলে আসা ব্যর্থতার কাঁটাগুলো আজ আর ওকে খোঁচাচ্ছে না।

বরং বড় একটা আঙিনায় দাঁড়িয়ে ওর বুকটাও ভরে উঠছে নানা পরিকল্পনার রসে।

ওরা ইতিমধ্যে কিছু লোককে অ্যাপয়েন্ট করেছে কর্মী হিসাবে।

এখানেই সার্থকতা এ পরশের উন্মেষে। নিজের সাথে আরও কতগুলো মুখে হাসি আনতে পারে স্ব নির্ভর এই প্রচেষ্টা।

আলোর ঝলকানি এসেছে ওর জীবনে। তাই আঁধার-ঘেরা এত দিনের দিনগুলো বড় অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে সৈকতের।

এতদিন যে সমস্ত লোকেদের সংস্রব এড়িয়ে ঝড়ের বেগে ছুটেছে ও, তাদের কাছে টেনে বলতে ইচ্ছে করছে সৈকতও অনেক কিছু ওদের দিতে পারে। তবাট করে দিতে পারে ওদের ইচ্ছাগুলো নতুন নতুন সম্ভাবনাময় সম্ভারে।

ওরও একটা বিরাট ভূমিকা আছে। সে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হোতে চায় না ও।

চাকরী দিয়ে, গরীব ছেলেদের পড়াশুনার খরচ তুলিয়ে, কন্যাদায়ে পিতাকে অর্থ সাহায্য দিয়ে, এমন কি কাউকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারে। মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভাবে ও বেড়ী এ সমস্ত ছোট খাটো কাজ করতে।

একমাত্র ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোনও কূল কিনারা পেত না বলেই সমস্ত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে কেমন যেন বৈষয়িক দৃষ্টিতে যাচাই করতো সমস্ত ঘটনার।

চোখ পড়ত বহু সংসারের পাকের দিকে। অপর দিকটা নিশ্চয়ই ছিল ও থাকবে। এতদিনে ও ভালো দিকটার দিকে আগ্রহী হয়েছে। নিজেকে তাই বড্ড হালকা মনে হচ্ছে।

অপরের জন্য নিজের চিন্তার কিছুটা সময় ব্যয় করার মধ্যেও এক অপূর্ব আনন্দ রয়েছে এতদিনে তা উপলব্ধি করে সৈকত যেন নব জীবনে ফিরে এসেছে।

নতুন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বৈশাখীর দিকেও।

নীল রংয়ের ছাপা শাড়ীতে ওকে অপূর্ব মনে হচ্ছে।

লাবণ্যসিক্ত বৈশাখীর অপরূপ রূপ লাবণ্যের বন্যায় অব-গাহন করছে সৈকত।

এক একবার দৃষ্টি বিনিময় হোচ্ছে আর নতুন থেকে নতুনতর সম্ভার ধরা পড়ছে বৈশাখী সৈকতের মনের আঙিনায়।

যে উদ্বোধন করবে এই মাত্র তার গাড়ী এল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাকে এগিয়ে আনতে গেল সৈকত ও বৈশাখী।

কিন্তু কী আশ্চর্য্য।

হঠাৎ কট করে কী যেন ওর বুকের মধ্যে আলা ধরিয়ে দিলো।

হাতের চেটোয় জিনিষটা কাছে টেনে দেখল সৈকত একটা সামান্য ছারপোকা।

শুরুপোষটা অসংখ্য কণ্টকে রূপান্তরিত হলো।

তাহ'লে কি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ?

পাশের বাড়ীতে গোলমাল শুনা গেল।

শেষরাত্রে চোর এসেছিল কিন্তু মালিকের সজাগ দৃষ্টি চোরকে বড়ই নিরাশ করেছে।

ধরা না পড়লেও বিশেষ কিছু নিতে পারে নি।

অদ্ভুত জোরে তখন রাতের ঘন্টা বাজছে অনেক দূরে। সৈকতের কানে কে যেন এক আলা পরশ ঢেলে দিলো। [ক্রমশঃ]

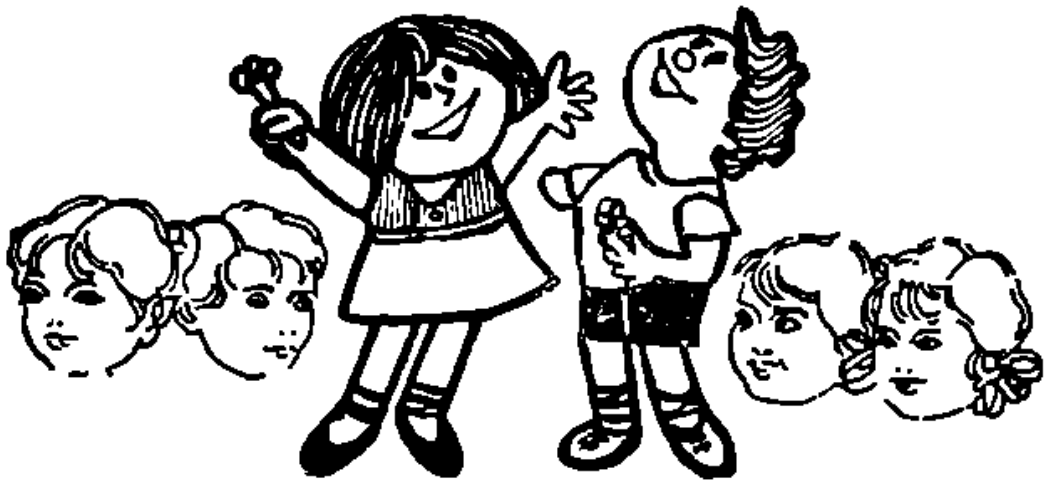

শিশুজগৎ

দেব পরিচয়

চন্দ্রা সাহা

যাঁর ভেতরে পাব শুধু গুণের পরিচয়,
দেবতা বলে এ মন তাঁকেই মানবে সুনিশ্চয়।
হয়েও গুণের অধিকারী
বিত্ত নিয়ে কাড়াকাড়ি
কিংবা ভোগে লালায়িত যদি কেহ হয়
সে কখনো দেবতা বলে পূজা আমার নয়।

অনেক অকাজ করেও যাহার স্বচ্ছ স্ফটিক মন
সবাইকে যে স্বার্থ ছাড়া করে সমর্পণ
বড় সে জন দেবতা থেকে
মূর্তিটি তাঁর রাখি এঁকে
মানসপটে, যেখানে তার সাজানো আসন
সেই তিনি তো আমার কাছে পাবির রতন।

মহা বিপদ

দীপাঞ্জন বিশ্বাস

শেষ পর্যন্ত ক্যারাটে সেখা আমার ছাড়তেই হলো। হয় ক্যারাটে বন্ধ করতে হবে নইলে বাড়ীতে থাকতা বন্ধ। কুন্দলী যে আমাদের বাড়ীর কার পাকা ধানে মই দিয়েছিল কে জানে?

কিছুদিন থেকেই ক্যারাটে শিখছিলাম একদিন দুপুর-বেলা মাস্টে আস্তে মাস্তেগুলো অভ্যাস করছিলাম— হঠাৎ কি রকম মুক্ত এসে গেল বিকট একটা চিৎকার করে পা ছুঁড়লাম তারপরই দেখি সামনে ঠাকুরের ছবিটা নীচে ছত্র-কুটে পড়ে আছে। পাশের ঘরে বাবা ছিলেন—সাধারণত আগেই দরজাটা খুলে বাবা এলেন— তারপরকার ঘটনা আর না বলাই ভালো (বাবার সঙ্গে তো আর ক্যারাটে চলে না)। দাদা বলে ক্যারাটে করলে নাকি গাধার মতো বুদ্ধি হয় (আমার আবার বুদ্ধি গাধার মত হবে কি করে—দাদা আমার আগেই গাধা বলতো), দাদার বন্ধুরা উপদেশ দেয় ক্যারাটে শিখে কি করবি—তুই কি দারোয়ান হবি? ক্যারাটের কল্যাণেই বাবার গাধা ছাগল আমার সঙ্গে তুল্য। তাই বোধ হয় মাঝে মাঝে আমি আমার ভিতর সারা চিড়িয়াখানাটা দেখতে পাই। এসব আমি গায়ে মাখি না।

সবচেয়ে কাবেলা হয়েছিল একদিন যার জন্য ক্যারাটে ছাড়লাম। প্রতীম বলে এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম শ্রীরামপুরে। আমি সেখানে একরাত ছিলাম। পরদিন সকালে ফিরছি—বাস ষ্টাণ্ডে আসতে হলে একটা কুমোর পাড়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সেটা কুমোরপাড়া না বলে টালিপাড়া বলা উচিত - খালি টালি—খালি টালি। এখানে যদি ঠাকুরের "কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ী—বোঝাই করা কলসী হাঁড়ি" ঠিক খাপ খায় না। যাই হোক টালি দেখতে

দেখতে চলেছি—এমন সময় দেখি একজন লোক টালি কিনছে। বিজের মতো আমার মন করে ওরে জিজ্ঞেস করলেন—'ভাখো তো ভাই টালি গুলো কিরকম হবে?' টালিগুলো দেখে আসলে পছন্দ হচ্ছিল না ঠিক, বললাম-'টালিগুলো নোনা ধরা'। লোকগুলো হাঁ হাঁ করে উঠলো—'হাঁ নোনাধরা টালি—একটা ভাঙো তো দেখি', আর একজন বললো—'পাড়ার গোবরা বাবা অবধি একটা ভাঙতে পারেনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম—'গোবরা কে?' কে বললো—'শ্রীরামপুরের পালোয়ান'। 'পারো যদি ভাঙতে তো বুঝবো কেউকেটা আছ'। ইতিমধ্যে ভীড় হয়েগেছে চারদিকে। আমি দুটো টালি দুটো ইটের ওপর ব্রিজের মত করে রাখলাম। তারপর একটা কি-হা ই করে আওয়াজ করে পাক করলাম—নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে গেল টালি দুটো। আমার মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তির হাসি। লোকগুলো হাঁ করে আমায় দেখছে। একজন হাঁ বন্ধ করে বলে বাপস্, অন্য জন বলে দেখলে। এমন সময় কোথা থেকে একটা বিরাট চেহারার লোক এসে বললো—'কি হচ্ছে সবাইদা? সবাই উত্তর করলে—'ও এইতো গোবরা—কিছু হয়নি। একটা ছেলে হাত দিয়ে দুটো টালি ভেঙেছে টালি ভেঙেছে হাত দিয়ে। হাঃ হাঃ হাঃ—তোমরা কি সব নেশা করেছো? আমি যা করতে পারিনি তা কোরে ওই চামচিকেটা? আজ্ঞে হাঁ—এই যে দেখুন না, টালিগুলো ভেঙে দিয়েছে আমাদের সামনে। এঁ্যা, গোবরার হাসিটা হঠাৎ চুপসে গেল—মুখটা হয়ে গেল কাটা চিউবের মতো। তারপর আমায় বললো—'তুমি টালি ভেঙেছো?' 'হাঁ।' আর যাই কোথায়—ব্যাপ ভড় করে গোবরা আমার চ্যালেঞ্জ করে বসলো। আমি স্পষ্ট বুঝলাম একটা গোলমাল শুরু হবে কিন্তু আমার প্রতিবাদ ডুবে গেলো লোকেদের চিৎকারে। গোবরা নিজেই সব ঠিকঠাক করে দিয়ে। সেদিন বিকেলে ওদের বাটিপোড়া মাঠে হবে আমাদের প্রদর্শনী লড়াই। এসব বলে গোবরা আমার টালিভাঙা বাদের হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেলো। সারাদিনটা কিরকম কাটলো না বলাই ভালো। আমি নির্ঘাৎ জানতাম যে পাড়াতে সবাই খুব চিন্তা করছেন। বড়রা নিশ্চয়ই পুলিসকে জানিয়েছে, সেইটেই বিরাট ভরসা।

যাইহোক সন্ধ্যে নাগাদ পাড়াটা নাগাদ টালিপাড়ার ছেলেরা আমায় একটা হাফ প্যান্ট পরিয়ে মাঠে নিয়ে গেলো। গিয়ে দেখি বাঁশের খোঁটাতে হাড়ি বেঁধে চিৎ করা হয়েছে। দুটো হ্যাজাক রয়েছে রিং এর পাশে। বিশাল ভীড় হয়েছে। খানিক বাদে গোবরা এলো—গায়ে একটা নীল তোয়ালে জড়িয়ে। তাকে দেখেই জনতা আনন্দে ফেটে পড়লো। ও স্টেজে এসেই গা থেকে তোয়ালেটা খুলে ফেললো। বিরাট চেহারা গোবরার—মাংসপেশীগুলো ঝলমল করছে। গায় কলে তেল মেখে এসেছিল—তাই একটা দূর থেকেও গন্ধ পাচ্ছিলাম। রেফারী হচ্ছে টালি-পাড়ার জগন্নাথ। সে আমাদের হ্যাণ্ডশেক করিয়ে দিল তারপর দুইদিক দিল খেলা শুরু। গোবরা দেরী না করে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমিও তৈরী ছিলাম, ঝট করে একপাশে সরে গেলাম। আর গোবরা টাল সামলাতে না পেরে ধড়ফড় করে পড়ে গেলো। আমি তার হাত ধরে তুলতে যেতেই আমার এমন খারাপ লাগালো যে মনে হলো দাঁতের Geography পাল্টে গেছে। এবার আমিও গরম হয়ে গেলাম—এলো পাথাড়ি কিল চড় চালাতে লাগলাম। গোবরা ক্ষেপে গিয়ে বুনো মোষের মতো আবার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি আবার ঝট করে সরে গেলাম। না, এবার আর আমার হিসেবে ভুল হয়নি। গোবরা রিং এর দড়ি ছিড়ে হ্যাজাক দুটোর ওপর দিয়ে ডন্ট খেয়ে দোজা দর্শকদের ভিতর চলে গেছে। বিরাট একটা চিৎকার শুরু হলো। সবাই তখন গোবরাকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে আমি লম্বা দিলুম। রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না—কিন্তু প্রাণের ভয়ে দৌড় মেরেছি। কোথায় যাচ্ছি কিছুই জানি না। দাঁত দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, কপাল দিয়ে ঘাম। দৌড়তে দৌড়তে খানিকক্ষণ যাবার পর দেখি একখানা ট্রাক আসছে হেডলাইট জ্বালিয়ে। আমার মনে হলো যেন মরুভূমির মাঝে আমি একখানা আইসক্রীম খুঁজে পেলাম। জোরে কয়েকবার হাত নাড়তেই ট্রাকটা থেমে গেল। একজন দারোগার মুখ বেরিয়ে এলো, তখন তো আমার বুক ধড়ফড় শুরু হয়েছে। একজন সার্জেন্ট কড়া ধমক দিল—'বাবা বস্ত কোথায়? 'আজ্ঞে কলকাতায়: 'নাম কি?' বিট্টু', বলতেই পেছনের সিট থেকে কে ডুকরে কাঁদিয়ে উঠে বললেন—'কে বিট্টু?' আমিও গলা শুনেই বুঝেছি এ আর কেউ নয় এ হচ্ছে আমার বড়দা।

নারী জগৎ

আমেরিকা ভ্রমণ

অরুণিমা সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখানে বাজারে বড় সুন্দর বন্দোবস্ত। দালান আছে গ্যালারি সাজানো সব জিনিষ, ক্রেতারা যার যা ইচ্ছা তুলিয়া নিয়া একটি চলচলে ঠেলা গাড়ীতে রাখিয়া দেয়। এই গাড়ী হাজারে হাজারে দোকানে ঢুকিবার বাহোদায় সজা থাকে। সব ক্রেতারা এক একটি ঠেলা গাড়ী নিয়া জিনিষ কেনে। দোকানদার নাই, চেঁচামেচি নাই, দর দস্তুর নাই। জুতা আমা সব এই প্রকার, ইচ্ছা মত জুতা পড়িয়া দেখা, যা পছন্দ হয় নাও। দাম জুতার গায়ে লেখা থাকে, জামাও তাই। তরকারির বাজারে সাজানো সব তরকারি, প্লাষ্টিকের থলেতে ভরা, তরকারি সব ভরা থাকে ও তাহাতে দাম লেখা থাকে। আলুও তাই, থলেতে ভরা থাকে, খানিকটা খোলাও থাকে। এই জানুয়ারী মাসে বরফ পড়িতেছে বাইরে কিন্তু বাজারে নানা প্রকার শাক সব্জীর অভাব নাই। সব রকম তরকারি পাওয়া যায়। অন্য দেশ হইতে সব তরকারি নিয়া আসে। কলাও তাই, কলা, আপেল, আঙুর, নাশা সবই পাওয়া যায়। কমলা লেবু ও বাতাবী লেবু তো থরে থরে সাজানো। দোকানের সামনে লোক থাকে একটি দুইটি নয়, অনেকে লাইন করিয়া প্রত্যেক টেবিলের সামনে বসিয়া আছে, তাদের টেবিলে সব জিনিষ বাছাইয়া দিতে হয়। তাহারা দাম দেখিয়া সব যোগ করিয়া দাম নিয়া বেয় ও ক্যাশমেমো দেয় এবং ভাল থলে করিয়া সব জিনিষ গুছাইয়া দেয়।

এখানে এত শীত কিন্তু এমন সুবন্দোবস্ত যে শীত বোঝাই যায় না। বাড়ী ঘরে গরম, গাড়িও তাই। এত বড় যে প্রকাণ্ড বাজার তাহাও গরম। কেবল গাড়ী হইতে নামিয়া বাজারে ঢুকিতে যা শীত পাওয়া যায়। এই জন্য এই শীতেও দেখিলাম মায়েরা ছোট ছোট বাচ্চা ২/১ মাসের হইবে নিতাও বাজার করিতেছে। যে ঠেলা গাড়ী আছে তাহার মধ্যে ছেলে শোয়াইয়া রাখিবার স্থান আছে, বেল্ট দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। শিশু গরম কাপড়ের মধ্যে বেশ আরামে শুইয়া থাকে, তাহা টানিয়া নিয়া মায়েরা বাজার করে। গাড়ীতেও এমন বন্দোবস্ত আছে, ছেলেকে শোয়াইয়া রাখিয়া বেশ করিয়া বেল্ট দিয়া বান্ধিয়া রাখে ও নিজে ড্রাইভ করিয়া বাজারে আসে। কোন কষ্ট নাই, কোন জড়তা নাই। কেবল মাছ মাংসের দোকানে লোক থাকে। মাছ ওজন করিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া বেশী কাগজে এমন ভাবে মোড়াইয়া দেয় যে মাছ কি মরদা আনিতেছে বাহির হইতে বুঝা যায় না। মাংসও তাই,

ছোট ছোট প্লাষ্টিকের প্লেটে মাংস রাখিয়া প্লাষ্টিকের পাতলা শিটে জড়ানো থাকে, তাহাতে দাম লেখা থাকে। এমন পরিষ্কার থাকে যে বাহির হইতে একটুও রক্ত ইত্যাদি কিছুই দেখা যায় না। ভিমও কেনে সাজানো আছে, ইচ্ছা মত তুলিয়া নাও।

ডাল, আচার, নানা দেশী মশলার গুড়া সব পাওয়া যায়। একটি "ইণ্ডিয়া বাজার" আছে, সেখানে আমাদের দেশের যাবতীয় জিনিষ, তেজপাতা, লিমপাতা, কাড়িপাতা শুকান সব পাওয়া যায়। বাজার দেখিলে বড় ভাল লাগে। আমাদের দেশের বাজারও খুব ভাল লাগে দেখিতে। কিন্তু মাছ তরকারির বাজার এ রকম নয়। বড় নোংরা। এদেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা একটি বিশেষত্ব।

১ই জানুয়ারী এ বছর প্রথম এখানে বরফ পড়িল। রাত্রে তেমন শীত ছিল না, তবু সকালে উঠিয়া দেখি অপূর্ব দৃশ্য। বড় বড় গাছ, যাহাতে পাতা ছিল না সেই সব শুকনো ডালে বরফ এমন ভাবে আটকাইয়া আছে দেখিলে মনে হয় সাদা ফুলের গুচ্ছ ফুটিতেছে, ছোট গাছেও তাই। তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। চারিদিকে শ্বেতশুভ্র অপূর্ব দৃশ্য, গাড়ীর মাথা, বাড়ীর ছাদ, রাস্তা ঘাট, মাঠ সব সাদায় ঢাকা। যে সব গাড়ী রাত্রে বা দূরে থাকে সে সব গাড়ীর ছাদে ২ ইঞ্চি বরফ জমা। সেই বরফ ছাদে নিয়াই সব গাড়ী চলিতেছে গাড়ী পরিষ্কার করিয়া লয়ত নই করিতে পারে না। রাস্তাটি কাল, গাড়ীর চাকার চাপে বরফ ভাঙ্গিয়া যায় সেই জন্য রাস্তা কাল আর সাদা। বেশী বরফ পড়িলে সরকারী গাড়ী আসিয়া রাস্তার বরফ কাটিয়া দিয়া চলিয়া যায়। গাড়ীতে যন্ত্র লাগানো থাকে। গাড়ী আস্তে আস্তে চালানো হয়। দুই দিক হইতে দুইটি যন্ত্র বরফ সরাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। দুই ধারে মাঠ সব সাদা, এমন শুভ্র সাদা দেখা যায় না। সমস্ত দিন বৃষ্টির মত বরফ পড়িতে লাগিল। পিজা তুলার মত উপর হইতে পড়িতে লাগিল। বাহিরে .বিশেষ ঠাণ্ডা তাই বরফ এক ভাবেই রহিল। ফেব্রুয়ারী শেষ, আগের দিন বরফ পড়িল, পরদিন তেমনি উজ্জ্বল রোদ উঠিল। মেঘ মুক্ত আকাশ, তীব্র রোদ আসিয়া বরফের উপর পড়িল, তাহাতে সাদার তীব্রতা যেন আরও বাড়িয়া গেল। এত উজ্জ্বল দেখাইতেছে, মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি, কত রূপ আছে প্রকৃতির। তাই চণ্ডিদাস বলিয়াছেন—

"যুগ যুগ ধরি ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল"। এ যুগেও আশাদেবী লিখিলেন—

"কোথা হতে এলে তুমি হে মহাশ্বেতা
তুষার বসনে ঢাকি সব শ্যামলতা
মেলে মোর দুটী আঁখি আমি শুধু চেয়ে থাকি,
শুন হেন মাঠে বাটে, হেরি শুধু ধবলতা।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ দিকে দিকে সব স্তব্ধ
আমি শুধু মনেমনে তব সাথে কহি কথা,
কে এলে গো কে এলে গো, কে এলে গো
মহাশ্বেতা।"

১ই ডিসেম্বর আমরা বাল্টিমোর হইতে আসা লাইকাস দেখিলাম। এ বাড়ী হইতে ৬ মাইল দূরে গেলাম। অপূর্ব লাইকাস।

৭ই ডিসেম্বর আমরা ভারত হইতে আসা "রাজা" বাংলা সিনেমা দেখিলাম। অনেক বাঙ্গালীর সঙ্গে সিনেমা হলে দেখা হইল। রাত ১১-৩০এ বাসায় ফিরিলাম

৮ই ভোরে উঠিয়া দেখিলাম বরফ পড়িয়া চারিদিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। আজ রোদ নাই। শীতও বেশ আছে—বরফ একভাবেই আছে—আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি, জানালা হইতে সরিতে পারিতেছি না। রবি-বাবুর গানটি মনে পড়িল

"আজ কি দেখিনু নয়ন মেলে"—প্রকৃতির কত বিচিত্র রূপ আছে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

ওয়াশিংটন শহর দেখিলাম, দর্শনীয় সবই দেখিলাম। লিঙ্কন মেমোরিয়াল দেখিলাম। প্রকাণ্ড সৌধ, চারিদিকে সিঁড়ি—গাড়ী হইতেই মূর্ত্তি দেখিলাম, প্রকাণ্ড বসা মূর্ত্তি। পার্লামেন্ট ভবন দেখিলাম: চারিদিকে ২০-২৫ তলার বেশী উঁচু বাড়ী এখানে নাই। বেশী উঁচু বাড়ী করিলে নাকি সহরের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়, সেইজন্য এখন আর বেশী উঁচু বাড়ী করে না লোকে। আগের মত ১০০ তলা

১৩০ তলা বাড়ী নিউইয়র্কে আছে শুনিলাম।

ওয়াশিংটন সহর মাত্র ১০০ বছরের পুরাণ সহর। ১০০ বছর হইল ইহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইহার পূর্বে ইংরেজ রাজা ছিল। ওয়াশিংটন তখন এখানে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সেইজন্য এই সহরের নামও ওয়াশিংটন হইয়াছে। অবশ্য ওয়াশিংটনের মৃত্যুর পর এ সহরের নাম দেওয়া হয়।

আমরা যে সহরে আছি ইহার নাম Potomac, ওয়াশিংটন সহর হইতে ৬ মাইল দূর।

ওয়াশিংটন যেখানে বাস করিতেন সে স্থানও এখান হইতে বেশ দূর। "মাউণ্ট-ভারননে" ওয়াশিংটনের বাড়ী আছে। ওয়াশিংটনের সেই বাড়ী দেখিতেও একদিন গেলাম। শোবার ঘর, বসার ঘর ইত্যাদি সব তেমনি সাজানো আছে ও সেই সব জিনিষ আছে বলিল। প্রত্যেক ঘরে একটি করে লোক আছে, তাহারাই দেখাইতেছে। তখনকার দিনের ঘড়ি এখনও চলিতেছে। রান্নাঘরে সব চীনা বাসন সাজান। ৮টা ঘোড়া ছিল, তাদের থাকিবার স্থান, তখনকার গাড়ী ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম সব আছে। গাড়ীটা বেশ নূতন দেখাইতেছিল, বলিল ১৯০০ সনে গাড়ীতে রং করা হইয়াছিল। মিসেস ওয়াশিংটনের রান্নাঘর দেখিলাম, নানা বাসন পত্রের মধ্যে চীনদেশের লাল কাঁচের বাসনে লাল কালো নীল রংএর কাজ করা। ২০০ বছর পূর্বেও চীন দেশ হইতে নানা শৌখিন জিনিস এদেশে চালান আসিত। ভাঁড়ার ঘরে দেখিলাম আমাদের দেশের মত মাটির "মাঠ" আছে। হাড়িপাতা, সের ইত্যাদি আছে। হুঁকার, নল্লা, বাগান করার সব সরঞ্জাম আছে। পাথরের থালা বাসন ইত্যাদি সব আছে। রান্নাঘর একটু দূরে। রান্না করিয়া আনিবার রাস্তাটির উপরে লম্বা ছাদ আছে। বাড়ীটি সুন্দর, পশ্চিম দিকে নদী বহিয়া যাইতেছে। অতি সুন্দর দৃশ্য, লম্বা বারান্দায় সারি সারি চেয়ার পাতা আছে। এ সব চেয়ার নাকি তখনকার দিনের, আর যেভাবে রাখা ছিল সেই ভাবেই রাখা হইয়াছে।

শোবার ঘরে বড় বড় খাট, ছবি ভাঙা লাগানো, মশারীও আছে। ঠিক মশারী নয়, চারিদিকে লেসের পরদা টাঙ্গান। ছোট বাচ্চার জন্য ছোট খাট দেখিলাম, তাহাও লেসের পরদায় চারিদিকে মশারীর মত ঘেরা আছে। মিসেস ওয়াশিংটনের নাতি ওখানে শুইত। নাতিনের জুতা দেখাইল মেয়েদের। টেবিলের উপর দূরবীন আছে। লাইব্রেরী আছে একটা ঘরে। অনেক বই দেখিলাম, ওরা বলিল ৭৫ আনা বই ওরা যত্ন করিয়া রাখিয়াছে। আর সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মিসেস ওয়াশিংটনের হাতের কাজ করা টেবিল ক্লথ দেখাইল। দোতলা বাড়ী, অনেক ঘর আছে। বাগান একদিকটায়, কত বড় বড় গাছ। একদিকে শাকসব্জীর বাগান। ফুলের বাগান খুব যত্ন করিয়া রাখিয়াছে।

তখনকার দিনে এখানে ক্রীতদাসের প্রচলন ছিল। অনেক ক্রীতদাস ছিল, তারা ছিল কাফ্রি। তারা সব কাজ করিত, তাদের বসবাসের জন্য দূরে বাড়ী আছে, সেখানে তারা থাকিত, সেখান হইতে আসিতে যাইতে সোজা রাস্তা এখনো আছে।

সেই ক্রীতদাসের বংশ এখন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহরের এক দিকটায় তারা থাকে। এখন সরকারের সাহায্যে অনেকে লেখাপড়া শিখিয়াছে। প্রফেসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছে। সব কাজে আগাইয়া আসে, বড় বড় কাজও করে। সিনেমা ইত্যাদি ও গান বাজনা সব করে! কিন্তু এখানকার বাসিন্দারা পাত্তা দেয় না! জনসাধারণ ওদের সঙ্গে ঠিক মত মিশিতে পারে না। পছন্দ করে না। ওদের কাফ্রি বলা যায় না, কালো বলিতে হয়। লেখাপড়া শিখিয়াছে কিন্তু চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তি বেশী, সরকার হইতে ইহাদের বড় হইতে অনেক সাহায্য করা হইতেছে, সরকার এদের প্রতি সদয়, স্কুল তো ফ্রি আছেই, যাদের চাকুরী নাই তাদেরও চাকুরী না হওয়া পর্যন্ত সরকার হইতে ভাতা পোষণ পায়। মেয়েরাও অনেকে লেখাপড়া শিখিতেছে এবং কাজও করিতেছে।

আবার একদল আছে আলসে, বসিয়া বসিয়া সরকারের পেনসন ভোগ করিতেছে। চুরি ডাকাতিও করে, নানা

অপকর্মও করে। সহরের এক দিকে ওদের বাস। কালিদের কালি বলার নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে, ওদের বলা হয় 'কালো'। কিন্তু সরকারের বদৌলতে এদের সব কাজেই চোকান হইয়াছে একটির বেশী নয়। সমস্ত বাজারে হয়তো দুইটির বেশী দেখা যায় না। সিনেমাতেও একটি, এইপ্রকার সবখানে।

এখানে সব জিনিষেরই প্রাচুর্য। খবরের কাগজ এত বেশী রোজ আসে আমাদের দেশের এক সপ্তাহের কাগজের চেয়েও বেশী, কত বিজ্ঞাপন কত ছবি। অত কাগজ রোজ পড়া অসম্ভব। সেই কাগজগুলি পড়িয়াই ময়লার বাক্সে ফেলিয়া দিতে হয়।

এখানে স্থান অনুযায়ী লোক সংখ্যা নাকি কম। এত শস্য হয় যে রাখিবার স্থান নাই, সেই জন্য কৃষকদের চাষ করিতে নিষেধ করা হয় ও কৃষকদের কাষিকাজ বন্ধ থাকিলে তারা কি প্রকারে জীবন রক্ষা করিবে সেইজন্য সরকার কৃষকদের ভরণ পোষণ করেন। আমাদের দেশে লোক আন্দাজে চাষের জমি কম, তাই ফসল করিতে কত চেষ্টা হইতেছে, বছরে ১ বারের স্থানে ২ বার বা তিনবারও ফসল যাহাতে হয় তার চেষ্টা হইতেছে তবু অন্ন কষ্ট যায় না। এখানকার এসব কথা শুনিলে আশ্চর্য লাগে। ৬ মাস জমি এখানে বরফের নিচে থাকে সেই জন্যই বুঝি জমি এত উর্বরা।

এখানে অনেক সুবন্দোবস্ত আছে। যেমন বাড়ীর ময়লা—সমস্ত ময়লা একটি বড় প্লাষ্টিকের থলেতে ভরিয়া রান্না ঘরেই একটি বড় ড্রয়ার আছে তাহাতে রাখিয়া দিতে হয়। তারপর রোজ একবার নিচে বড় বড় ড্রামে আছে তাহার মধ্যে ফেলিয়া আসিতে হয়। তাহাও ঢাকনা দেওয়া। ওখান হইতে ময়লার লরিতে লোক আসিয়া সব ময়লা লইয়া যায়। রাস্তা বা বাড়ীর কোথাও ময়লা জমা দেখা যায় না। গাড়ীর ড্রাইভার ও আর একটি লোক প্রত্যেক লোকের বাড়ীর ময়লা নিয়া যায়। আমাদের দেশের ড্রাইভার গাড়ী চালানো ছাড়া কিছু করে না। এখানে তা নয়। ভাড়াটে বাসের ড্রাইভারই গাড়ী থামিলে টিকিট বিক্রী করে। কনডাকটার নাই। একটি বাসে ঐ এক ড্রাইভারই সব করে। চাকা গাড়ী বাহির হইতে ময়লা ফেলা যায় না।

এখানে চিঠি বিলি করার পদ্ধতিও বেশ সুন্দর, আমাদের মত প্রতি বাড়ীতেই লেটার বক্স আছে, কিন্তু বারান্দায় নয়, রাস্তার ধারে একটি লেটার বক্স ষ্ট্যাণ্ডের উপর দেওয়া থাকে, চিঠি বিলি করার লিয়ন ছোট একটি মটর গাড়ী করিয়া আসে ও গাড়ী লেটার বক্সের সামনে দাঁড় করায়। আর আমাদের যে চিঠি ডাকে দিতে হইবে তাহাও ঐ লেটার বক্সে রাখিয়া দিতে হয়। তার নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটা লাল কাঠের টুকরা আছে তাহা উঁচু করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে, তাহাতে লিয়ন বুঝিবে যে চিঠি ডাকে দেওয়ার জন্য রাখা হইয়াছে। লিয়ন গাড়ী হইতে নামেও না, গাড়ী হইতে হাত বাড়াইয়া চিঠি নিয়া যায় ও চিঠি দিয়া যায় অতি অল্প সময়ে একজনই দুইজনের কাজ করিয়া যায়। রাস্তায় এক টুকরা কাগজ যদি ফেলে তবে ৫০ ডলার জরিমানা।

রাস্তায় ইলেকট্রীক লাইট মেরামত ইত্যাদির জন্য বেশ সুবন্দোবস্ত। একটি গাড়ীতে মিস্ত্রি আসিল, গাড়ীর উপরে ক্রেনের মত যন্ত্র আছে সেখানে বসিবার জন্য চেয়ারের মত আছে—সেখানে বসিয়া একটা যন্ত্র টিপিলেই আস্তে আস্তে চেয়ারখানা মিস্ত্রিকে একেবারে লাইটের মেরামতের স্থানে নিয়া দাঁড়াইল। লাইট মেরামত হইয়া গেলে আবার আস্তে নিচে নামিয়া আসিল। মিস্ত্রি ড্রাইভ করিয়া চলিয়া গেল। এই কাজে আমাদের দেশে ৫/৬ জন লোকের এক সঙ্গে আসিতে হয়। এখানে একজনই ড্রাইভার, মিস্ত্রি সব। পরে বুঝিলাম, আমাদের দেশেও এপ্রকার করিতে পারে, কিন্তু তাহা করিতে পারে না লোকাধিক্য বলিয়া। একটি লোকে যদি সব কাজ করে তবে আর ৫ জনের কি উপায় হইবে, তাহাদেরও তো কাজ করিয়াই জীবন রক্ষা করিতে

হয়। তাকে চিঠি দেওয়ারও ঐ কারণ, একজনই যদি দুই কাজ করেন তবে বহু ব্যক্তির তো না যাইয়া থাকিতে হইবে। অবশ্য বুঝিয়াই সব ব্যবস্থা করিতে হয়।

আমরা ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১২৭৬ রবিবার ফ্লোরিডা রওনা হইলাম। ফ্লোরিডাতে শীত খুব কম, বেশ গরম গরমের দিনে! আমেরিকানরা ফ্লোরিডাতে যায় শীতের সময়, আর সমুদ্রে স্নান করে, রৌদ্র স্নান করে, কালো হইয়া দেশে ফেরে। কালো তো নয়, বাদামি রং হয়, তাহাতে এরা খুব খুশি। আমরা যেমন পুরীতে বেশীদিন থাকিলে কালো হই সেই প্রকার ফ্লরিডা হইতে ফেরে কালো হইয়া।

মটরকারে বেলা এটায় রওনা হইলাম। ঐ দিন রাত্রি ৯॥ টায় মাদুরে বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার তরল ব্যানার্জীর বাসায় Releigh North Carolina পৌঁছি। রওনা হইবার সময় সৌরীকে নামিং হোম হইতে ৩-২০তে উঠাইয়া নিয়াছিলাম। বেশ সুন্দর সহর, সাংঘাতিক পরিষ্কার। পৃথক পৃথক হোটেল একতলা ছোট বড় বাড়ী। আমাদের দেশের মত দূর হইতে দেখায়, সব বাড়ী কাঠের। রাস্তায় আলোর বাহার দেখিলাম। ফ্ল্যাট বাড়ীও আছে ৮।১০ তলা, অনেক লোক সেখানে থাকে। এদিকে খুব উঁচু বাড়ী নাই।

রাত্রে তরুণের স্ত্রী মঞ্জুরী দেবীর আদর যত্নে নানা সুন্দর আহার্য গ্রহণ করিয়া তাহার স্নেহের সাগরে বসিয়া নানা গল্প করিয়া রাত ১॥ টায় শুইতে গেলাম। এদিকে ২ দিন আগে বরফ পড়িয়াছিল, তাহাতে সহর এখনো বরফে ঢাকা। পরদিন উঠিয়া দেখি খুব রোদ উঠিয়াছে। শীতও খুব, তাই বরফ গলিতে পারিতেছে না। যেমন রোদ তেমন বাতাস, তেমন ঠাণ্ডা।

আমেরিকার এদিকটায় বরফ কম পড়ে, বছরে ৫।৬ দিনের বেশী নয়, তবে শীত খুব। উত্তরে খুব বেশী বরফ পড়ে। যেমন নিউইয়র্ক, শিকাগো, বোষ্টন। ১১।১২ ইঞ্চি বরফ সব সময় থাকে। বরফ আর গলিবার সময় পায় না। সরকারী বরফ কাটার গাড়ী আসিয়া অনবরত বরফ সাফ করিয়া দিয়া যায় রাস্তায়, কিন্তু নিজের গ্যারেজ হইতে রাস্তায় যাইতে যে রাস্তা তাহা নিজেদেরই পরিষ্কার করিতে হয়।

গীতাশাস্ত্র মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২৮·০০
ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৫·০০ সখা পাঠা গীতা ২·০০
বৃহৎ পকেট গীতা ১১·০০ শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ২৫·০০
সুলভ পকেট গীতা ৩·৫০ কর্মবাণী ৩·০০
পদ্যগীতা ৩·৫০ ভারত আত্মার বাণী ১৮·০০
নিত্য পাঠ্য গীতা ২·৫০ Soul of India Speaks 6·00
লেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.
বাঙ্গালার বাঙালী ৮·০০ মহর্ষি রামমোহন ৬·০০
বীরত্বে বাঙালী ৬·০০ আ চার্য্য জগদীশচন্দ্র ৮·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী ৮·০০ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ৪·০০
বাংলার ঋষি ৮·০০ মুনাচার্য্য বিবেকানন্দ ৬·০০
বাংলার বেদুষী ৬·০০ রবীন্দ্রনাথ ৬·০০
ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের
শরীর ও শক্তি ৬·০০ নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন ৪·০০
যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ৪·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম ৪·০০
সরল যোগ ব্যায়াম ৪·০০ যৌগিক নিয়মে রোগনিবারণ ৭·০০
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী
১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

এদেশে চাকর বলিয়া কোন শব্দ নাই। বাড়ীর যত কাজ বাড়ীর কর্তা গিন্নিকেই করিতে হয়। বাগান করা, ঘাস কাটা ইত্যাদি সব। বাঙালী মেয়েরা সব প্যান্ট পরিয়া বরফ পরিষ্কার করিতেছে দেখা যায়। এখানে দেখিলাম, সাংসারিক কাজ—বাসন মাজা হইতে বিছানা করা পর্যন্ত মেয়ে পুরুষে সমানে করে। এদেশে জল বায়ু ভাল, তাই দেখি আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে এদেশবাসী মহিলারা বেশী শক্তিশালিনী, বাঙালীরাও।

ঝক ঝকে রোদ বাতাস। তার মধ্যে আমরা ১২টে মঞ্জুলা ও তরুণের বিস্তর আদর যত্ন পাইয়া বেলা ২-৩০মে আবার রওনা হইলাম। বেলা ১॥টায় "Kasley" নামক হোটেলে উঠিলাম। হোটেলে সব প্রকার আরামের বন্দোবস্ত আছে। ফোন করিয়া দেওয়া হইল। ৬ জনের উপযুক্ত সুন্দর খাবার টেবিলে সাজাইয়া দিয়া গেল। খাওয়া হইয়া গেলে খাবার টেবিল সমেত সব নিয়া গেল। খাওয়াদাওয়ার পর আবার রওনা হইলাম। ২-৩০ মিনিটে আমরা John F.

(শেষাংশ ১২০ পৃষ্ঠায়)

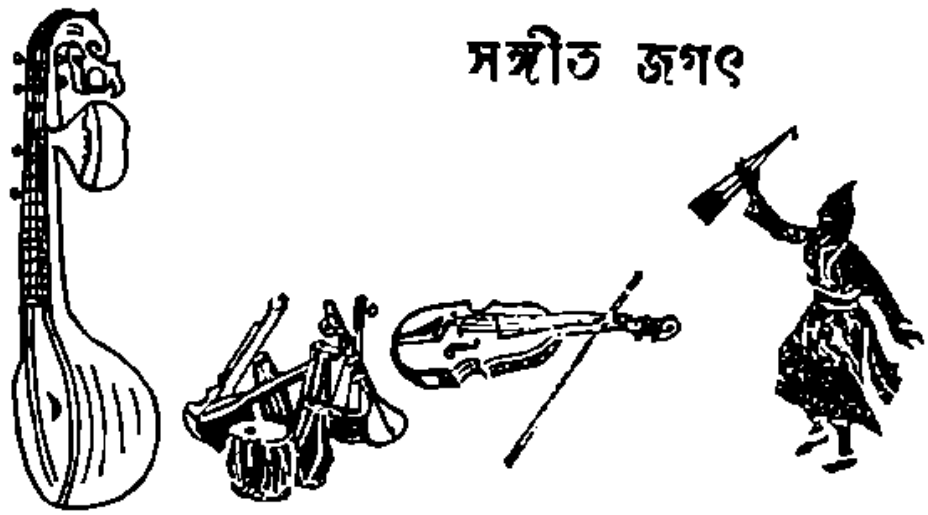

সঙ্গীত জগৎ

ধ্রুপদাচার্য গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭৭-১৯৫৩ ?

আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যে সমস্ত কণ্ঠ সংগীত সাধক ভারতীয় উচ্চাংগ-সংগীতে নিজেদের অনামান্য বৈশিষ্ট্য রেখিয়ে গেছেন, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম উচ্চমার্গের শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধক।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কাশীতে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছিলেন। তাঁর শিক্ষা আর সংগীত শিক্ষা দুটোই শুরু হয়েছিল কাশীধামে। পরে তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন পশ্চিম-বাংলার প্রাণকেন্দ্র কোলকাতা শহরে। শতাব্দী এই মানুষটির কাছে তাঁর শৈশবকালের কোন ইতিহাসই জানা যায় নি।

তিনি কাশীতে থাকার সময় প্রথমে ধ্রুপদ শিখেছিলেন সেখানকার স্বনামধন্য বাঙালী ধ্রুপদ গায়ক উপেন্দ্র কিশোর রায়ের কাছে। তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা করার পর গোপালচন্দ্রের সংগীতশিক্ষার ইতিহাস শুরু হয়েছিল একটা বিরাট পরীক্ষার মাধ্যমে।

যে যুগে গোপালচন্দ্র গান শেখা শুরু করেন সে যুগটা ছিল অন্যান্য গোঁড়ামীর যুগ। বড় বড় ওস্তাদরা কিছুতেই কাউকেই তাড়াতাড়ি গান শেখাতে চাইতেন না। গান শিখতে হলে ওস্তাদদের কাছে শিক্ষার্থীকে রীতিমত কঠিন পরীক্ষা দিতে হত। সে পরীক্ষা এখনকার মত ডিগ্রী আর প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা নয়; সে ডিগ্রী আর সে প্রাকটিক্যালের ধরণ ধারণ ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। তার উপমা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়াও যায় না। তবুও সন্ধের চলে যতটুকু পারা যায় তার একটা সামান্য নমুনা দিলে জানাদে, আজকালকার সংগীত শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবেন যে কেমন করে, কত কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে সেই সময়ে গান বাজনা শেখান হত।

তখনও শুরু হয়নি বিংশ শতাব্দী। গোপালবাবু তখন সবে সংগীতের হাতে খড়ি সেরে যৌবনের সবুজ দরজায় পা রেখেছেন। সেই সময় বারাণসীর পুণ্যতীর্থে বাস করতেন বিখ্যাত বাঙালী গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী। কাশীর ওস্তাদ মহলে অঘোরনাথের যথেষ্ট সুনাম ছিল। সেই সময়ে সপ্তাহের মধ্যে প্রায় তিন চার দিন, নানা বিশিষ্ট ধনীদের বৈঠকখানায় উচ্চাংগের গান বাজনা হত। গোপালবাবু সেই সব গান শোনবার জন্য প্রায় প্রতিটি আসরেই হাজির হতেন। এমনি ভাবে গান শুনতে শুনতে তিনি অঘোরবাবুর গানের একজন ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়লেন। তার ফলে একদিন তিনি অঘোরবাবুর কাছে বলেই ফেল্লেন—আমি আপনার কাছে গান শিখতে চাই। অঘোরবাবুও মৃদু হেসে সম্মতি জানিয়ে দিলেন। আর তারপর থেকেই গোপালবাবু অঘোর-

বাবুরবাড়ী যাওয়া আসা শুরু করলেন। কিন্তু আসা যাওয়াই সার হল। অঘোরবাবু তাঁকে আসতে বারণও করেন না, আবার গানও শেখান না। এমনি করে চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কিন্তু গোপালবাবু ছাড়ার পাত্র নন। তিনিও অসীম ধৈর্য নিয়ে যাওয়া চালিয়ে গেলেন। এমন সময় অঘোরবাবুর মায়ের খুব অসুখ হ'ল। তাঁকে সেবা করার লোকেরও খুব অভাব ছিল। গোপালবাবু অঘোরবাবুর অনুমতি নিয়ে তাঁর মায়ের সেবার কাজে লেগে পড়লেন। প্রায় একমাস ধরে গোপালবাবু অক্লান্ত ভাবে তাঁর সেবা করে তাঁকে ভাল করলেন। যখন অসুখ একেবারে ভাল হয়ে গেল তখন একদিন অঘোরবাবুর মা বল্লেন—গোপাল তুমি আমাকে যত্ন করে সেবা না করলে আমি এতো তাড়াতাড়ি কিছুতেই ভাল হতাম না। যাই হ'ক আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, বাবা বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল করবেন। গোপালবাবু তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বল্লেন—আমার একটা নিবেদন আছে, যদি অভয় দেন তাহলে বলি। অঘোরবাবুর মা বল্লেন—কোন ভয় নেই। তুমি নির্ভয়ে আমার কাছে তোমার মনের কথা বলতে পারো। তখন গোপালবাবু দুহাত জোড় করে নিবেদন ক'রলেন—আপনি যদি দয়া করে গুরুজীকে বলে দেন, তাহলে আমি একটু গান শিখতে পারি।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে, একদিন সন্ধ্যাবেলায় অঘোরবাবুর বৈঠকখানায় অঘোরবাবু বসেছিলেন, এমন সময় গোপালবাবু সেখানে ঢুকতেই তিনি একটু হেসে বল্লেন, গোপাল, তুমি আমায় বড় প্যাঁচে ফেলেছো। একেবারে মায়ের কাছে নালিশ জানিয়েছো। মা যখন হুকুম করেছেন, তখন তোমাকে গান শেখাতেই হবে। তা দেখ, আমি প্রতিদিন ভোর চারটের সময় থেকে একটু আধটু রেওয়াজ করে থাকি। তুমি যদি পারো তাহলে সেই সময়ে এসো। দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি।

তার পরের দিন থেকেই গোপাল নিজের বাড়ী থেকে প্রায় এক মাইল রাস্তা হেঁটে রাত্রি চারটের সময় অঘোরবাবুর বাড়ী হাজির হ'তেন গান শিখতে। তাঁর সেই আগ্রহ দেখে পরে অবশ্য অঘোরবাবু ঘর করে গোপালবাবুকে ধ্রুপদ ও ধ্রুপদ অংগের ভাল ভাল গুরুজন গান শিখিয়ে ছিলেন।

শুধু অঘোরবাবুর কাছেই নয়, তিনি পরে আরও অনেক ওস্তাদের কাছে অনেক কিছুই শিক্ষা ক'রেছিলেন। তিনি অঘোর চক্রবর্তীর কাছে শিক্ষা করেছিলেন ওস্তাদ আলিবক্স খয়রাগড় ধ্রুপদ আর গুরুজন। ওস্তাদ মিঠাইলালের কাছে ধ্রুপদ খেয়াল ও সেতার। ওস্তাদ বাসত আলির কাছে টপ্পা আর ঠুমরী। গোয়ালিয়রের ওস্তাদ হদ্দুখাঁর কাছে তিনি রীতিমত সাধনার মাধ্যমে শিক্ষা করেছিলেন খেয়াল।

গোপালবাবু কিছুদিনের জন্য বেতিয়ায় ছিলেন। এই বেতিয়া হচ্ছে গান বাজনার একটি উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান। এখানকার রাজা স্বয়ং একটি ঘরাণার সৃষ্টি করেছিলেন। তার নাম হচ্ছে বেতিয়া ঘরাণা। বেতিয়াতে থাকার সময় সে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পাখোয়াজবাদক কিষো সিং-এর ছাত্র যোধা সিং-এর কাছে গোপালবাবু শিখেছিলেন তবলা আর পাখোয়াজ। তাছাড়া বেনারসের বিখ্যাত ওস্তাদ বিনায়ক রাও মিশ্রর কাছেও গোপালবাবু তবলা শিখেছিলেন। এমনি ভাবে সাত আটজন ওস্তাদের কাছে শিক্ষা লাভ করা যে কি কঠিন ব্যাপার সেটা খুব সহজেই বোঝা যায়।

শিক্ষার পর আসে সাধনা, আর সাধনার পরে সংগীত পরিবেশন করার সময়। এই সাধনা আর পরিবেশনের মধ্যে যিনি প্রবেশ করেছেন, তিনি ভাল ক'রেই জানেন যে কত বড় সাংঘাতিক সোলকধাঁধাঁর মধ্যে তাঁদের ঘোরা ফেরা করতে হয়েছে। চারিধার থেকে কি ভাবে একের পর এক বাধা আসে। কি ভাবে নিন্দা আর কুৎসার কশাঘাত শিল্পীর মনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবার জন্য হাঙ্গরের মত হাঁ করে থাকে। সে কথা একমাত্র যাঁরা শিল্পী ছাড়া আর কাউকেই বুঝিয়ে বলা যায় না। গোপালবাবু এমনি হাজার হাজার বাধাকে নিজের বিদ্যা, সাধনা আর ব্যক্তিত্ব দিয়ে কি করে যে অতিক্রম করেছিলেন, সে কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

গোপালবাবুর চেহারা ছিল লম্বা চওড়া। বেশ ভুঁড়ি ছিল পাকানিধে। গলাবন্ধ কোট প'রে আর গলায় চাদর দিয়ে হাতে একটি লাঠি নিয়ে তিনি যখন গানের আসরে

ব'সতেন, তখন তাঁকে দেখলে মনে হত, সামনে বিরাজ করছেন একজন পুরুষসিংহ। মস্তবড় গোঁফ, মাথা ভর্তি সাদা চুল, গম্ভীর আর জোরালো তবু স্নেহমণ্ডিত কণ্ঠস্বর এই সব মিলিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল দেখার মতন। হাজার লোকের মাঝেও তাঁকে চিনে নিতে কারুর ভুল হ'ত না।

তাঁর ব্যক্তিত্বের মতন তাঁর ধ্রুপদ গানও ছিল অনুকরণীয়। তাঁর গানের গায়কী উচ্চারণ ভংগী, লয়ের অদ্ভুত প্রয়োগ কৌশল, কঠিন লয়ের মধ্যে অক্লেশে বিচরণ করার ক্ষমতা, কণ্ঠের শুদ্ধ গম্ভীর শব্দ সবই ছিল সাধারণ যে কোন উচ্চাংগের সংগীত শিল্পীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই জন্য তাঁকে ওস্তাদ সম্প্রদায়ের অনেকেই একটু বাঁকা চোখে দেখতেন। তাঁর আড়ালে তাঁকে অনেকেই অনেক কথাই বলতেন। কিন্তু তাঁর সামনে সবাই থাকতেন একেবারে নীরব—এমন অসাধারণ ছিল তাঁর বিদ্যা আর ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন হিমালয়ের মত অচল অটল আত্ম বিশ্বাসী শিল্পী। রাজা মহারাজা জমিদার থেকে আরম্ভ করে সকলের সংগে তাঁর ব্যবহার ছিল সমান। বিশেষ খাতির একমাত্র বিশেষ উপযুক্ত শিল্পী ছাড়া আর কাউকেই তিনি কিছুতেই করতেন না।

যাঁদের কাছে তিনি সংগীত বিদ্যা শিখেছিলেন সেই সমস্ত গুরুদের স্মরণ করতেন সব সময়ে পরম শ্রদ্ধাভরে। তাঁর দ্বিতীয় গুরু সংগীতাচার্য অঘোরনাথের একটি স্মরণ সভা হয়েছিল কাশী তীর্থে। সেই সভায় উপস্থিত থেকে তিনি নিজের লেখা একটি শুদ্ধ-বসন্ত পূরবী রাগে ধ্রুব তাঁলতালে নিজে গেয়ে সভার উদ্বোধন করেছিলেন। এই থেকেই বোঝা যায় তিনি অন্যান্য বাঙালী শিল্পীদের মতন গান রচনা করতেন। সেই অপ্রকাশিত গানটি আমি পেয়েছি আমার বিশেষ বন্ধু গোপালবাবুর ছাত্র জয়কৃষ্ণ সান্যালের কাছে। এখানে সেই গানটি লিখে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি—

শ্রীগুরু চরণ-স্মরণ করতহুঁ
যাহ'ত হুঁ সুবঠ সুবরণ॥
শ্রীগুরু শ্রীযুত অঘোরনাথ যো
সংগীত প্রবান জনকি মুরত
কি যে পুরণ॥
ঋতুপতি যহু বসন্ত দেবপতি মহাদেব
নির্বাণ ন্যায় পায় লেত হায় জানন॥
কহত হায় ধীজ গোপাল
শুনিয়ে হো সব গুণি জন
বিনা গুরু নাহি জ্ঞানন।

বহু গানের আসরে আর বহু বড় জলসায় তাঁকে নিয়ে এমন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যে সব কথা এখনো উপমা হিসাবে অনেকে বলে থাকেন। একবার একটি বড় সংগীত সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করার পর বিখ্যাত ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ সাহেব বলেছিলেন, গোপালবাবু, আপনি যেমন কল্যাণ গাইলেন এমন গান খুব কমই শোনা যায়।

তার উত্তরে হেসে গোপালবাবু বলেছিলেন, আমি ভাগ্যবান্ গায়কের ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করেছি, কিন্তু একমাত্র ভগবানই জানেন আমি তাকে ছুঁতে পেরেছি কি পারি নি।

আর একবার একজন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ও ধনাঢ্য জমিদার তাঁকে একটি অপ্রচলিত রাগের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি সংগে সংগে জবাব দিয়েছিলেন, আপনার বাড়ীর লাইব্রেরীতে লক্ষ টাকার গানের বই থাকতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন রাগ রাগিনী কথার কথা নয়। সুর-সমুদ্রে হাজারো রাগ-রাগিনী বিচরণ করছে, কজন ওস্তাদ তাদের সবার পরিচয় বলতে পারে। আমি ও রাগ জানি না, জানবার দরকার মনে করিনা। যা পেয়েছি তাকেই সাধনা করে পাকা পোক্ত করে নিতে পারলে আমার নতুন রাগ—এতো আমি ভাবতেও পারি না। তাছাড়া গান বাজনার কথা বলতে হলে তানপুরা ধ'রে সুরে সুরে ব'লতে হয়। আপনি তা কি পারবেন?

তারপর অবশ্য আর কোন প্রশ্ন সেই জমিদারবাবু গোপালবাবুকে কোনদিনও করেন নি।

গোপালবাবু যেমন সংগীত শিক্ষা করেছিলেন, যেমন সংগীত পরিবেশন করেছিলেন, যেমন গান রচনা করেছিলেন তেমনি শিখিয়েও ছিলেন অনেক অনুরাগী ছাত্রদের। তাঁর কাছে যাঁরা রাগ সংগীত শিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে হাওড়ার কটিবাবু, বেলেঘাটার সুরেন সরকার, মাণিকতলার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, বাগবাজারের রামকৃষ্ণ সান্যাল, বিভূতি ঘোষ, বাসুদেব চক্রবর্তী গোপালবাবুর কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখেছিলেন। সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল গোপালবাবুর ধ্রুপদ গানের গায়কীর শেষ ধারক ও বাহক হয়ে আজও বহু আসরে ধ্রুপদ শুনিয়ে চলেছেন অবিরাম অবিশ্রাম।

এই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাগুণী প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে সুরের অমর লোকে চলে গেছেন।

(১১১ পৃষ্ঠার পর)

আমেরিকা ভ্রমণ

Kennedy space center দেখিতে রওনা হই। পৌঁছিয়া দেখি বিরাট ব্যাপার। ভোম্বল আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হইলাম। স্থানটি একটি উপদ্বীপ ছিল। এখানে লোহা পুল, সমুদ্রের উপর দিয়া আমরা রওনা হইলাম। চারিদিকে কেবল নীল জল। বেলা তিনটায় Cape Kennedy Space Center Nasa পৌঁছিলাম। সেখানে বিরাট ব্যাপার। রকেট ও আর সব যন্ত্রপাতি ওখানেই তৈয়ার হয় ও চাঁদে যাওয়ার সময় রকেট ওখান হইতেই ওঠে। যে রকেট চাঁদে না যায় ছিল সেটা দেখিলাম। অনেক স্থানে আগুনে পোড়া দাগও রহিয়াছে। ওখানে সব যন্ত্র ভাগে ভাগে রাখা আছে, কি বড় বড়, দেখলে আশ্চর্য লাগে। যেখানে রকেট প্রস্তুত হইয়াছিল ও যেখান হইতে ছোড়া হইয়াছিল সব স্থান দেখিলাম। ৫০ মাইল ছাড়া সমুদ্রের উপর একটি বিরাট জমি।

ওখান হইতে ওরাই "বাসে" সব দর্শকদের ঘুরাইয়া দেখাইল। তিন স্থানে আমরা নামিয়াছিলাম অল্পক্ষণের জন্য। যেখানে রকেট তৈয়ার হয় সেখান হইতে খাচার মত একটা জিনিষের মধ্যে ঢুকাইয়া ৬ মাইল দূরে যেখান হইতে "রকেট" ছোড়া হইয়াছিল সেই স্থান, সেই উপযোগী যে বড় রাস্তা করা হইয়াছিল ও ৬ মাইল দূর হইতে রকেট ছোঁড়া হইয়াছিল, রকেট ছোঁড়াতে কত দূর পর্যন্ত জমি ভস্মীভূত হইয়াছিল, রকেটে যেখানে চন্দ্রযাত্রী তিন জন বসিয়াছিল সব দেখাইল। কি বড় বড় যন্ত্রপাতি। অবাক হইতে হয়। যে পাথর চন্দ্রলোক হইতে আনা হইয়াছিল তাহাও দেখিলাম একটি কাঁচের বাক্সে রাখা আছে। ঐ সব স্থান ঘুরিয়া দেখাইতে ২ ঘন্টা সময় লাগিল।

যখন এখানে রকেট প্রস্তুত হইতেছিল, দশ হাজার লোক কাজ করিত দিন রাত। তাদের বাসস্থান ইত্যাদি সব আছে। ছোট একটা সহর যেন। তুলনায় কিছুই এসব নই করিয়া ফেলা হইবে। যা দেখিলাম বর্ণনা করিতে পারি না, কি বিরাট ব্যাপার, কি অদ্ভুত যন্ত্রপাতি! অবাক হইতে হয়। মাছু আমাকে অনেক বুঝাইয়া বলিল। রকেটের মডেলের তিনটি অংশ ওখানে আছে সব দেখিলাম।

(ক্রমশঃ)

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের শেষভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

টাকা, চেক্, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নবদ্বীপধাম আশ্রম, গ্রাম—বাগুইআটি, পো:-আমনীনগর, কলিকাতা-৫৩, জেলা—২৪ পরগণা (ফোন : ৫১-২৫৯০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক্ অবশ্যই হওয়া চাই Crossed *a/c* Payee Payable to UJJWAL BHARAT.

গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

স্বনামধন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠিতগণের সঙ্গে উজ্জ্বল ভারত উপযুক্ত মানের নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনাও প্রকাশ করবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে হওয়া প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক যথোচিত অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বল ভারতে পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

Gram : ALL BRUSH

34-26
35-356

ALL INDIA BRUSH WORKS

Office

136 RAJA RAMMOHAN SARANI
CALCUTTA-700009

Factory

75/H/23, Dr. SURESH Ch. BANERJEE ROAD
CALCUTTA-700010

UJWAL BHARAT Registered WB/NP-34 Central Regd. No. R. N. 2671/57

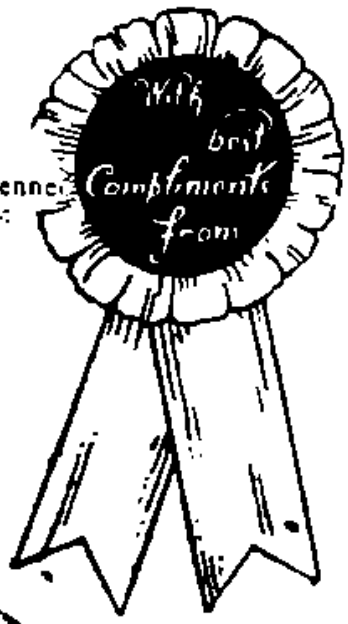

Kenne
Ca

Phones : 22-617
Res: 55-96

CALCUTTA HALDIA SHIPPING SERVICE (P) LTD.

PORT LIGHTERAGE SHIPPING & HANDLING
CONTRACTORS AGENTS

23A, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700001

কার্যালয় : ২৩এ, সুভাষ চন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২২-৬১৭০
রেজিঃ অফিস : ১২৯।১২ বেলেঘাটা মেইন রোড, কলিকাতা-৭০০০১০ হইতে মুদ্রিত
মুদ্রক প্রিন্টার্স ১৫৩-বি, বি বি গাঙ্গুলী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭